আমরা যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং
হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র

স্বাধীনতা সংখ্যা | অনলাইন সংস্করণ | আগস্ট,২০২০

মুক্তি আসুক যুক্তির
পথ ধরে

সূচীপত্র-

প্রকাশিত হলো 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র মুখপত্র- **'আমরা যুক্তিবাদী'** পত্রিকার স্বাধীনতা সংখ্যা, আগষ্ট-২০২০।

পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে আমাদের ওয়েবসাইট www.srai.org-এ।

প্রধান সম্পাদক- মনীশ রায়চোধুরী।

সম্পাদক- সন্তোষ শর্মা, দিলীপ দাসমণ্ডল, দেবরাজ, অনির্বাণ।

সহযোগীতা ও অলংকরণ- দীপ, দেবরাজ, অনির্বাণ, সায়ন, পথিক।

রেজিস্টার্ড অফিস:
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৭২/৮-দেবীনিবাস রোড, দমদম, কোল-৭৪
ফোন: (+৯১) ৮১০০ ৮১৪১৮০

মূল্য: ২৫টাকা।

©সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

- লকডাউন গরীব বশে রাখার প্লান -দিলীপ দাসমণ্ডল/০১
- অভুক্ত ভারত, একটি সমীক্ষা -অভিষেক দে/০৩
- ফ্যাসিজম -আর্যতীর্থ/০৪
- ওইজা নাকি ইডেওমোটর? -সৌরভ দেবনাথ/০৮
- একজন বঞ্চিত বাঙালী বিজ্ঞানীর ইতিকথা -শিবব্রত গুহ/১০
- যুক্তির আলোয় মুক্তি -সুকুমার মুখোপাধ্যায়/১২
- একদিনে হবে না, কিন্তু একদিন ঠিক হবে -সায়ন কর্মকার/১৩
- জাতির গ্রহণ -শ্রীকুমার মন্ডল/১৮
- ঈশ্বর কি নাস্তিক? - বিজয় ভৌমিক/২১
- অন্ধবিশ্বাসের গর্ভে 'করোনা মাতা'র জন্ম! -সন্তোষ শর্মা/২৬
- স্কুলের শৌচাগারে অশরীরী ছায়ামূর্তি রহস্য -সন্তোষ শর্মা/৩০
- ভূত তাড়াতে এসে মহা ফাঁদে পড়ল ওঝা -সন্তোষ শর্মা/৪৮
- ভূতের গুজবকে যুক্তিবাদীদের চ্যালেঞ্জ -সন্তোষ শর্মা/ ৭১
- বরুন স্মরণে শুভায়ূ রুডান/৭৪
- সাম্যবাদী -রাখি হোমস/৭৫
- 'স্বাধীন'এবং'স্বাধীনতা' -রাজা দেবরায়/৭৭
- তাজা রক্তের দাগ -জামাল আনসারী/৭৯
- স্বাধীনতা, তুমি আসবে বলে.. -সৌমেশ পাল/৮০
- বিজ্ঞানঃ তুমি কি পথ হারাইয়াছো -মানস কুমার রায়/৮৩
- বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস -কুহেলী বিশ্বাস/৮৭
- ছুঁচিবাই -ডঃ গৌরাঙ্গ সিনহা/৮৯
- মহামারি ও কুসংস্কার: প্রসঙ্গ করোনা - ধ্রুবজ্যোতি সরকার/৯০
- নভেল করোনা ভাইরাস -ডঃ রমলা মুখার্জী/৯৫
- যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে করোনা মহামারী ও আম্ফান -সন্তোষ শর্মা/৯৭
- দুবরাজপুর ডাইনি হত্যাকান্ডের নেপথ্যে – সন্তোষ শর্মা/১০৪
- রক্তাক্ত পৃথিবী -পূবালী শিখা মৈত্র/১২৫

লকডাউন গরীব বশে রাখার প্লান

দিলীপ দাসমণ্ডল

লক ডাউন শুরু হওয়ার 54 দিন পরে হিসাব করে দেখা গিয়েছিল ভারতের 20,00000 কোটি (কুড়ি লক্ষ কোটি) টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে। তার পরেও যতদিন পার হয়েছে ততদিন ঐ অনুপাতে ক্ষতি হয়ে চলেছে। বর্তমানে যখন Unlock প্রশেস চালু হয়েছে তখন ক্ষতির পরিমান কমছে।

ঐ কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে সরকারের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণেরও বেশি ক্ষতি হয়েছে।সরকারের ক্ষতি মানেই জনসাধারণের ক্ষতি ধরতেই হবে। এই জনসাধারণের মধ্যে সমাজের মধ্যবিত্ত ও ধনী শ্রেণীর প্রকৃত ক্ষতিই হয়নি। উল্টে ঐ দুই শ্রেণীর লোকেরা ঘরে বসে আয় পেয়েছে,আর রানিং খরচ অনেক কম হয়েছে অর্থাৎ সঞ্চয় বেশি হয়েছে।

আর প্রকৃত ক্ষতি হয়েছে দরিদ্র (গরীব, নিম্ন মধ্যবিত্ত) শ্রেণীর। এরা আয় করতে পারে নি। পরবর্তীকালে চাকরি চলে গেছে। স্থায়ী আয়ের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে এদের বেশি ভাগ লোকের। হিসাব বলছে এরকম লোক দেশের 40 কোটির বেশি।

Lock down করে এই যে 40 কোটির বেশী লোকের জন্য অন্তত 10,00000 কোটি(দশ লক্ষ কোটি) টাকার আয়ের ক্ষতি হয়েছে। সেটা কার বা কাদের জন্য হয়েছে?

সেটা যে বা যারা lock down চালু করেছে তাদের জন্য হয়েছে। তারা এই সমস্যা (ক্ষতি) হতে পারে এটুকুও জানত না বললে তুঘলকি পরিকল্পনার নতুন সংস্করণ হয়েছে ধরে নেওয়া যায়।

সরকার যখন এই lock down চালু করেছে তখন সরকারকেই এই 40 কোটি মানুষের আগের আয়ের পর্যায়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর lock এর সময়ের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা পুরন করতে হবে। কিন্তু বাস্তবিক দেখা যাচ্ছে এই লোকগুলোর 10 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হলে সরকার Maximum এক লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প করেছে। এই এক লক্ষ কোটি টাকার 50% টাকা আসল ক্ষতিগ্রস্থরা পাচ্ছে, আর বাকি 50% টাকা মধ্যবিত্তরা চুরি করে নিচ্ছে।

10 লক্ষ কোটির ক্ষতির প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থরা পাচ্ছে 50 হাজার কোটি টাকা আর বাকি 9 লক্ষ 50 হাজার কোটি টাকা তাদের ক্ষতিই থেকে গেল। এদের এই ক্ষতির জন্য নিম্ন মধ্যবিত্তরা দরিদ্র শ্রেণীতে নেমে আসবে, আর গরীবরা গরীবের অধম শ্রেণীতে নেমে আসবে।এই পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো 40 কোটি মানুষকে নিয়ে লোফালুফি করবে।আর ভোটের সময় ক্যাচ ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতার ম্যাচ জেতার খেলা শুরু করে দিয়েছে।

লক ডাউনের সাইড এফেক্ট দারিদ্র বৃদ্ধি।

লক ডাউনের জন্য দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।সেই টাকাটা প্রধানত কাদের টাকা? বেশিটাই সরকারের টাকা অর্থাৎ সকল জনসাধারণের টাকা। আর কাদের ক্ষতি হয়েছে? যারা শ্রম বিক্রি করে আয় করত অথচ কাজ বন্ধ হওয়ার জন্য আয় বা মাইনে পায়নি তাদের। বেসরকারি ক্ষেত্রে যারা মাইনে বন্ধ করেনি তাদের ক্ষতি যেটুকু হয়েছে সেটা হল আগে যে পুঁজি করে নিয়েছে তার কিছুটা অংশ মাত্র।

আর এই এত লক্ষ কোটি টাকা ক্ষতি হলে সেই টাকাটা তো অন্য মানুষের কাছে ঘুরিয়ে গেছে। ওই ঘুরিয়ে যাওয়া মানুষ কারা?আমাদের সমাজে মধ্যবিত্ত ও ধনীরাই বেশিটা কুক্ষীগত করেছে। কিছুটা বিদেশে চলে গেছে। অর্থাৎ লক্ষ ডাউনের মাধ্যমে সরকার ঘুরিয়ে মধ্যবিত্ত ও ধনীদের কিছু টাকা পাইয়ে দিল। তাই মধ্যবিত্তদের প্রায় সবাই লক ডাউন খুব ভালো কাজ বলে প্রচার করছে।

যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে দরিদ্রে এবং গরীব থেকে গরীবের অধম অবস্থায় এসেছে, সরকার তাদের আগের অবস্থায় আনার জন্য ব্যবস্থা করতে পারবে কি? তার জন্য 10 মাস সময় নেবে, না 10 বছর সময় নেবে?

মধ্যবিত্তরা শুধু লকডাউনের সুফল প্রচার করেছে গুলতানির মাধ্যমে। আর ঘরে বসে খাওয়া দাওয়ার উৎসব করেছে। যখন দরিদ্র আর নিম্ন মধ্যবিত্তরা লকডাউনকে কিছুটা অগ্রাহ্য করে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

লক ডাউন করে খুব ভালো কাজ করেছি এইটা তো জনসাধারণকে বোঝানো হচ্ছে। এই ভালো কাজটা তো ভোটের সময় প্রচার করে বেশি ভোট পাওয়া যাবার কথা। রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুরোধ করছি ভোটের সময় এই ভালো কাজের খতিয়ানটা খুব ভালো করে প্রচার করতে। তাহলে ভোটের ফলে ভালো ফসল পাওয়া যায় কিনা দেখা যাবে?

2020 সাল করোনা মহামারীর বছর। এই বছর করোনাতে পৃথিবীর অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের ভারতেও প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে এবং যাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। এই বছর শেষ হওয়ার পর আমাদের দেশে কত মোট মানুষ মরেছে তার হিসাব পাওয়া যাবে। তখনই দেখা যাবে আগের বছরগুলোর তুলনায় এই বছর কত মানুষ বেশি মরেছে। তখনই বোঝা যাবে এত লোক করোনায় মরার পরও মৃত্যুর বৃদ্ধির অনুপাতটা কত বেশী না আগের বৃদ্ধিরই মতো। তখনই বোঝা যাবে মৃত্যুর হিসাবের মধ্যে কতটুকু দুধ আর কতোটা জল মেশানো আছে। ততদিনে অবশ্য লকডাউন খেলার বিজনেসম্যানরা তাদের লাভ গুছিয়ে নিয়ে সেফসাইডে চলে যাবে। আর দরিদ্র এবং নিম্ন মধ্যবিত্তরা খাদের আরও গভীরে ঢুকে যাবে।

এই লকডাউনের জন্য যে কোটি কোটি মানুষ দরিদ্র শ্রেণীতে নেমে এসেছে তারা কাজের জন্য ছটফট করবে আর সেই সুযোগ নিয়ে যারা তাদের কাজ দেয় বা দেবে তারা মজুরির মাপ এত তলানিতে নিয়ে যাচ্ছে বা নিয়ে যাবে যে দারিদ্রতে নেমে আসা মানুষগুলোর আবার অন্তত আগের অবস্থায় ফিরে আসতে কয়েক বছর পার হয়ে যাবে। এই অবস্থা যে হতে পারে এটুকু কি লক ডাউন চালু কারীরা একদম বুঝতে পারেনি বলে মনে হয়? এর মাধ্যমে প্রথমে এই কোটি কোটি মানুষের অভাব সৃষ্টি করে পরে একটু একটু অভাব মিটিয়ে শুধু বেঁচে থাকাটা নিশ্চিত করে, মানুষের জন্য কত কাজ করেছি প্রচার করে ঐ সকল দরিদ্র মানুষদের বশে রাখবে।

দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যা ইত্যাদি সমস্যার সময় যেমন অতীতে নিচুতলার মানুষের জন্য প্রকৃত কোন ব্যবস্থা না করে তাদেরকে অল্প একটু সাহায্য করে শুধু বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে আরও নিচু করে দিয়েছিল, সেরকমই করোনার সমস্যা তৈরী হওয়ার পর আরও কূটনৈতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার ফলে অসংখ্য মানুষের গরীব বা গরীবের অধম শ্রেণীতে পৌঁছে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে।

অভুক্ত ভারত, একটি সমীক্ষা

অভিষেক দে

'Global Hunger Index'অর্থাৎ বিশ্ব ক্ষুধা সূচক ২০১৯ অনুযায়ী"ভারত"১১৭ টি দেশের ভেতর ১০২ তম স্থানে বিরাজমান। ২০০০ সালে ১১৩ টি দেশের ভেতর যা ছিল ৮৩ তম। এই পরিসংখ্যান স্পষ্ট ভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ক্ষুধার্ত দেশের তালিকায়"ভারত"ক্রমশ নীচের দিকেই তলিয়েই যাচ্ছে অর্থাৎ ভারতে ক্ষুধাতুর মানুষের সংখ্যা দিন-প্রতিদিন বেড়েই চলেছে।

তথাকথিত"স্বাধীনতা"র ৭০ বছর পরেও যদি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গরিবি নাই মিটলো, যদি সাধারন মানুষ খাদ্যের অভাবে দিন দিন শুকিয়ে মরে তাহলে সরকার ঠিক কাঁদের জন্য? তবে কি সেইসব মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের জন্যই সরকার যাঁদের ১% মানুষের হাতে বাকি ৭৩% মানুষের সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে?

'আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি দপ্তর'থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতের প্রায় ১৯.০৭ কোটি মানুষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৪.০৫% প্রতিদিন অভুক্ত থাকে।

তাছাড়া'United Nations Development Program 'এর তথ্য অনুযায়ী ভারতে প্রতিবছর উৎপাদিত ফসলের ৪০% খাদ্যশস্য গুদামে পচে নষ্ট হয়ে যায়। ভারতের কৃষি দপ্তরের সূত্র অনুসারে, উৎপাদিত খাদ্য যা প্রতিবছর নষ্ট হয়ে যায় তার অঙ্কটা ভারতীয় মুদ্রায় ৫০০০০ কোটি টাকার মতন। ২০১৭ সালে করা এক RTI এর উত্তরে'Ministry of Consumers Affairs, Food and Public Distribution'জানিয়েছিল, শুধুমাত্র ২০১১-২০১৭ সালের মধ্যে ৬১,৪২৮ টন খাদ্য শস্য FCI এর গোদাম ঘরে নষ্ট হয়েছে, যার ভেতর চাল এবং গম ই ছিল প্রধান। শুধুমাত্র মহারাষ্টেই ৭৯৬৩ টন খাদ্য শস্য নষ্ট হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মত,এই এই পরিমাণ নষ্ট হওয়া খাদ্য শস্য দিয়ে প্রায় ৮ লক্ষ গরিব পরিবারকে ১ বছর খাওয়ানো যেতো, যেটা হয়নি সরকারের উদাসিনতায় এবং প্রশাসনের চরম গাফিলতি তে।

সম্প্রতি একটি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা'Commission for Agriculture Cost and Prises'এর পূর্ব অধ্যক্ষ টি. হক জানান, ভারতে দুই তিন টাকা দরে জনগণ কে চাল দেওয়ার ব্যাবস্থা থাকলেও এমন বহু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা এতটাই কম যে তারা ঐ টাকাতেও চাল,গম ইত্যাদি কেনার সামর্থ্য নেই।

ভারত খাদ্য শস্য মজুত রাখার ক্ষেত্রে বিশ্বে বৃহত্তম। প্রতিবছর ৭৫০ বিলিয়ন টাকা যা কিনা মোট GDP র এক শতাংশ, সরকার এই খাতে খরচ করে। অথচ বাস্তবে ভারতের একটা বড় অংশের নাগরিকই খাদ্যের অভাবে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে। সত্যি, অতুল্য ভারতের করুণ ছবি বোধহয় এটাই।

'Council for Social Development (CSD) সম্প্রতি তাদের পেশ করা একটি রিপোর্টে জানিয়েছে, সাল ২০০০ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য ৬গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকজন অর্থনীতিবিদ,সমাজবিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা মিলে'Rising Inequalities in India -2018'নামে এই রিপোর্ট তৈরি করেছে।'Oxfam'এর দাবী, ২০১৮ সালের হিসেবে ভারতের ১০% ধনী জাতীয় সম্পদের ৭৪.০৪ শতাংশ এবং শীর্ষস্থানীয় ধনীর ১% জাতীয়

সম্পদের ৫১.৫৩ শতাংশ ভোগ করে।'Oxfam'আরও জানাচ্ছে, এই ১ শতাংশ ধনীব্যক্তির দৈনিক উপার্জন ২,২০০ কোটি টাকা।

জনগণের রায়ে নির্বাচিত সরকার যতই উন্নয়নের দাবী করুক, বাস্তবে অর্থনৈতিক বৈষম্য,দারিদ্রতা, বেকারত্ব দেশে মারাত্মকভাবে বেড়ে চলেছে। সীমাহীন লোভ এবং দুর্নীতিই এর প্রধান কারণ। দুর্নীতিতে প্রথম সারিতে থাকা ভারতে শুধু ঘুষ নেওয়া এবং দেওয়া তেই বছরে ২,১০০ কোটি টাকা খরচ হয়ে যায়?

সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ক'জন শীল্পপতি কিংবা পুঁজিপতিরা ফোর্বসের তালিকায় পৃথিবীর ১০০ জন অতিধনীদের মধ্যে স্থান পেয়েছে তা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে দেশের জনসংখ্যার ৭৫ ভাগ মানুষের অভুক্ত পেট ভরবে না। প্রতিবছর বাজেটে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা বরাদ্দ থাকে প্রতিরক্ষা খাতে খরচের জন্য। কিন্তু তারপর? দেশকে সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজন শিক্ষা,সুচিকিৎসা,অন্ন,বস্ত্র, পরিষ্কার পানীয়জল এবং মাথার ওপরে আস্তানা। সেসব না ভেবে শুধু প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল খরচ করে আর যাই হোক, কখনই সাম্য আনা সম্ভব নয়।

ঋণ স্বীকার :''অণ্বেষণে''মাসিক পত্রিকা এবং কস্তুরী মুখার্জী,অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ।

ফ্যাসিজম

-আর্যতীর্থ

ফ্যাসিজম, ফ্যাসিজম, চারদিক তোলপাড়,
এ ফ্যাসি ও ফ্যাসি, নানা নামে ধিক্কার।
কিন্তু এ মতবাদ খায় না মাথায় দেয়,
এ অধম জানেই না, অগত্যা নিরুপায়,
ওস্তাদ ধরতেই হবে এই ব্যাপারে,
যে করেছে ফ্যাসি নিয়ে পড়বার হ্যাপা রে
বাজারে সওয়াল তুলি, ফ্যাসিজম কে জানে
সকলে আঙুল তুলে বলে বসু বিষাণে।
যে সে নয় এই বোস, কর্কটি ডাক্তার,
ছবি নিয়ে সবই জানে, কবিতা সমঝদার।
ব্যস্ত পেশার থেকে কৃপা করে কিছুক্ষণ
বিষাণ দিয়েছে পাঠ, ফ্যাসিজম শিক্ষণ।
সেই মতো তুলে আনি তোমাদের সামনেই

সবই কৃতিত্ব ওর, আর্যর নাম নেই।

ফ্যাসিরা সবাই আসে ভোটে জিতে ক্ষমতায়
এসে তারা ধীরে ধীরে অভিমুখ বদলায়
আইডিওলজি মেনে একজন আইডল
দল মানে তিনি আর তিনি মানে তাঁর দল
দেশ বদলাতে চাই তাঁর ছোঁয়া সে ম্যাজিক
এমনই বিজ্ঞাপনে ছেয়ে যায় চারিদিক।

যদিও ক্ষমতা পেতে লাগে গণতন্ত্র
পরিসর ছোটো করে শাসনের যন্ত্র।
দেশের গরিষ্ঠ যারা বর্ণে বা ধর্মে
তাদের বেশির ভাগই সায় দেন কর্মে
তার মানে এই নয়, তারা বোঝে ফ্যাসিকে
অন্যরকম এরা ভেবে ঢলে সেদিকে
ফ্যাসি জানে কোন টোপ কে খায় কিভাবে
সামনের গাজরটি সেরকম দোলাবে
এরা বহুরূপী হয়, চাপে মূল লক্ষ্য
তার উপরে বোঝানোর কাজে হয় দক্ষ
যেরকম চাই বলে তেমন অ্যাজেন্ডা
অজান্তে বহু লোক বয়ে চলে ঝান্ডা।
মগজধোলাই হয় এতটা ভেতরতক
শত যুক্তির বাণে টলে না সমর্থক
যতদিনে হুঁশ ফেরে দেরী হয়ে গিয়েছে
তাকেই যখন ফ্যাসি জলে ফেলে দিয়েছে
আর ফেরে সম্বিত ফ্যাসিবাদ নিপাতে
ইতিহাসে বলো আর আসে যায় কি তাতে।

জাতীয়তাবাদ বলে খণ্ডের ধারণা,
দেশপ্রেম বলে বেচে ফ্যাসিবাদী তাড়না।
এই প্রেম প্রেম নয়, আসলেতে ঘৃণা সে,
ভালো লাগা শুধু জাগে শত্রুর বিনাশে।

দেশের যা কিছু ভালো, সেই সবে মন নেই
যেন দেশপ্রেম শুধু যুদ্ধের জন্যেই।
বাইরে কেবল নয় শত্রুর সন্ধান
ভেতরের কাউকেও দিতে হবে তার স্থান।
কোনো জাত বর্ণ বা ধর্মকে দাগিয়ে
শত্রুর চর বলে দেয় স্ট্যাম্প লাগিয়ে।

দেশ স্বচ্ছল হলে কোনো গোল হয়না
ফ্যাসিবাদ চিরকাল অভাবের গয়না।
দেশ জুড়ে বেকারের বেড়ে যাওয়া সংখ্যায়
প্রবল সুযোগ পেয়ে লঘুদের ধমকায়,
ফ্যাসিবাদ হাওয়া দেয় সেই সব ধমকে,
কাটা ক্ষত আরো জ্বলে বিভেদের নমকে।

প্রতিবাদ করলেই অতীতকে টেনে খুব
ফ্যাসিবাদী করাবেন বিরোধীকে নিশ্চুপ
সে অতীত প্রায়শই ইতিহাস নয় ঠিক
সত্যিকে মুচড়িয়ে সুযোগী কাল্পনিক।
কজন আর লোক আছে তথ্যের পঠনে,
মিথ্যে বরং বেশি চকচকে গঠনে।

পরিসংখ্যান গড়ে নানাবিধ কায়দায়
লোকসানে ফ্যাসিবাদ বলে আছি ফায়দায়
সুগভীর গবেষক পাওয়া বড় দুষ্কর
তথ্যেরা দুর্লভও রাজা যদি তস্কর,
তবু যদি কোনোদিন বেমক্কা ফাটলে
দুর্নীতি গলা ঘিরে ক্রমে আরো আঁট হলে
অতীত বা শত্রুকে দোষ দেওয়া খোঁচাতে
অনায়াসে পারে সব বদনাম ঘোচাতে।

বিরুদ্ধে কথা বলা মানে দেশদ্রোহিতা
এরকম ভাবনার ফ্যাসিজম গ্রহীতা।

প্রতিবাদী মানেই সে শত্রুর বান্ধব,
তক্ষুণি তাকে জুড়ে প্রচারের তাণ্ডব
বলছে যে বিপরীত, দেশ মনে নেই লেশ
ফ্যাসিবাদ দিয়ে থাকে সেরকম নির্দেশ।

চিন্তনবিদ যারা অগ্রণী সমাজে
ফ্যাসিবাদ তাঁদেরকে করেইনা ক্ষমা যে।
করবেই বা কেন, তাঁদের বেশীর ভাগ
ফ্যাসিবাদী পতাকায় দেখাননা অনুরাগ।
সুতরাং জাদুঢাক লেগে থাকে প্রচারে,
অকম্মা বলে দেয় ক্রমাগত খোঁচা রে
শারীরিক শ্রম শুধু প্রগতির পথ্য
এই বলে বিদ্যাকে গালি অকথ্য
ফ্যাসি প্রথা সেটা করে যথারীতি রুটিনে
জ্ঞানীদের দ্বেষে বলে দেশ থেকে ছুটি নে।

যেইখানে লাভ থাকে সেইখানে ব্যাপারী
কারণ হয় না যেন মসনদ খেপার-ই
সেই মতো ধামা ধরে শিল্পরা লাইনে,
সংবাদমাধ্যমও কেনা বিনা মাইনে,
উল্টো বললে যাবে লাইসেন্স চটকে,
পেয়াদা পাইক এলে দেবে ঘাড় মটকে
তার চেয়ে ভালো বাবা চেপে যাওয়া সত্য
বশ্যতা ফ্যাসিবাদে বাঁচবার শর্ত।

এইটুকু বলে রাখি, দরকারী বোধেতে
এইসব পড়ে যারা ফাটছেন ক্রোধেতে
ওয়ার্লড ওয়ার টু-য়ে মুসোলিনি হিটলার
সেটুকুই ভিত জেনো বিষাণের বিদ্যার,
অতীতের কথাটাই বলে গেছে খালি ও
মিল পেলে কারো সাথে.. সেটা কাকতালীয়।

ওইজা নাকি ইডেওমোটর?

সৌরভ দেবনাথ

ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘর। চারিদিকে নিস্তব্ধ। অমাবস্যার অন্ধকার চারিদিকে আলকাতরা লেপে রেখেছে। ঘরের মধ্যে চার বন্ধু চোখ বুজে হাত ধরাধরি করে বসে আছে। অনিক, রঞ্জন, অতনু আর পলাশ চার বন্ধু। দিন পাঁচেক হলো মাধ্যমিক শেষ হয়েছে। প্রায় এক বছর হতে চললো স্কুলের ভূগোলের স্যার ভূপেনবাবু মারা গেছেন রোড অ্যাকসিডেন্টে। তাঁরই আত্মাকে ভূপৃষ্ঠে নামিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে এই চার ছাত্র। অতনুদের বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে সবাই বসেছে। রঞ্জন ব্যাগ থেকে ওইজা বোর্ড বের করলো। পলাশ একটা মোমবাতি জ্বালালো। দেওয়ালে সবার কম্পিত ছায়া পড়েছে। বোর্ডটা পেতে রাখা হলো। সবাই একটা মাকু আকৃতির চ্যাপ্টা কাঠের টুকরোতে তর্জনী ঠেকালো। রঞ্জন আগেই সবাইকে বলে রেখেছিলো আত্মা নাকি ওই কাঠের টুকরোটা বিভিন্ন লেখার ওপর নিয়ে গিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। সবাই নিজেদের হৃৎপিণ্ডের হাতুড়িপেটা অনুভব করছিল। সবার সম্মিলিত কণ্ঠে শুরু হলো"স্যার আপনি আসুন। স্যার আপনি আসুন।"বলতে বলতে বোর্ডের ওপর চারজনে মিলে তর্জনী দিয়ে টেনে কাঠের টুকরোটা ঘোরাতে লাগলো। একটা সময় থেমে গিয়ে বললো"স্যার আপনি এসেছেন?"চারজনে চমকে উঠে দেখলো কাঠের টুকরোটা আপনা থেকেই Yes লেখার দিকে এগিয়ে গেলো। তারা তো নামমাত্র ছুঁয়ে আছে তাহলে এ কি করে সম্ভব! এবার রঞ্জন প্রশ্ন করলো"স্যার আপনি তো আগে প্রেতলোকে বিশ্বাস করতেন না।"কাঠের টুকরোটা এবার No এর দিকে সরতে লাগলো। অনিক কাঁপা কাঁপা গলায় বললো"চল এবার উঠি সব। এবার বিশ্বাস হলো তো?"এমন সময় দমকা হাওয়ায় মোমবাতি গেলো নিভে। সবাই আর্তনাদ করে হুড়মুড়িয়ে টেবিল, বোর্ড উল্টে বেরিয়ে গেলো।

প্ল্যানচেট হলো মৃত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার পদ্ধতি। আর ওইজা বোর্ড হলো একটা মাধ্যম যাতে আত্মার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম যার ওপর A থেকে Z, 0 থেকে 9 আর Yes, No, Goodbye ইত্যাদি লেখা থাকে। আর থাকে একটা মাকু আকৃতির চ্যাপ্টা কাঠের টুকরো মাঝখানে গোল করে কাটা। মৃত পরবর্তী জীবনে মানুষ বহুকাল আগে থেকে বিশ্বাস করে এসেছে। প্রিয়জনের কবরে ফুল, প্রিয় সামগ্রী প্রদান এসবের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রমাণ করে গুহাবাসী মানুষদের সময় থেকেই আত্মার ধারণা প্রবল। মৃত্যু মানে হলো জীবনের শেষ। দেহের সমস্ত বিপাকীয় ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া। তারপর আর কিছু নেই। সেখানেই সব স্তব্ধ। আমাদের মনকে যদি আত্মা বলা হয় তা হলো স্নায়বিক ক্রিয়ার ফল। মৃত্যুর পর মস্তিষ্ক, স্নায়ুকোষেরও মৃত্যু ঘটে। সুতরাং বলা যায় মৃত্যুর সাথে সাথে আত্মারও মৃত্যু ঘটে। কিন্তু মানুষের মন আবেগপ্রবণ ও দুর্বল। মৃত্যুকে সে জীবনের স্বাভাবিক নয় ভয়ংকরতম পরিণতি মনে করে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। মৃত্যুতেই জীবনের শেষ এটা মেনে নেওয়া আতঙ্কের। তাই নিজের মনের মধ্যেই একটা হাইপোথিসিস বানিয়ে নিয়েছে মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে এবং বিভিন্ন উপায়ে তার মরণের পারের আপনজনের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে।

এবার আসা যাক ওইজা বোর্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে। ঠিক কি ভাবে এর উৎপত্তি তা সঠিক ভাবে জানা যায় নি। তবে উনিশ শতকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় এর জনপ্রিয়তা প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পায়। চার্লস কেনার্ড নামের এক

ব্যবসায়ী ওইজা বোর্ডকে বাজারজাত করেন। তাঁর’কেনার্ড নভেলটি কোম্পানি’ওইজা বোর্ডের স্বত্ত আর সন্তানহারা মাতা পিতার আবেগকে পুঁজি করে ওইজা বোর্ডকে জনপ্রিয় করে তোলে। ধীরে ধীরে তা ইউরোপেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এখন প্রশ্ন হলো এটি সত্যি কি মৃত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করাতে পারে? যদি আত্মা বলে কিছু নাই থাকে তাহলে গত দেড়শো বছরেরও বেশি সময় ধরে তা মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় কিভাবে? ইন্টারনেটে অসংখ্য অভিজ্ঞতার কথা মানুষ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা অনুভব করেছেন কাঠের টুকরো তাঁদের অনিচ্ছাতেই আপনা থেকেই নড়ছে।

এর প্রধান কারণ হলো’ইডেওমোটর এফেক্ট'। অর্থাৎ অবচেতন মনের সাহায্যে পেশির সঞ্চালন। এক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন ছোট কাঠের টুকরোটির ওপর আঙুল রাখেন তখন তার অবচেতন মন পেশিতে সংকেত পাঠায় সঞ্চালন করার জন্য। এতে সেই ব্যক্তির মনে হয় সে নিজে তা নাড়াচ্ছে না। ব্যপারটি আপনা থেকেই ঘটছে আর তা নিশ্চয়ই প্রেতাত্মা ঘটাচ্ছে। ইডেওমোটর এফেক্টের পরীক্ষা কেউ চাইলে বাড়িতেই করতে পারেন। দু হাতের তর্জনী পরস্পরের থেকে এক সেন্টিমিটার দূরে রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে হবে। দেখা যাবে নিজের অজান্তেই আপনা থেকেই তর্জনী দুটি একজায়গায় চলে আসবে।’ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক’চ্যানেলে ব্রেন গেমস’নামক অনুষ্ঠানে একটি পরীক্ষা করা হয়। প্যারানরমাল এক্সপার্ট’মার্ক এডওয়ার্ড’চারজন ব্যক্তিকে ওইজা বোর্ড দিয়ে পরীক্ষা করেন। একজন মহিলা তাঁর মৃত পিতামহের আত্মাকে ডাকেন। চারজনেরই মনে হয়েছে আত্মা তাঁদের সাথে কথা বলেছে। এবার মার্ক এডওয়ার্ড তাঁদের সবার চোখ বেঁধে দেন এবং বোর্ডটি ঘুরিয়ে দেন তাঁদের সবার অজান্তে। এবার দেখা গেলো আত্মা যেখানে সেখানে কাঠের টুকরোটি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যেনো সে বুঝতেই পারেনি বোর্ডটি ঘোরানো হয়েছে। এর কারণ হলো ঐ মহিলা আগে থেকেই দেখেছিলেন কোথায় Yes, No বা যাবতীয় অক্ষর আছে। চোখ বন্ধ থাকা অবস্থায় তাঁর অবচেতন মন পূর্ববর্তী অবস্থানে বোর্ডের লেখাগুলিতে সরিয়ে নিয়ে গেছে। পরে সবকিছু জানার পরেও ঐ চারজন মানতে পারেননি। ইউরোপে যখন ওইজা বোর্ড জনপ্রিয় হয় তখন ব্যাপারটি বিখ্যাত পদার্থবিদ মাইকেল ফ্যারাডের নজরে আসে। তিনি একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। কতগুলো কার্ডবোর্ডের টুকরো পর পর বসিয়ে নির্দেশক টুকরোটির ওপর রাখেন এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি কার্ডবোর্ডের ওপর আঙুল রাখেন। যদি আত্মা নির্দেশকটি নাড়ায় তাহলে কার্ডবোর্ডগুলি নির্দেশক টুকরোটির গতির বিপরীত অভিমুখে পিছিয়ে পড়বে। আর তাতে প্রমাণ হবে নির্দেশক টুকরোটি আত্মাই নড়িয়েছে এবং তাতে ব্যক্তিটির কোনো হাত নেই। কিন্তু যদি নির্দেশক টুকরোটি স্থির থাকে আর কার্ডবোর্ডগুলি সরতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে কোনো আত্মা নয় পরীক্ষক ব্যক্তির অবচেতন মনই এর জন্য দায়ী। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু অনেক ভৌতিক গবেষকরা দাবি করেন আত্মা নাকি ইচ্ছে করেই এমন আচরণ করে। তাঁদের এমন দাবি প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাই যদি হবে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, আত্মা তো আমাদের তাঁর উপস্থিতি জানান দিতে চায়, তাহলে তো তার এমন আচরণ কাম্য নয়। অনেক ভৌতিক সংস্থা আছে যারা অর্থের বিনিময়ে প্ল্যানচেটের ব্যবস্থা করে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে চলেছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাছে ওইজা বোর্ড বারংবার মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিন্তু মানুষের যুক্তিবাদী মন আবেগের কাছে হার মেনে যায়। তাই দরকার প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষার।

সবকিছু আনুগত্যহীনভাবে প্রশ্ন করার। হয়তো বিজ্ঞানের কাছে প্রকৃতির সকল রহস্যের সমাধান বর্তমানে নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে আছে সেই রহস্য সমাধান করার উৎকৃষ্টতম পদ্ধতি। যা যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর তাই বিজ্ঞান নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে সবকিছু বোঝার। আর বিশ্বাসের কোনো জায়গা বিজ্ঞানে নেই। আছে যুক্তি, তথ্য, প্রমাণ। গত চারশো বছরের প্রচেষ্টায় মানবজাতি এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। আর এ তো সবে শুরু।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের ব্রেন গেমসের ইডেওমোটর এফেক্টের পরীক্ষা - https://youtu.be/PRo8TytvIDw

একজন বঞ্চিত বাঙালী বিজ্ঞানীর ইতিকথা

- শিবব্রত গুহ

ভারতের বুকে অনেক বিখ্যাত মহান বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন একজন বিজ্ঞানী। তাঁর নাম কি জানেন আপনারা? তিনি হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি হলেন ভারতমাতার এক গর্বিত সন্তান।

তিনি জন্মেছিলেন ১৮৫৮ সালের ৩০ শে নভেম্বর, ব্রিটিশ ভারতের মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুরে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। তাঁর নাম ছিল ভগবান চন্দ্র বসু। ইংরেজ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হলেও, তিনি কিন্তু ছেলে জগদীশচন্দ্রকে কখনো ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি করাননি।

জগদীশচন্দ্রের প্রথম বিদ্যালয়ের নাম ছিল ময়মনসিংহ জেলা বিদ্যালয়। বাংলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে যুক্তি তাঁর ছিল বড়ই সুন্দর। তিনি চাইতেন, ইংরেজি শেখার আগে মাতৃভাষা শেখা খুব জরুরী। জগদীশচন্দ্র পড়াশোনা করেছিলেন হেয়ার স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, ক্রাইস্ট কলেজ, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৮৮৭ সালে জগদীশচন্দ্র বিয়ে করেছিলেন লেডি অবলা বসুর সাথে। তিনিও ছিলেন একজন মহিয়সী নারী। লেডি অবলা বসু ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত সংস্কারক দুর্গা মোহন দাসের মেয়ে। ১৮৯৫ সালে, জগদীশচন্দ্র, অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি ও কোন তার ছাড়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তা পাঠানোতে সফল হয়েছিলেন। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে, জগদীশচন্দ্রের সফলতা যথেষ্ট ঈর্ষনীয়। তিনি বিজ্ঞান গবেষণায় অর্জন করেছিলেন প্রভুত সাফল্য। যার জন্য তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল দেশে - বিদেশে। বাঙালীরা যে বিজ্ঞান গবেষণায় নিউটন

আইনস্টাইনদের চেয়ে কোন অংশে কম যায়না, তা তিনি বিশ্বের দরবারে করেছিলেন প্রমাণ। যার জন্য, কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয় তাঁর জন্য।

জগদীশচন্দ্র যে গ্যালিলিও, নিউটনের সমকক্ষ ছিলেন, তার স্বীকৃতি দিয়েছিল লন্ডনের ডেইলিএক্সপ্রেস পত্রিকা, ১৯২৭ সালে। আর আইনস্টাইন তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন,"জগদীশচন্দ্র যে সব অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তার যে কোনটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে বলেন,"ভারতের কোনও বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি হে আর্য আচার্য জগদীশ।"

তিনি জীবনে অনেক সন্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। এবার সেদিকে আলোকপাত করছিঃ

১. নাইটহুড, ১৯৯৬।

২. রয়েল সোসাইটির ফেলো, ১৯২০।

৩. ভিয়েনা একাডেমি অফ সাইন্স - এর সদস্যপদ লাভ, ১৯২৮।

৪. ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৪ তম অধিবেশনের সভাপতি, ১৯২৭।

৫. লিগ অফ ন্যাশনস কমিটি ফর ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশনের সদস্য।

৬. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সাইন্সেস অফ ইন্ডিয়া এর প্রতিষ্ঠাতা ফেলো।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন একজন বাঙালী পদার্থবিদ, উদ্ভিদবিদ ও জীববিজ্ঞানী। তিনি একজন কল্পবিজ্ঞান রচয়িতাও বটে। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন,যে, গাছেদেরো প্রাণ আছে। তাঁর এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার সাড়া ফেলে দিয়েছিল দেশে ও বিদেশে। তাঁর এই গবেষণার ফলে, উদ্ভিদ বিজ্ঞান হয়ে ওঠে খুব সমৃদ্ধ। তাঁর হাত ধরেই ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহারিক ও গবেষণাধর্মী বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল।

তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল পদার্থবিজ্ঞান, জৈবপদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও বাংলা কল্পবিজ্ঞান। তাঁর অনেক বিখ্যাত ছাত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বলি। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শিশির কুমার মিত্র প্রভৃতি।

জগদীশচন্দ্র সারা জীবন ধরে করেছেন বিজ্ঞানের সাধনা। তিনি করেছিলেন অনেক অসাধ্য সাধন। তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতের সুনাম বৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বসু, ছিলেন একজন বঞ্চিত বাঙালী বিজ্ঞানী। তিনি সারাজীবনে অনেক প্রাপ্য সন্মান থেকে হয়েছিলেন বঞ্চিত। কারণ, তাঁর সময়ে ভারত স্বাধীন ছিলনা। তিনি ছিলেন একজন পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ। যার জন্য, তিনি বেতার আবিষ্কার করেও তার আবিষ্কর্তার স্বীকৃতি পাননি। পেয়েছিলেন ইতালির বিজ্ঞানী মার্কনি। যা ছিল অত্যন্ত অন্যায় কাজ। এনিয়ে এখনো সারা বিশ্বে বিতর্ক বিদ্যমান রয়েছে। জগদীশচন্দ্র যা সব আবিষ্কার করেছিলেন সেযুগে, তাতে তাঁর অনায়াসে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথা। তাও তিনি পাননি। কেন? কেন? কেন?

কিজন্য তিনি এরকমভাবে একের পর এক বঞ্চনার শিকার হলেন? এর উত্তর আজো পাওয়া যায়নি, যায়নি পাওয়া, কখনো আর যাবে কি পাওয়া?

(তথ্য সংগৃহীত)

যুক্তির আলোয় মুক্তি

সুকুমার মুখোপাধ্যায়

কুসংস্কার নয়কো কভু, মিথ্যে আবেগ নয়;
সমস্যার ঠিক সমাধান যুক্তি পথেই হয়।

কথায় কারও দখিনা বয় কারও কথায় ঝড়,
নিজেকে কেউ জিতিয়ে দিতে তোলে গলার স্বর;
কুকথায় আর হিংস্রতায় চলে শক্তিক্ষয়।

চারিদিকে চলছে কথা নরম গরম নিত্য,
চলছে প্রেম মান-অভিমান কলহ বিতর্ক;
যুক্তি হল কথার প্রাণ, যুক্তি আনুক জয়।

জ্বাললে আলো মেলে যেমন আঁধার থেকে মুক্তি,
সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে কথায় থাকুক যুক্তি;
সুস্থ বিতর্ককে সাথী কর সবসময়।

যে সমাজে চীৎকার আর হানাহানি যত,
সেই সে সমাজ অন্ধকারে নিমজ্জিত তত;
যুক্তিসূর্য উঠলে সত্য ছড়ায় জগৎময়।

আবেগের অন্ধত্ব মানুষকে ঠকায়,
অপযুক্তির চালাকিতে কেউ ভোলে মিথ্যায়;
তাইতো বলি সাবধান, আছে পথ হারাবার ভয়।

বিজ্ঞানমনস্ক আর নিরপেক্ষ থেকে,
সত্যের সন্ধানে চল, রাখ সাহস বুকে;
সৎযুক্তি সদা হোক সবার আশ্রয়।

একদিনে হবে না, কিন্তু একদিন ঠিক হবে

-সায়ন কর্মকার

সময়টা ছিল বৈশাখের এক সন্ধ্যা। শান্ত, নির্জন, নিস্তব্ধতা ঢেকে রেখেছে হাটের চারিপাশটা। প্রতিনিয়ত ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ, ঘাটের পাড়ে। আন্দোলিত হচ্ছে পাড়ে বাঁধা নৌকো। পাশের বাঁশ ঝাড়ে দলে দলে এসে ভিড় করছে জোনাকি। অদুরের মাদার গাছের ডালপালার মধ্য দিয়ে উকি মারা গোল পূর্ণিমা চাঁদে চারিদিক জ্যোৎস্নালোকিত। দুরে কোথায় যেন কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। নদীর জলের কুলুকুলু শব্দের সাথে বইছে ঠাণ্ডা বাতাস। হঠাৎই পাড়ে বাঁধা নৌকোর দোলন বেড়ে যাওয়া দলুইযের উপর শুয়ে থাকা বছর উনিশ-কুড়ির মেঘনাদ ঘাড় উঁচু করে দেখল, ললীনী কাকার নৌকো পাড়ে এসে ঠেকেছে। বহুদিন পর কলেজ থেকে গ্রামে ফিরে এসে নতুন করে নিজের গ্রামকে দেখছে যেন মেঘনাদ। কত দিন যেন দেখে নাই এ নদী, এ নৌকো, বাঁশের বনে জোনাকি ......। কত দিন অপেক্ষা করে বসেছিল এই

মাধবী ঘাট, তার জন্য।

সহাস্যে বল উঠল মেঘনাদ – কেমন আছে ললীনী কাকা?

বাঁশের খুঁটিতে লৌকার দড়িটা বাঁধতে বাঁধতে ললীনী কাকা অপ্রস্তুত স্বরে বলল—কে..?

—আমি, ও পাড়ার মেঘনাদ গো। কেমন আছো ?

– ও.. মেঘনাদ বাবা..। আমার কথা আর বলিস নাকো। অভাবের সংসার টেনে টুলে চলে যাচ্ছে আর কী..! ভগবানের দয়ায় যেটুকু যা হয়..ভাগে যা লেখা আছে তাই হবে... কে জানে তিনি কী লিখে রেখেছেন আমার কপালে..!

তুই কবে এলি?

এই তো আই।

দিয়ে, এসেই ঘাটের পারে তদারকি !!

- কী আর করব বলো! এই ঘাটই যেন আমাকে টেনে নিয়ে আসে।

– তা বেশ।

ওপার থেকে আসা গোটা দশেক গোরু গুলোকে নামিয়ে দিয়ে, আবার নৌকা নিয়ে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

একটি হ্যারিকেনে কেরোসিন ঢালতে ঢালতে ললীনী কাকা বলল,

–আমাকে মুন্সিগঞ্জ যেতে হবে বুঝলি। পরে ফিরে এসে গল্প করব। বেশ কয়েকদিন তো থাকবি এখন..?

- হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ পর ললীনী কাকার নৌকো ছোট হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল ওই দুরের দিগন্তরেখার পটভূমিতে। দূর-দূরান্তে এভাবেই নদীর উপর ভেসে ভেসে এগিয়ে চলে ললীনী কাকার মাটির উপর গড়ে ওঠা ছোট সংসার। দুরে বিশাল আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে এক চিন্তার ছাপ মুখে নিয়ে মেঘনাদ বলল – কী

অদ্ভুত ..! তাই না প্রদীপ ...?

দলুয়ের অপর প্রান্তে বসে থাকা মেঘনাদের সমবয়সি একটি ছেলে সিগারেটের ধোঁয়া প্রবহমান বাতাসে নিক্ষেপ করতে করতে বলল, কীসের অদ্ভুত?

আমাদের ললীনী কাকার অভাবের সংসার। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তার একমাত্র সম্বল ওই নৌকোটি। পেটে খিদের জ্বালা নিযে লড়ে চলে প্রতিনিয়ত। পরনে ময়লা ধুতি, ছেঁড়া গেঞ্জি পরা নলীনী কাকার কাছে একটা নতুন জামা যেন বিলাসিতা। এত কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা সত্ত্বেও ভিতরে এতটুকু ক্ষোভ নেই, আগুনের ফুলকি নেই। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, সবই তার নিয়তি বলে মেনে নিয়েছে সব কিছু বিধাতার লিখন কেউ খন্ডাতে পারবে না তাই তার কিছুই করবার নেই, যা হচ্ছে হতে দাও— এরকম একটা মনোভাব। কি অদ্ভুত!

হাতে ধরে থাকা সিগারেটের অবশিষ্টাংশটুকু নদীর জলে ফেলে দিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল প্রদীপ। এক ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল-

— আগে মানুষটা বেশ হাসিখুশিই থাকত। একরাশ উল্লাস উপছে পড়ত তার ভিতর থেকে। বড় ছেলে চাকরির জন্য দোরেদোরে ঘুরত বিভিন্ন পার্টি অফিসে। যোগ্যতা থাকা সত্বেও চাকরি মেলেনি তার। অবশেষে বাবা-মা-বোন এর কাছে নিজেকে বোঝা মনে করে সেই যে ডুব দিল নদীতে, আর ওঠেনি। খুড়িমার শরীর ভালো নয়। বাড়িতেই থাকে সারাদিন। মোটা অঙ্কের পণের জন্য বারবার ঘুরে গেছে কুহ দিদির সম্বন্ধ। এই নিয়েই এখন বেঁচে আছে মানুষটা।

– এত কষ্ট, যন্ত্রণা থাকা সত্বেও এসব কিছু মেনে নিয়েছে, নিচ্ছে নিজের ভাগ্যের পরিহাস বলে।মেনে নিয়েছে তার বড় ছেলের ভাগ্যটা বুঝি ওইরকমই ছিল বা কুহর কপালে লেখাই নেই বিবাহ যোগ।একটি বারের জন্য ভাবছে না এই নিয়তির লেখক কে? কারা তৈরি করে এই অসুস্থ সমাজ?

এই সকল মানুষগুলোর মাথায় কখনোই আসবে না সে ভাবনা।

-আসত দেওয়া হবে না।

-কীরকম? ঠিক বুঝলাম না!

এই সমাজে প্রতিনিয়ত চলছে মগজ ধোলাই, ওইরকম ললীনী কাকার মতো মানুষের উপর। কিছু লোভী, স্বার্থান্বেষী, মানুষ কখনোই চায় না সাধারণ মানুষগুলোর মধ্যে চেতনার আলো প্রবেশ করাতে। তারা চায় গরীব মানুষ গুলো সব সময়অজ্ঞতার অন্ধকার ডুবে থাকুক।ওই সকল ধান্দাবাজ, লোভী মানুষ গুলো খুবই ভয়ংকর। সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে এতটুকু চেতনার আলো প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য সদা তৎপর। তারা সবসময় এমন একটা সমাজ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতে চায় যেখানে ললীনী কাকার মতো মানুষ গুলো চিরকালএভাবে ভোগ করবে দুঃখ, কষ্ট, খেটে মরবে। আর সেই খাটুনির ফল ভোগ করবে ঐ স্বার্থান্বেষী মানুষগুলো।বড়লোকেরা আরো বড়লোক হৰে, গরীব মানুষগুলো আরো গরীব হবে।

— মগজ ধোলাই।

– এখন, একটা ছেলে যোোগ্যতা থাকা সত্বেও চাকরি পাচ্ছে না। কিন্তু তার পিছনের একটি ছেলে সেই চাকরি পেয়ে যাচ্ছে, যোগ্যতা না থাকা সত্বেও। আজ চাকরি পাওয়াটা মগজের উপর নির্ভর করে না, করে পকেটের উপর। পিছন থেকে ছুরির আঘাতে আক্রান্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ছেলেটি তার চাকরি না পাওয়ার জন্য দায়ী

করে বসে নিজেকে। নিজের কপালকে। বিশ্বাস করে- আমার ভাগ্যে চাকরি ছিল না, তাই হয়নি। তবুও লড়ে যায় আবার। ঘুরতে থাকে এ দ্বার থেকে ও দ্বার। তাও মেলে না ঘরের মা বোনের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার সামর্থ্য।এই মানসিক অবসাদকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয় কিছু ধান্দাবাজ লোকের লোক ঠকানো ব্যবসা। হাতে তাবিজ কবচ মাদুলি আংটি পড়িয়ে সমস্যা নিরাময়েরর ধাপ্পা দিয়ে গরম করতে থাকে নিজেদের ট্যাক। তবুও সেই ছেলেটি বোঝে না তার স্বপ্ন সফল না হওয়ার কারণ। অবশেষে বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। বলা ভালো খুন হতে হয়।আর সেই খুনীকে না চেনার কারণই এই মগজ ধোলাই।

- কীভাবে করে এই ব্রেন ওয়াশ?

– সমাজের ঐ সংখ্যালঘু লোভী, স্বার্থান্বেষী ধান্দাবাজ, অতিবুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক নেতা, ধনী-বিত্তশালী শিল্পপতি কোটিপতি সকলের মূল লক্ষ্য শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখা। তার জন্য প্রয়োজন এমন একটি পথ যেটাতে কখনই ঐ গরীব মানুষগুলো তাদের বঞ্চনার, শোষণের কারণ হিসেবে তাদের দিকে আঙুল তুলতে না পারে। এটা সাফল্যমণ্ডিত করার সবচাইতে উপযুক্ত পথ মগজ ধোলাই।

এই ব্রেনওয়াশ করে লাগাতার প্রচারের মাধ্যমে, অপপ্রচার। এই কাজে নিয়োগ করে স্বার্থান্বেষী বুদ্ধিজীবী, খেলোয়ার, অভিনেতা, সেলিব্রিটি, লেখক, যাদেরকে বেশি খায় আর কী সাধারণ মানুষ। যে সকল অনুষ্ঠান, বিষয়গুলো সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখায় সেগুলি কখনই প্রচার মাধ্যমগুলো প্রকাশ করে না। করলেও নগণ্য। ধারাবাহিক প্রচেষ্টা কখনই চালায় না। বহু মানুষ বিভিন্ন লেখক, খেলোয়ার, অভিনেতাদের অনুসরণ করে। যখন ঐ সকল লেখক, বুদ্ধিজীবী, খেলোয়ার রা নেতা-মন্ত্রী-শিল্পপতিদের কথায় সূরে সুর মিলিয়ে সোচ্চার হয়, তখন তাদের অনুসরণকারী সাধারণ মানুষও তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কথাগুলোর ঠিক ভুল বিচার না করে গোগ্রাসে গেলে।

কথাগুলো শোনার পর প্রদীপের চিন্তাভাবনায় যেন একটা মোড় নিল। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ খেকে বলল

—তাও তো দেখা যায় সাধারণ মানুষ সময়ে সময়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সোচ্চার হয়ে ওঠে নিজেদের অধিকার আদায়ের লড়াইতে।

-শাসক ও শাসকগোষ্ঠী তাদের আপন স্বার্থে টিকে থাকার ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিপীড়িত মানুষদের মগজ ধোলাই করে তাদের একত্রিত সংগ্রামের সমস্ত চেষ্টাকে বার বার ভেঙে দিয়েছে ধর্ম, জাত-পাত বা প্রাদেশিকভার ভেদাভেদের ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে। কুসংস্কারের আফিং খাইয়ে বঞ্চিত মানুষদের মাথায় ঢোকাতে চায় – প্রতিটি বঞ্চনার কারণ অদৃষ্ট, পূর্ব জন্মের কর্মফল, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়া। একই সঙ্গে নিজেদের মত করে 'দেশপ্রেম', ‘জাতীয়তাবাদ’, ‘ধর্মনিরক্ষতা’, ‘বিচ্ছিন্নতাবাদ’ ইত্যাদি বহুতর বিষয়ে ব্যাখ্যা হাজির করে লাগাতার প্রচারে সে-সকল ব্যাখ্যাকে জনগণের মাথায় গুঁজে দিচ্ছে। যেন-তেন প্রকারে শোষিতদের চেতনাকে কুসংস্কারের মধ্যে বন্দী করে রাখতে পারলে ওদের প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্বন্ধ করে রাখা যায়।শাষকদল শাষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখতেই নানাভাবে সাধারণের নিউরনের কলকাঠি নাড়িয়ে গড়ে তুলেছে নতুন নতুন সংস্কৃতি যা অবশ্যই অপসংস্কৃতি।দেশের মানুষ যখন শোষণের থাবা থেকে মুক্তি লাভের আশায় রাস্তায় নামে তখন সীমান্তে বেজে ওঠে রণ বাদ্য। তৈরী হয় উগ্র দেশপ্রেমের বন্যা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জুজু দেখিয়ে তৈরি করা গণউন্মাদনার মধ্য দিয়ে মানুষের মনকে ঘুরিয়েদেওয়া হয় অন্য দিকে। তার সাথে গলা টিপে শেষ করে শোষিতদের প্রতিবাদী কণ্ঠকে।

এই কারণেই প্রতিবার সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ, আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। যতদিন না মানুষ তার ভিতর থেকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অন্ধ দেশপ্রীতির শেষ রেশটুকু বের করে দিয়ে চেতনার আলো প্রবেশ না করাবে ততদিন শাসক-শোষক শ্রেণী সেই কুসংস্কার, অজ্ঞতাকে সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষের ক্ষোভের আগুনে ঠান্ডা জল ঢালবে।

মেঘনাদের মুখ থেকে উচ্চারিত কথাগুলির মধ্য দিয়ে প্রদীপের জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। তার ভাবনা-চিন্তার আঙিনায় প্রবেশকরল এক আগন্তুক। সেই আগন্তুকের আগমনে তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল –

- ঠিক এই কারণেই আমাদের সমাজে আজও ললীনী কাকার উপস্থিতি। তারা এখনো বুঝেই উঠতে পারেনি চায়ের দোকানে, নৌকোয়, পাড়ার মোরে, অন্যের সাথে যাদেরকে নিয়ে গল্প করে আদর্শের আসনে বসিয়েছে, আসলে তারাই তাদের এই দারিদ্রতার, বঞ্চনার কারণ। এদের মাথায় তা কখনই এধরনের ভাবনা আসবেই না।

—একদম ঠিক কথা। তবে অসম্ভব নয়।

– তার মানে তুই কী বলতে চাইছিস? এই লক্ষ লক্ষ ললীনী কাকা তাদের বঞ্চনার কারণ বুঝতে পারবে যেখানে দিনরাত তারাই তাদের বঞ্চনার কারণকে পুজো করছে?

– অবশ্যই সম্ভব।

– কীভাবে?

– আমাদের মানুষগুলোর কাছে যেতে হবে। তাদের নিপীড়ন, বঞ্চনার কথা উপলব্ধি করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবেতাদের বঞ্চনার কারণ কিছু লোভী ধান্দাবাজ মানুষ, কোন অলৌকিক শক্তিধারী গডেশ্বরল্লা নয়।

—তোর ধারনা আছে তুই কী বলছিস? ঐ শোষিত মানুষগুলো তো সেই সকল শাসক-শোষক দলকে আদর্শের জায়গায়বসিয়ে দিয়েছে। তাদেরকে একথা বললে তো তারাই আমাদের দিকে তেড়ে আসবে। উল্টে আমরাই সমাজ থেকেবিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।

মানুষ সুযুক্তির দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য। তাদেরকে যুক্তি দিয়ে বোঝালেই বুঝবে।

আমরা যখন একটা সমাজকে পাল্টানোর স্বপ্ন দেখছি তখন তো আমাদের সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বিছিন্ন হয়ে পড়ব। কিন্তু শত্রু হয়ে উঠব না। আমরা তাদের কাছে বন্ধু হ্যই তাদের বাে্ঝাৰ যে তারা একটা ভুল ধারনার শিকার।

বিদ্যাসাগর, রামমাে্হন প্রত্যেকেই সমাজ সংস্কারের জন্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হযেছিলেন, তবে মানুষের শক্ত হয়ে

ওঠেননি।

প্রদীপ বেশ কিছুক্ষণ ধরে কী যেন ভাবছিল। তারপর বলল – এরকম স্বপ্নকে সফল করতে আমাদের কী করতে হবে?

আমাদের দায়িত্ব কী? কী পদক্ষেপ?

আমরা কী আদৌ পারব?

আকাশের দিকে চেয়ে থেকে মেঘনাদের গলা থেকে বেরিয়ে এল সেই শব্দ যে শব্দ শোষিতদের স্বপ্ন দেখাতে শেখায়, মুক্তির পথ খুঁজে দেয়, যে শব্দ বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করে বসে আছে সেই উসখো-খুসখো চুল

আর ছেড়া জামা প্যান্ট পড়া ছেলেটি যে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় গায়ে হাত দিয়ে বলে ওঠে – দু-টাকা দাও না..... দুদিন ভাত খাইনি ,ভাত খাবো..।

—বিপ্লব, রিভোলিউশন, নৈতিক বিল্পব, তার সাথে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বহু বাধা আসবে, আঘাত হানবে রাষ্ট্র। পাল্টা কুযুক্তি দেবে, বই অপপ্রচার করবে।কিন্তু আমাদের নীতি, আদর্শে অবিচল থাকতে হবে। মাথায় রাখতে হবে -"বিপ্লবের আগে, বিপ্লবের সময়ে, বিপ্লবের পরে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোনও বিকল্প নেই। চালাতে হবে একটি চিন্তাধারার লড়াই। মস্তিষ্ক যুদ্ধ। এ যুদ্ধের কোনও নির্দিষ্ট ময়দান হয় না। চায়ের দোকান, মুদির দোকান থেকে স্কুল, কলেজ, ক্লাব; পথ ঘাট মাঠ পাড়া থেকে সোশ্যাল মিডিয়া, দূরদর্শন, কাগজ সর্বত্রই এর ময়দান।

-কিন্তু কজনই বা এগিয়ে আসবে এই পথে? সমাজের বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত, পরিবারের মানুসেরা তো নিজেরটুকু বুঝে নিয়েই খালাস। দেশটার কি হল সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপই নেই।

- খুব বাস্তব কথা। কিন্তু একজনকে তো এগিয়ে আসতেই হবে। দেখতে পেয়েছিল রাস্ট্রনেতাদের আসল নোংরা রুপ। তাঁর ভাবনার নিস্তেজ প্রদীপের সলতে তে আগুন জ্বালাতে চাইছে। চাইছে সংঘর্ষ। সংঘর্ষের পর নির্মাণ।

মেঘনাদের শাণিত যুক্তির আঘাতে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল সে।

একটা বিরাট স্বপ্নকে সামনে রেখে ছইয়ের উপর শুয়ে থাকা দুই বেপরোয়া ছেলে তখন একটি কথাই ভাবছে-

একদিনে হবে না, কিন্তু একদিন ঠিক হবে।

জাতির_গ্রহণ
শ্রীকুমার মন্ডল

সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ,
হাজার বছর পরেও জাতি বুঝলনা অবশেষ।

রাহু খায়নি, কেতু যায়নি,
চাঁদ এসেছিল মাঝে
পৃথিবীতে তাই দেখা যায়নি পুরো সূর্যের face,
জাতি বুঝলনা অবশেষ।

কে জানে এরা বোঝে কোন ভাষা,
কাটেনি এখনো অফিমের নেশা,
যুগ যুগ ধরে সেই চলে আসা জাত মূর্খের দেশ, জাতি বুঝলনা অবশেষ।

গ্রহণের কালে, খাইলে পরে,
ভাইরাস নাকি উথলে পড়ে,
অতিবেগুনির অপবিজ্ঞানও চলে বাজারে বেশ, জাতি বুঝলনা অবশেষ।

বিজ্ঞানকে মাড়িয়ে পায়ে
জ্যোতিষ এসে আগামী কয়।
বোঝেনা কি জাতি, বিজ্ঞান ছাড়া আগামীর আলো শেষ?
নাঃ, জাতি বুঝলনা অবশেষ।

বিজ্ঞান ফেলে জ্যোতিষ ভাঁটি
আম না খেয়ে চুষল আঁটি,
সাইন্সের ছেলে গোবর ঘাঁটি গর্ব ফলায় বেশ।
জাতি বুঝলনা অবশেষ।

সাইন্সে আমার পড়ছে ছেলে
গলায় মস্ত পৈতা ঝোলে
উপনয়ন আর বর্ণবাদও মাথায় ঢুকেছে বেশ

আর জাতিগত বিদ্বেষ।

পৈতা দিয়ে চিন্তা বাঁধা
বানিয়েছি এক আস্ত গাধা
শিক্ষিত ছেলে বয়ে নিয়ে চলে, মধ্যযুগের ক্লেশ।
অলীক অহংকারের ক্লেশ।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য বাদে
মন্দির, মজিদ ভাগ্যে মাতে
কে জানে এরা কাকে যে ডাকে, আসেনা তো এক লেশ!
তবু ভক্তরা মাতে বেশ।

চল গে সব হুজুগে মাতি
হুজুরেরা সব মারবে লাথি
মানুষের চেয়ে ম্যা ম্যা ডেকে হব একপাল মেষ
না না বুঝলনা অবশেষ।

গড্ডালিকার ছন্দ ধরে
অন্ধ হয়ে অন্ধকারে
অনুকরণের বিষোদগারে হবে জীবনের শেষ।
বাকি থাকবেনা অবশেষ।

চাঁদ সূর্যের সমাপতন,
হাজার বছর গেলেও মদন
বোঝেনা, তবু সখ করে বলে, হারাবেই চীন দেশ।
হাইস্যকর! হাইস্যকর!
জাতি তবু বুঝলনা অবশেষ।

দশ হাতে দশ আংটি পরে,
ভাগ্য গ্রহ ফেরাবে বলে,
জাতি তবু হবে আত্মনির্ভর, নাটকের এক শেষ।
জাতি বুঝলনা অবশেষ।

এই কি বিজ্ঞান মনস্কতা?
Sir এর মুখের কেতাবি ভাষা।
নিজেই তো sir মূর্তি দেখলে প্রনাম ঠোকেন বেশ।
জাতি বুঝলনা অবশেষ।

আই আই টি, আই আই এস
ডিগ্রিধারীর বিজ্ঞানী ভেশ
কুসংস্কার ছড়িয়ে বেড়ায় ISRO থেকে space,
সায়েন্স, ঘৃতাহুতিতেই শেষ
জাতি বুঝলনা অবশেষ।

বিবেকানন্দ, মঠ ও মিশন
মাদ্রাসারও প্রভাব ভীষণ
শিক্ষার সাথে অপবিজ্ঞানও, দেখে শিশু অনিমেষ।
এরা জাগবেনা অবশেষ।

গেরুয়া, সাদা নানান রঙে
বাবা গুলো সব সাজছে ঢং এ
লাইন দিয়ে চ্যালা বন্ধকী দেয় সেরিব্রাল কর্টেক্স।
ভক্ত বোঝেইনা অবশেষ।

কেউ তো আবার সাজে”নাস্তিক",
গড্ডালিকার ট্রেন্ডে ভাসতে।
নাস্তিকতা কী এতই সস্তা, ফ্যাশান মারার কেস?
আরে বিশেষ্য নয় বিশেষণ,
এটা বুঝলনা অবশেষ।

God, আল্লা, ঈশ্বর খেলা
সব খেলাতেই এই জাতি সেরা
খিদে পেট শিশু ধর্মই গেলে।
পলকের উন্মেষ?

সে ও ঘটবেনা পরিশেষ।

না না, সত্যিই সেলুকাস, গ্রহণ লেগেই আছে বেশ
আগামী হাজার বছরেও জাতি জাগবেনা অবশেষ,
এই জাতি বুঝবেনা অবশেষ।

ঈশ্বর কি নাস্তিক?
-বিজয় ভৌমিক

ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন বলে শোনা যায়, কিন্তু তাকে নাকি কেউ সৃষ্টি করেন নি অর্থাৎ তিনি নাস্তিক। এই ঈশ্বর অলৌকিক সত্ত্বা। তিনি আমাদের কাছে গুরুত্বহীন। ওনার চেয়ে আমাদের কাছে ঢের গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবীর ঈশ্বর, মানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি সমাজ সংস্কারক হিসাবে ভারতবাসীর অন্তরে অমর হয়ে আছেন । দেশের অশিক্ষা-কুসংস্কারের তিমিরে আলোকশিখা হয়ে এসেছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগরের ধর্মবিশ্বাস ঠিক কি ছিল? জানা যায় তিনিও নাকি তথাকথিত সর্বশক্তিমানের মতই নাস্তিক ছিলেন!

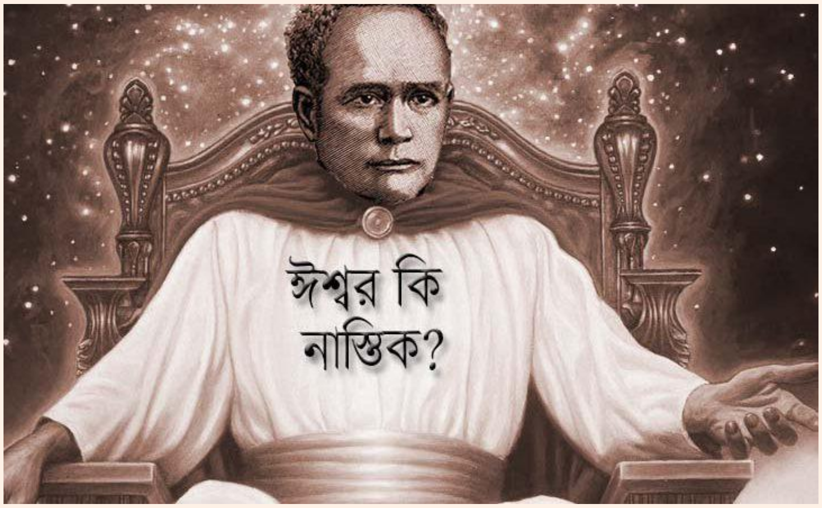

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখেছেন,” বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা বোধহয় তোমরা জানো না, যাহারা জানিতেন তাহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাহার সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না।.... ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন হয়, তখন আমাদের ধর্ম বিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়েছিল। যেসকল বিদেশীয় পণ্ডিত বাংলাদেশে শিক্ষকতা আরম্ভ করিলেন, তাহাদের অনেকের নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, একথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই, ডিরোজিও ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্য মৈত্রি স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া reason পূজা করিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের

ভাবনায় এদেশীয় ছাত্রদের ধর্মবিশ্বাসই ছিল। চিরকাল পোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর নাস্তিক হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি?" [1]

বিদ্যাসাগরের জীবনীকার গোঁড়া হিন্দু বিহারীলাল সরকার গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে লিখেছেন, "আধ্যাপকের বংশে জন্ম লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইয়া, হৃদয়ে অসাধারণ দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি, হিন্দু ধর্মের প্রতি তিনি আন্তরিক দৃষ্টি রাখিলেন না কেন?...বিদ্যাসাগর কালের লোক। কালধর্মই তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট হইয়াছে, হিন্দু ধর্মে আঘাত লাগিয়াছে...নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশধর বিদ্যাসাগর, উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবন সর্বস্ব গায়ত্রী পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন।" [2]

বিদ্যাসাগরের অন্যতম জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়ও একই কথা বলেন, "তাহার (বিদ্যাসাগরের) নিত্যজীবনের আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপরদিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের লক্ষণের পরিচয়ও কখনও পাওয়া যায় নাই।"[3]

বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্র বলেছেন, "অগ্রজ মহাশয় শৈশবকাল হইতে কাল্পনিক দেবতার প্রতি কখনই ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিতেন না। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুগণ দেবদেবী প্রতিমার প্রতি যেরূপ হৃদয়ের সহিত ভক্তি প্রকাশ করেন, তিনি জনক জননীকে বাল্যকাল হইতে তদ্রুপ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিতেন।" [4]

শম্ভুচন্দ্র আরও বলেন, "সেইদিনে 'ধর্ম প্রচারক ও কয়েকজন কৃতবিদ্য লোকের' প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর যা বলেছিলেন তাই সম্ভবত তার ধর্মচিন্তা- ' ধর্ম যে কি, তাহা মানুষের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোনো প্রয়োজন নাই।' " [5]

বিদ্যাসাগররের সাথে একবার রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ 'কথামৃতে' লিখিত আছে। রামকৃষ্ণ কোনোমতেই ঈশ্বরচন্দ্রের মুখ থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো স্থির বিশ্বাসভক্তির একটি কথাও আদায় করতে পারেন নি। বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "ঈশ্বরকে ডাকবার আর কি দরকার। দেখ, চেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাট আরম্ভ করলে তখন অনেক লোককে বন্দী করলে। ক্রমে প্রায় এক লক্ষ বন্দী জমে গেল। তখন সেনাপতিরা এসে বললে মহাশয়, এদের খাওয়াবে কে ? সঙ্গে এদের রাখলে বিপদ ছেড়ে দিলেও আমাদের বিপদ। কি করা যায় ? তখন চেঙ্গিস খাঁ বললেন, তাহলে, কি করা যায়, এদের সব বধ কর। তাই কচাকচ করে কাটার হুকুম হয়ে গেল। এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন, কই, একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো কোন উপকার হল না।"

অমিয়কুমার হাটি বলেন, "বিদ্যাসাগর কোনো ধর্মযাজকের কাছে ঘেষেননি- মন্দিরে যাননি। পূজা আর্চা করতেন না। কিন্তু ছিলেন মানবতায় উদ্বুদ্ধ দয়ার সাগর।" [6]

বিদ্যাসাগরের সময়কালেও মানুষেরা বর্ণবাদী চিন্তাধারা দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত ছিল। ফলস্বরূপ কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যরাই সংস্কৃতে লেখাপড়া করে পারতো, শূদ্রেরা সংস্কৃতে লেখাপড়া করতে পারতো না। বিদ্যাসাগর যে গোঁড়া চিন্তাধারা হতে মুক্ত ছিলেন তা বোঝা যায়, যখন তিনি শূদ্রদের জন্য সংস্কৃত কলেজের দরজা খুলে দেন। বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর চরিতে' এই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন-

" তৎকালে সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতীয় সন্তানগণ অধ্যয়ন করিত, ব্রাহ্মণের সন্তানেরা সকল শ্রেণিতে অধ্যয়ণ করিত। বৈদ্যজাতীয় বালকেরা দর্শন শাস্ত্র পর্যন্ত অধ্যয়ণ করিতে পাইত, বেদান্ত ও ধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিতে পাইত না। শূদ্র বালকের পক্ষে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন নিষেধ ছিল। অগ্রজ মহাশয় প্রিন্সিপাল হইয়া শিক্ষা সমাজে রিপোর্ট করেন যে হিন্দু মাত্রেই সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিবেক। শিক্ষাসমাজ রিপোর্টে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা আপত্তি করেন, শূদ্রের সন্তানেরা সংস্কৃত ভাষা কদাচ শিক্ষা করিতে পাইবে না। তাহাতে অগ্রজ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে পণ্ডিতেরা তবে কেমন করিয়া সাহেবদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিয়ে থাকেন? আর সভাবাজারের রাজা রাধাকান্তদেব শূদ্রবংশোদ্ভব, তবে তাহাকে কি কারণে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে সকল আপত্তি অগ্রজ মহাশয়ের দ্বারা খন্ডিত হইয়াছিল। তাহার মত এই যে, শূদ্রসন্তানেরা ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবেন, শাস্ত্রের কোনো স্থানে ইহার বাধা নাই। কেবল ধর্ম শাস্ত্র স্মৃতি অধ্যয়ন করিতে পারিবেন না। তজ্জন্য শূদ্রের সন্ততির শ্রেণীতে অধ্যয়ন রহিত হইয়াছে। তদবধি শূদ্রজাতীয় সন্তানগণ সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত ভাষা অবাধে শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। " [7]

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন এক বছরে বিস্তর পরিবর্তন আনেন। কর্তৃপক্ষ তাতে সন্তুষ্ট ছিল কিন্তু দ্বিধাও ছিল। তাই বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইনকে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়। ব্যালেন্টাইন রিপোর্ট পেশ করেন। তাতে বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থার গুণের পাশাপাশি ত্রুটিও উল্লেখ করে বলেন কিছু নতুন বই পড়িয়ে ত্রুটি সংশোধন করতে। "তার মতে, ত্রুটি প্রধানত এই যে, সংস্কৃত জ্ঞানে সত্যের একটা ধারা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক; ইংরেজি জ্ঞানে দেখা যাওয়া উচিত সত্যের এক পৃথক ধারা।ছাত্রেরা ভাবে, সত্য দ্বিমূর্তি (Truth is double)। ব্যালেন্টাইন প্রস্তাব করলেন, তার নিজের রচিত মিল এর লজিক এর (J.S. Mill Logic) সংক্ষিপ্তসার ও পাশ্চাত্য আদর্শবাদী দার্শনিক বিশপ বার্কলের 'তত্ত্বান্বেষণ' (Berkeley, Inquiry) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হোক। বার্কলের ভাববাদ অনেকটা ভারতীয় ভাববাদের মত- দুয়ের মিল দেখবে ছাত্ররা। তাতে দু দেশের দর্শনের প্রতিই শ্রদ্ধাবান হবে- এই ছিল ব্যালেন্টাইনের যুক্তি।" [8]

শিক্ষাপরিষদ ব্যালেন্টাইনের রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠালে বিদ্যাসাগর পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনার কোনো প্রয়োজন অনুভব করলেন না। বিদ্যাসাগর এর এক সুদীর্ঘ উত্তর লিখে পাঠালেন। বিদ্যাসাগর বলেন, " কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন না পড়িয়ে উপায় নেই।.... বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈত নেই।.... সংস্কৃতে যখন এগুলি শেখাতে হবে, এদের প্রভাব কাটিয়ে তুলতে প্রতিষেধকরূপে ইংরেজিতে ছাত্রদের দর্শন পড়ানো দরকার।

বিদ্যাসাগরের মতে, বার্কলের Inquiry সে ধরণের যথার্থ পাশ্চাত্য দর্শন নয়- ইউরোপেও এখন আর তা (বার্কলে) খাটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না। কাজেই এতে কোনোক্রমেই সে কাজ (প্রতিষেধকের কাজ) চলবে না। বার্কলের দর্শনে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের প্রতি ভারতীয় ছাত্রদের শ্রদ্ধা কমা দূরে থাক আরও বেড়ে যাবে।

দ্বিতীয় কথা: 'সত্য দ্বিবিধ'- ছাত্রদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মাবে, ব্যালেন্টাইনের এই ভয়ও অমূলক। বিদ্যাসাগর তর্ক তুললেন-

সংস্কৃত ও ইংরেজি দু'ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য পড়ে যে যথার্থরূপে ধারণা করেছে, তার কাছে সত্য- সত্যই। সত্য দু-রকম- এ ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। 'সংস্কৃত কলেজে আমরা যে শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করেছি, তাতে এরূপ ফলের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই দূর হবে।' " [9]

ব্যালেন্টাইনের উত্তর দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর আরো বলেছিলেন," দুঃখের বিষয়ে আমি ব্যালেন্টাইনের সঙ্গে একমত নই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানো সম্ভব নয়। সম্প্রতি দেশে বিশেষ করে কলকাতায় ও তার আশেপাশে পণ্ডিতদের মধ্যে এক অদ্ভুত মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শাস্ত্রে যার বীজ আছে এমন কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে সেই সত্য সম্বন্ধে তাদের শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা জাগা দূরে থাক, তার ফল হয় বিপরীত অর্থাৎ সেই শাস্ত্রের প্রতি তাদের বিশ্বাস আরো গভীর হয় এবং শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরো বাড়তে থাকে। তারা মনে করেন যেন শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে, বিজ্ঞানের জয় হয়নি।" [10]

বিদ্যাসাগর তার ভাই শম্ভুচন্দ্রের কাছে যখন শুনতে পান, তার বিধবা বিবাহের আন্দোলনের ফলে তার আত্মীয় পরিজন তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারেন, তখন বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।...এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।...আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব।" [11]

বিধবা বিবাহ চালু করার ব্রতে যখন বিদ্যাসাগর ব্রতী তখন অনেক হিন্দু শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের আপ্রাণ বিরোধীতা করেছিলেন। নরকের ভয় দেখিয়ে ভীত করতে চেয়েছিলেন। তাদেরই একজনের উত্তরে বিদ্যাসাগর ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন, " ...যদি নরক নামে বাস্তবিক কোনও স্থান থাকে, এবং কাহারও পক্ষে, সেই নরকপদবাচ্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা থাকে; তাহা হইলে টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল সর্বাগ্রে নরকে যাইবেন, এবং নরকের সকল জায়গা দখল করিয়া ফেলিবেন, আমরা আর সেখানে স্থান পাইব না। " [12]

বিদ্যাসাগরকে অনেকে নাস্তিক বলেছেন, অনেকে বলেছেন তিনি তেমন ধর্মাচারী ছিলেন না,ধর্ম বা ঈশ্বর নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতেন না।তিনি সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনকে ভ্রান্ত বলতে সঙ্কোচ বোধ করেননি। তারপরেও বিদ্যাসাগরের নানা লেখায় সৃষ্টিকর্তার উল্লেখ মেলে। যেমন বিদ্যাসাগর তার লেখা 'বাল্যবিবাহের দোষে' বলেছিলেন, " সৃষ্টিকর্তার এই বিশ্বরচনা মধ্যে সর্বজীবেই স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি ও তদুভয়ের সংসৃষ্টি দৃষ্টি গোচর হইতেছে। " হয়তোবা বিদ্যাসাগর সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতেন। তবে খুব সম্ভবত সেই সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর প্রচলিত ধর্মের ঈশ্বর নয়। সমাজের কুপ্রথার সাথে আজীবন লড়াই করেছেন বিদ্যাসাগর। তারপরেও কিছু ক্ষেত্রে তিনি যে সমাজে বাস করতেন, সেই সমাজের কিছু প্রথা মেনে নিয়েছিলেন। তিনি পৈতা পড়তেন। চিঠি লেখার শুরুতে সবসময় 'শ্রী শ্রী হরি শরণম' লিখেছেন। মা মারা গেলে তার শ্রাদ্ধ করেছিলেন। অনেকে বলতে পারেন, বিদ্যাসাগর তো শাস্ত্র দিয়ে শাস্ত্র খণ্ডন করেছিলেন। কিন্তু সত্য হল শাস্ত্রসম্মত বলেই তিনি বিধবা বিবাহের প্রবর্তন করেন নি বরং বিধবাদের যন্ত্রণা যখন তার মর্মে আঘাত করেছিল, তখন তাতে সাড়া দিয়ে ঈশ্বর পথ খুঁজতে তৎপর হয়েছিলেন। তৎকালীন ধর্মভীরু সমাজের সংস্কারের পথ যখন শাস্ত্রের মধ্য দিয়েই গিয়েছিল, তখন বিদ্যাসাগর সেই পথই অবলম্বন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে বলেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ, আচারের যে হৃদয়হীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে মেরেছে, রক্তপাত করেছে, নাড়ীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে দেবতা বলে মানেননি, তাকে আঘাত করেছেন। অনেকে বলবেন যে, তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ মাত্র ছিল; তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে তো শাস্ত্রবচনের প্রভাবে নয়। তিনি তার করুণার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের বাহক রূপে দেখেন নি। তিনি কতকালের পুঞ্জিভূত লোকপীড়ার সম্মুখিন হয়ে নিষ্ঠুর আচারকে দয়ার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করেন নি, হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার করে গেছেন।" [13]

তথ্যসূত্র –

[1] অনন্য বিদ্যাসাগর- অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

[2] অনন্য বিদ্যাসাগর- অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

[3] অনন্য বিদ্যাসাগর- অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

[4] বিদ্যাসাগর চরিত- শম্ভুচন্দ্র

[5] ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ ও বিদ্যাসাগর – গৌতম গঙ্গোপাধায়

[6] বিদ্যাসাগর: বিজ্ঞানমনস্কতা ও জনস্বাস্থ্যচেতনা- অমিয়কুমার হাটি

[7] বিদ্যাসাগর চরিত- শম্ভুচন্দ্র

[8] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর – গোপাল হালদার

[9] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর – গোপাল হালদার

[10] অনন্য বিদ্যাসাগর- অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

[11] সংস্কৃত পণ্ডিত ও বাংলার নবজাগরণ – রমেশচন্দ্র মজুমদার

[12] ব্রজবিলাস- বিদ্যাসাগর

[13] বিদ্যাসাগর – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহায়ক গ্রন্থ-

পশ্চিমবঙ্গ, বিদ্যাসাগর সংখ্যা, ১৪০১ প্রকাশক – তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিদ্যাসাগরের রচনাবলী

অন্ধবিশ্বাসের গর্ভে ‘করোনা মাতা’র জন্ম!

-সন্তোষ শর্মা

করোনা মহামারীর এই দুঃসময়ে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের আগেই এই ভারত ভূমিতে মহামারী থেকে মানবকে উদ্ধার করতে দেবীর জন্ম হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রদেশে চলছে এই নতুন দেবী করোনা মাতার আরাধনা। করোনা থেকে রক্ষা পেতে দেবীর আরাধনার এই খবর স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে জন সমুদ্রে। এমন সময় এই বাংলায় করোনা দেবীর পূজা দেখে অবাক আমরা যুক্তিবাদীরা। শেষে যুক্তিবাদী আন্দোলনের সৈনিক হিসেবে আমি একটি লেখা লিখে কলকাতা থেকে প্রকাশিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল’The Bengal Herald’-এর এক্সিকিউটিভ এডিটর রূপসা ঘোষাল এবং বিট্টু রায়চৌধুরীকে পাঠিয়েছিলাম। আমার লেখাটি এই নিউজ পোর্টালে দু'ই পর্বে প্রকাশিত হয়। এখানে সেই লেখাটি তুলে ধরছি।

বুধবার ১০ জুন ২০২০

অন্ধবিশ্বাসের গর্ভে’করোনা মাতার জন্ম!

পর্ব ১

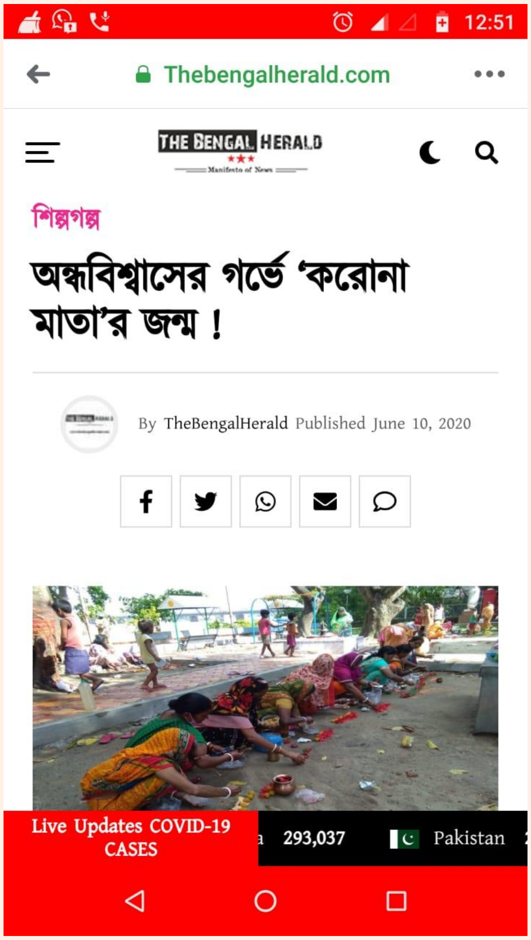

করোনা ভাইরাসের সংকটের মাধ্যে আজও সকালে মেঘলা আকাশে সূর্য উকি দিচ্ছে। অন্য দিনের মতন অনকে মহিলা ও পুরুষ স্নান করতে বরানগরের আলমবাজার গঙ্গা নদীর তীরে ভিড় করে এসেছেন। কিন্তু আজকের গঙ্গার ধারে এক নতুন পুজোর সূচনা করতে। এই করোনা ভাইরাসের মহামারীর সংকটের বিষ থেকে ভক্তদের উদ্ধার করতে ধরণীতে অবতীর্ণ হয়েছে এক দেবীর’মাতা করোনা’। ধুপ ধুনো, ধূপাকঠি জ্বালিয়ে। ৯টি কলা পাতায় গুড়, লবঙ্গ, ফল ও ফুল সারি সারি করে সাজানো। এর পর সারিবদ্ধ মহিলারা হাত জোড় করে গান সুরে করোনা দেবীর আরাধনা শুরু করলেন,’করোনা মাতা আমাদের সব দুঃখ কষ্ট হরণ করুন। মা করানো মহামারীর সংকট থেকে মুক্তি পথ দেখান। বাড়ির, সমাজের, দেশের মানুষ করোনা রোগ থেকে রক্ষা করুন।’

করোনা দেবীর পুজোর খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা এবং এক হিন্দী পত্রিকার সাংবাদিক লক্ষণ ভারতী পুজোর স্থলে উপস্থিতি। তিনি দেখলেন,’গঙ্গার তীরে আজ এক নতুন পুজোর আয়োজন চলছে। করোনা দেবীর পুজো। পুজোয় অংশগ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে কেউ মুখে মাস্ক পারেননি। স্যানিটাইজার বা সামাজিক দূরত্বের বালাই নেই। সোজা কথায়, এই পুজোর পরিবেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু করোনা দেবীর

পুজোয় মগ্ন মহিলারা এই সব কথায় গুরুত্ব দিতে নারাজ। পুজো শেষে করোনা মায়ের প্রাসাদ কাউকে খেতে দেওয়া হ'ল না। মাটিতে পুঁতে দেওয়া হ'ল। লক্ষণজি পুরো ঘটনা স্মার্ট ফোনে ছবি ও ভিডিও তুললেন। এরপর আমাকে ফোন করে বললেন,'তুমি কি জানো এই মহামারীতে করোনা মাতা ধরণীতে পা-রেখেছেন! তোমাকে ছবি ও ভিডিও পাঠাচ্ছি, দেখো।'

কিছু ক্ষণ পরে আমার মোবাইলের হোয়াটস অ্যাপে কয়েকটি ছবি ও ভিডিও এলো। দেখে অবাক হলাম। সত্যিই এক আজব কাণ্ড। আমরা আজ কোন যুগে বাস করছি! যেখানে পৃথিবী জুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রামণের প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ছেন, ভাইরাসের হাত থেকে নিস্তার পেতে বৈজ্ঞানিকরা দিনরাত প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টা করে চলেছেন। সেখানে ভারত'-এ সব কিছু ছেড়ে করোনা মাতার পুজোয় মত্ত হয়ে উঠেছেন কিছু মানুষ। সত্যি আশ্চর্যের বিষয়।

লক্ষ বছর আগে মানুষ বন -জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় থাকত। সেই সময় নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে রোগ, মহামারীর মতো ঘটনাকে ভয় পেত মানুষ। তারা মনে করত, এই সমস্ত ঘটনার নেপথ্যে কোনও অলৌকিক শক্তির হাত রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী থেকে নিজেকে এবং পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে সংঘবদ্ধ হ'ল মানুষ। শুরু হ'ল বিভিন্ন দেব-দেবীর পুজো। সোজা কথায় মানুষের মনের কোণে লুকিয়ে থাকা ভয়-ভীতি থেকে ঈশ্বরের জন্ম হ'ল। সভ্যতার অগ্রগতি সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হ'তে লাগল মন্দির, মসজিদ, গির্জা। এক শ্রেণির মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের দূত বলে নিজেদের ঘোষণা করতে লাগলেন। তাঁরা দেবতা রূপে পুজোত হ'তে লাগলেন। আর সাধারণ মানুষ নিজেকে ভূত, ভগবান, ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে জীবন কাটাতে লাগলেন। কোভিড মহামারীতেও একই বিষয় আমরা পরিলক্ষিত করছি।

আজ করোনা মাতা'র পুজোয় মত্ত এই মানুষগুলো অন্ধ বিশ্বাসের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে ফেলেছেন। সেই কারণে বৈজ্ঞানিক যুক্তি, নিয়ম বিধির তোয়াক্কা না-করে'গো করোনা, গো'মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। মুখে মাস্ক, সামাজিক দূরত্বের কোনও বালাই নেই। লকডাউন ভেঙে, সামাজিক বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে করোনা মাতার পুজো করতে গিয়ে আজ কেউ কোভিড আক্রান্ত হলে দায় কার?

শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, অসম-সহ বিভিন্ন রাজ্যে করোনা মাতা'-কে পুজো করার হুজুক উঠেছে।সম্প্রতি, কলকাতা'র ময়দান, রবীন্দ্রপল্লী, রায়গঞ্জ, আসানসোল, অন্ডাল, শিলিগুড়ি'র বিভিন্ন জায়গায় করোনা মাতা'র পুজো হয়ে গিয়েছে। উদ্যোক্তাদের যুক্তি, এই পুজো করলে ভাইরাস থেকে মুক্তি মিলবে! অনেকের দাবি, করোনা দেবী তাঁকে পুজো করার জন্য স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন। অবিলম্বে পুজো না-করলে সব ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকিও রয়েছে এই স্বপ্নাদেশে। এই অন্ধ অবিশ্বাস যে বাংলা'র ক্ষেত্রে কতটা ক্ষতিকর, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

'করোনা মাতা'পুজো কেন?'অ্যাসিডিটি বাবা'র নয় কেন?

১৬ জুন ২০২০

পর্ব ২

জুন মাস থেকে শিথিল হয়েছে লকডাউন। শুরু হয়েছে আনলক ওয়ান। কনটেনমেন্ট জোন ছাড়া প্রায় সর্বত্রই শিথিল নিয়মকানুন। কলকাতা'র বেশিরভাগ মন্দিরের দরজাই খুলে গিয়েছে। ভিড় জমিয়েছেন বহু মহিলা। করোনার কথা ভুলে অনেক ঈশ্বর বিশ্বরীরা মাস্ক ছাড়াই জমায়েত হলেন মন্দিরে। আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র নিয়মের কথা মাথায় রেখে মাস্ক পরেছিলেন ঠিকই। তার ফলে সংক্রমণের আশঙ্কা যে অনেকটাই বাড়বে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। করোনা সংক্রমণ রুখতে সামাজিক দূরত্ব বজায়ের বিধি মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সামাজিক দূরত্ব বিধির কোনও বালাই নেই। পরিবর্তে একসঙ্গে ভিড় জমিয়ে পুজো দিচ্ছেন বহু মহিলা। কোভিড বিধি লঙ্ঘন করেই চলছে পুজোপাঠ।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও কালীঘাট, কিংবা তারাপীঠের দরজা বন্ধ পরে আছে।

করোনা মাতার পূজা নিয়ে যা লিখেছিলাম তা অসংখ্য মানুষের কাছে ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়ে গেছে। অনেকে বিভিন্ন মন্তব্য করতে শুরু করেছেন। খবরটি ভাইরাল হতে যথারীতি মসকরায় মেতে উঠেছে একশ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালী সমাজ। নানারকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ঝড় উঠেছে ফেসবুক জুড়ে।

আচ্ছা আপনাদের ব্যঙ্গের পালা শেষ হলে একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবুন তো, এটা করে আদৌ কোনো কাজের কাজ হ'ল কি-না। নিজেকে বিশাল কিছু বোদ্ধা প্রমান করা ছাড়া আর কোনও বৃহৎ উদ্দেশ্য এতে সাধিত হলো কি-না। মানে এমন কোনও মহিলা আছেন, যিনি আপনাদের ব্যঙ্গ শুনে, (হ্যাঁ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নয়), শুধুমাত্র ব্যঙ্গ শুনেই বুঝে ফেললেন তাঁর'ভুল'টা কোথায় এবং প্রতিজ্ঞা করলেন এরপর থেকে আর এমন ভুল তিনি করবেন না?

মানুষ কেন করোনাপুজোর মত হাস্যকর কুসংস্কারে বিশ্বাস করে? এক ধরনের বিপন্নতা বোধ থেকে। করে এক ধরনের অসহায়তা থেকে। করে ছোটবেলা থেকে ভাববাদী পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠার সীমাবদ্ধতা থেকে। এই মূল কারণগুলি ধরতে এবং তার নিরসন করতে না পারলে শুধু ব্যঙ্গ করে এসব কুসংস্কার বন্ধ হবে না বা সমাজ এক পা-ও এগোবে না। আজ যারা করোনামাতার পুজো করে, খোঁজ নিয়ে দেখুন তো তারা'অ্যাসিডিটি বাবা'বা'মাথায় যন্ত্রণা মাতা'র পুজো করে কিনা? না, করে না। কেন করে না? কারণ এই দুই রোগের ওষুধ আবিস্কৃত হয়ে গেছে বহুদিন আগেই। সেই ওষুধ বাজারে সহজলভ্য, এবং তা দামেও রীতিমত সস্তা। ফলে অ্যাসিডিটি বা মাথা যন্ত্রনার জন্য তাঁদের কোনও কাল্পনিক ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হওয়ার দরকার পড়ে না। কিন্তু করোনার জন্য পড়ে। কারণ এর ওষুধ অমিল। প্রিভেনশন করতে হলে যে কঠোর বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে, বাইরে না বেরিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে তা এইসব শ্রমজীবী পরিবারের পক্ষে মেনে চলা সম্ভব নয়। তাঁদের সংসারটা নিশ্চয় শহুরে বাবুরা চালিয়ে দিয়ে আসবেন না। এমনিতেই টানা তিন মাস লকডাউনের কারণে অধিকাংশ পরিবারকেই লড়তে হচ্ছে

তীব্র দারিদ্রের সঙ্গে। বাড়িতে হয়তো ছোট ছেলেটার মুখে তুলে দেবার জন্য একমুঠো চালও আর পড়ে নেই। তারমধ্যে যদি আবার সংক্রমন ঠেকাতে কাজকর্ম ছেড়ে বাড়ি বসে থাকতে হয় তাহলে অনাহারে মারা পড়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। ফলে কাজে বেরোতেই হবে এদের। এইসব শ্রমজীবী মানুষেরা যেধরনের কাজকর্ম করেন তাতে তথাকথিত ভদ্রশ্রেণির মতো ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে কাজ করা বা ক্ষনে ক্ষনে বহুমূল্য স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোওয়াও অসম্ভব। অর্থাৎ একদিকে তীব্র দারিদ্রের কারণে মৃত্যুভয়, অন্যদিকে কাজে নামার কারণে মৃত্যুভয় বা প্রিয়জনের বিয়োগের আশঙ্কা, এই দৈত চাপই তাকে বাধ্য করেছে এক করোনা মাতা নামক কাল্পনিক শক্তির কাছে মাথা নত করতে। লড়াইয়ের শক্তি যেখানে নেই আত্মসমপর্নই সেখানে বুদ্ধিমানের কাজ। সেটাই তারা করেছে। ঠিক যেভাবে পাড়ার প্রভাবশালী দুর্নীতিবাজ নেতার সাথে পাঙ্গা নেবার ক্ষমতা আপনার নেই বলে আপনি রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হলেই গ্যালগেলে হয়ে হাঁসেন, হাত কচলে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করেন, ঠিক তেমনই। ওদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেটুকু কুলিয়েছে সেটুকুই করেছে। করোনা পুজোর ফুলই ওদের স্যানিটাইজার। পুরোহিতের মন্ত্রই ওদের পিপিই। অন্তরের ভক্তিই ওদের সোশ্যাল ডিসট্যান্স। ওদের এই আর্থিক অসহায়তা, মানসিক দুর্বলতা ও শিক্ষার অভাবের কারণে অপরিসীম অজ্ঞতার জায়গাটা ধরতে হবে। তবেই ওদের বোঝা যাবে।

ব্যঙ্গ না করে বরং ওদের এই অবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদের প্রতি প্রশ্নের আঙুল তুলুন। প্রশ্ন করুন কেন স্বাধীনতার এত বছর পরেও সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় নি। কেন শিক্ষাক্রম রচনায় বৈজ্ঞানিক চেতনার বিস্তারের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। কেন আজও দেশের অধিকাংশ মানুষের রোজগারের অনিশ্চয়তা দূর করা যায় নি? কেন'সবার জন্য স্বাস্থ্য'স্লোগান শুধু স্লোগান হয়েই রয়ে গেল। এই প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ওদের করোনাপুজোর কারণগুলি। যেদিন এই রাষ্ট্র প্রত্যেকটি নাগরিকের সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে, যেদিন শিক্ষাক্রমে বৈজ্ঞানিক চেতনার বিস্তারকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। যেদিন চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সমস্ত শ্রেণির নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হবে, যেদিন তীব্র আর্থিক অসাম্য ও রোজগারের অসহায়তা দূর করা সম্ভব হবে, সেদিনই শুধুমাত্র এসব করোনা পুজো, শীতলা পুজো এসবের অবসান ঘটবে। তার আগে নয়। এটাই একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ।

এই বিষয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সভাপতি প্রবীর বলেন,'যখনই কোনও মহামারী দেখা দেয় তখন নতুন দেব - দেবীর আবির্ভাব, পূজা ইত্যাদি নিয়ে গুজব ছাড়ানো হয়। আসল সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে ইটা করা হয়। সবার আগে ইটা বলতে চাই, ঈশ্বর বলে কেউ নেই। ঈশ্বর সর্ব কালের সেরা গুজব। এই গুজবকে ভর করে ধর্ম, ধর্মীয় স্থানের ব্যবসা আজও চলেছে। কিছু সুবিধাবাদী মানুষ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে ডুবে থাকা মানুষের শোষণ করার জন্য কাল্পনিক দেব, দেবী, মাতার গুজব রটায়। কোনও মাতা, দেবী ইত্যাদি করোনা ভাইরাস থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে না। একমাত্র বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন বা ওষুধই রোগ থেকে মুক্ত করতে পারে। অতএব গুজবে কান দেবেন না। গুজব ছাড়াবেন না। এই করোনা ভাইরাসের থেকে বাঁচতে মুখে মাস্ক পড়ুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।'

স্কুলের শৌচাগারে অশরীরী ছায়ামূর্তি রহস্য

-সন্তোষ শর্মা

শুক্রবার ২৮ জুলাই ২০১৭

এক ছাত্রী স্কুলের শৌচাগারে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ভূত-ভূত ভূত চিৎকার করে বেরিয়ে আসে এবং ছাত্রটি নিজের ক্লাস রুমে ঢুকে আবার ভূত-ভূত বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। ছাত্রীর নাম শম্পা কুণ্ডু। সে দশম শ্রেণীর ছাত্রী। শম্পার এই ভয়ার্থ অবস্থা মুহূর্তেই ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রীদের মধ্যে ভুতুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

এক ছাত্রী দৌড়ে টিচার রুমে গিয়ে বললো,"স্যার তাড়াতাড়ি চলুন আমাদের ক্লাসে একটি মেয়ে শম্পা ভূত -ভূত চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

"একি। চল চল। দেখি কি হয়েচ্ছে" এই বলে একজন শিক্ষক হন্তদন্ত করে ক্লাসে ছুটে এলেন। শম্পাকে দেখেই শিক্ষক বললেন,"এখানে কেউ ভিড় করবি না। সবাই একটু সরে দাঁড়া। কেউ এর চোখে মুখে তাড়াতাড়ি জলের ঝাপটা মার। হাত পাখা দিয়েএকটু বাতাস দে।" একজন বোতল থেকে জল হাতে নিয়ে শম্পার চোখে মুখে দু তিন বার ঝাপটা মারল। অন্য জনে হাত পাখা দিয়ে বাতাস দিলো। কিছুক্ষণ পর শম্পার জ্ঞান ফিরলো। সে চুপ চাপ বড় বড় চোখ করে চারিদিকে তাকাতে লাগল।শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন,"কীরে শম্পা তোর কি হয়েছে ? তুই ভূত - ভূত বলে কেন চিৎকার কর উঠেছিলি ?"এক জন জলের বোতল শম্পার দিকে এগিয়ে দেয়। বোতল থেকে গলায় একটু জল ঢেলে। দুহাত দিয়ে মুখ মুছে চুপ করে তাকিয়ে রইল সে। চোখে মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। শিক্ষক মহাশয় ফের জিজ্ঞেসা করলেন,"হটাৎ ভূত -ভূত বলে কেন চিৎকার করছিলি? দিনের বেলায় কি দেখে এত ভয় লাগল?"

দেখে মনে হচ্ছে শম্পা প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছে। গলার স্বর বসে গেছে। ভাঙ্গা নিচু স্বরে শম্পা বললো,”স্কুলের শৌচাগারে ভূত আছে। একটি ছেলের ভূত। আমি নিজের চোখে ওখানে ভূত দেখেছি। শৌচাগারে ঢুকলেই চোখে পড়ল গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে একটি ছেলের ছায়ামূর্তি। সে আমাকে নিস্পলক চোখে দেখছিল।”

"এই দিন দুপুরে ভূত কোথা থেকে এলো! ভূত প্রেত্নি বলে কিছুই হয় না। মনে হচ্ছে তোর ভিমরতি হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে তোর শরীর স্বাস্থ্য ঠিক নেই অসুস্থ বোধ হচ্ছে। যা তোকে ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। বাড়ি ফিরে যা, একটু আরাম কর।”

শিক্ষক শম্পাকে স্কুল থেকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

স্কুল থেকে শম্পাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে দেখে মা জিজ্ঞেস করলেন,”আজ স্কুল কি জলদি ছুটি হয়ে গেল?”মায়ের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে শম্পা সোজা নিজের ঘরে চলে গেল। অনেক ক্ষণ পরেও মেয়েকে ঘর থেকে বের না হতে দেখে মা শম্পার ঘরে গেলেন। দেখলেন, মেয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছে। মেয়ের মাথার আদুরে স্পর্শ করে মা জিজ্ঞেস করলেন,”অনেক ক্ষণ হলো স্কুল থেকে এসেছিস। চল একটু ডাল ভাত খাইয়ে দি।”

মায়ের কথার মুখ ফিরে তাকাল। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। এই দেখে মা বললেন,”আজ তোকে এত ক্লান্ত দেখছি। শরীর স্বাস্থ্য ভালো ঠেকছে না। স্কুলে কিছু হয়েছে নাকি?”মায়ের কথা শুনে শম্পা বিছানা থেকে উঠে বসল। কোনও কথা না বলেই শম্পা নিজের মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো।”আরে কাদছিস কেন? কি হয়েছে বল? স্কুলে কেউ কিছু বলেছে? মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মা। দুহাত দিয়ে নিজের চোখের জল মুছে দিয়ে শম্পা বললো,”আজ স্কুলের শৌচাগারে ঢুকতেই চোখে পড়ল গলায় ফাঁস দিয়ে একটি ছেলের ঝুলছে ছায়ামূর্তি। সে আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সে আমাকে দুহাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করে। এই দেখে প্রচণ্ড ভয়ে আমার হাত পা কাঁপতে থাকে, কোনও রকমে শৌচাগার থেকে দৌড়ে ক্লাস রুমে গেলাম। এর পর কিছু মনে নেই। বন্ধুরা বলেছে আমি নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। মা, আমার এখনও খুব ভয় করছে। “মেয়ের কথা শুনে মা- ও যথেষ্ট শিহরিত এবং আতঙ্কিত হলেন। শম্পার সঙ্গে কোনও অঘটন ঘটেনি এটাই অনেক। মা বললেন,”ভয়ের কিছু নেই। চল আজ বিকেলে এক ওঝার কাছে তোকে নিয়ে যাই। উনি তোকে ঝাড়ফুঁক করে সব ঠিক করে দেবেন।”

স্কুলের শৌচাগারে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে একটি ছেলের ছায়ামূর্তি! দেখার পর শম্পা প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছিল। তার মনে ভুতুড়ে ভয়ের আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এই মানসিক চাপ দূর করতে চিকিৎসার জন্য সরকারি হসপিটাল বা কোনও মনোচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া প্রযোজন, কিন্তু ওঝা বা তান্ত্রিক ভূতে ভরের ঝাড়ফুঁক করতে পারে,

এই কথায় বিশ্বাসী কুন্ডু পরিবারের লোক জন শম্পাকে বসুদেবপুর গ্রামে এক ওঝা দম্পতি শীতল বাগ ও শিখা বাগের কাছে নিয়ে গেলেন

শনিবার ২৯ জুলাই ২০১৭

আজ সকালে শম্পা আবার স্কুলে গেলো। তাকে দেখেই সহপাঠি থেকে শুরু করে অন্যান্য ছাত্রীরা জিজ্ঞাাবাদ করতে লাগল,"তোর শরীর ভালো আছে তো। কাল সে সত্যিই কি স্কুলের শৌচাগারে ভূত দেখেছিল না ?"

শম্পা চেঁচিয়ে বলল,"হ্যা। হ্যা। স্কুলের শৌচাগারে ভূত আছে। অনেক অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাল বিকেলে মা আমাকে বাগ ওঝা দম্পতির কাছে নিয়ে গেছিল। আমার উপর একটি অতৃপ্ত আত্মা ভর করেছিল। ওঝা ঝাড়ফুঁক করে ভূত তাড়িয়ে দেয়। এরপর আমার বাহুতে একটি তাবিজ বেঁধে দিয়েছে। ওঝাই বলেছেন এখানে অনেক অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁরা সুযোগ পেলেই আমাদের ঘাড় মটকে দেবো।"শম্পার মুখের কথা কিছু ক্ষণের মধ্যেই কানে কানে পুরো স্কুলে ছড়িয়ে পড়ে স্কুলের শৌচালয় ভুতুড়ে আড্ডা হয়ে আছে। এক পর একে একে যেই না ছাত্রীরা শৌচাগার যাচ্ছে, তারাই নাকি ওখানে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে একটি ছেলের ছায়ামূর্তি দেখছে। সে নাকি নিস্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে। এই দেখে ছাত্রীরা প্রচন্ড ভয়ে ভূত -ভূত চিৎকার করে বেরিয়ে আসছে। কেউবা ভয়ে ভূত -ভূত বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে ভুতুড়ে আতঙ্কে সব্বাই এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করলো। কিছু ক্ষণের মধ্যেই প্রায় ১৬ জন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্কুলে ভূতের আতঙ্কের খবর আশেপাশে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র- ছাত্রীদের মা, বাবা, অবিভাবক সবাই স্কুলে ছুটে আসেন। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা ও সাংবাদিকরাও দৌড়ে আসেন। এই স্কুলে ভূতের আতঙ্কের ফলে অসুস্থ অনেক ছাত্রীদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়।

মুহূর্তের মধ্যেই সংবাদের শিরোনামে উঠে আসে বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর থানা এলাকার মির্জাপুর হাই স্কুলের শৌচাগারে ভুতুড়ে আতঙ্কের খবর।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহানন্দ কুণ্ডু জানান,"এই স্কুলে ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে সংখ্যা প্রায় ৮০০। আশপাশের রায়বাঘিনি, হন্নে, ঝোড়ো মুরাহাট, হাজরাপুকুর, জলজলা, হরিহরচাকা, দেহয়ুাবনি গ্রামের গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়ে। অনেকেই সকালে মুড়ি খেয়ে দুপুরে মিড-ডে মিল খায়। স্কুলে এমনিতেই শারীরিক ভাবে অসুস্থ কিছু ছাত্রী আছে, যাদের নিয়মিত বাইরের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।"মহানন্দবাবু বলেন,"ওই ছাত্রীদেরই কয়েক জন শৌচাগারে গিয়ে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তা দেখে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে আরও পড়ুয়াদের মধ্যে। পুরোটার পিছনেই রয়েছে ভুল ধারণা।"

তিনি জানান,"হাজরাপুকুর গ্রামের বাসিন্দা দশম শ্রেণির এক ছাত্রী কিছু দিন আগে স্কুলের শৌচাগারে অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে সঙ্গে সঙ্গে কোতলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান। প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ বোধ করায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বাড়ি গিয়ে ফের অসুস্থ বোধ করায় ওই ছাত্রীর

প্রধান শিক্ষক মহানন্দ কুন্ডু

পরিজনেরা পাশের গ্রাম বাসুদেবপুরে দুই ওঝার কাছে নিয়ে যায় তাকে।

সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে বাসুদেবপুরের এক ওঝা। এক ছাত্রীকে ঝাড়ফুঁক করে সেই ওঝা বলে দেয়, মেয়েটিকে ভূতে ধরেছিল। তাতেই আতঙ্ক আরও বেড়েছে। এই অবস্থায় স্কুলের মেয়েদের শৌচাগার সারানো বা রং করার দাবি তুলেছেন পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা।"

শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাস আর ভূতের গুজবের চোটে পড়াশোনা ব্যাহত মির্জাপুর হাই স্কুলে।

ওঝার ঝাড়ফুঁক

কিন্তু স্কুলের শৌচাগারে ভূত আছে এই খবর আগুনের মত ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিছু অবিভাবক এবং গ্রামের লোকজন দাবি তোলেন,"গ্রামের ওঝা যখন আগেই বলেছিল, এই স্কুলের অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভুতের হাত থেকে ছাত্র ছাত্রীদের রক্ষার জন্য স্কুলে ওঝা ও তান্ত্রিক ডেকে ঝাড়ফুঁক ও যজ্ঞ করানো হোক। যদি সময় থাকতে স্কুলে ভূত বা অতৃপ্ত আত্মাকে তাড়াতে ওঝা না ডাকা হয় তাহলে ভয়ঙ্কর অঘটন ঘটাতে পারে"

এদিকে বিকেল নামার পর দূর থেকে স্কুল ভৌতিক গল্পের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এলাকার লোকেরা বলাবলি শুরু করেন,”স্কুলের শৌচাগারে, ছাদে ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজব আজব ভয়ঙ্কর শব্দ ভেসে আসছে। কেউ নাকি হটাৎ হটাৎ কেঁদে উঠলো। কেউবা হেঁসে উঠল। অতৃপ্ত আত্মার শ্মশানে পরিণত হয়েছে গোটা স্কুল চত্বর।"

তখন আমি কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক হিন্দি পত্রিকা’সলাম দুনিয়া'-তে সাংবাদিকতা করি। পত্রিকা অফিস থেকে’ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সভাপতি প্রবীর ঘোষকে ফোন করে বললাম,”এই স্মার্ট ফোনের যুগেও দিনের বেলায় মির্জাপুর হাই স্কুলের শৌচাগারে ভুতুড়ে আতঙ্কের খবর ছড়িয়ে পড়েছে। এটা ভাবতেই অবাক লাগে।"

"হ্যা ঠিক বলছেন। হাতে স্মার্ট ফোন থাকলেই সে স্মার্ট হয়ে যায় না। আজও বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা পড়া করা সত্ত্বেও অনেকে মনে প্রাণে বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে ওঠে নি। তাই কাল্পনিক ভূত বাস্তব রূপ নিয়ে ফিরে আসে। এবং এই ভূত তাড়াতে আমদের অর্থাৎ বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদীদের দায়িত্ব বাড়ে।”প্রবীর বাবু বললেন।

জিজ্ঞেস করলাম,’’মির্জাপুর হাই স্কুলের শৌচাগারে ভুতুড়ে আতঙ্কের খবরতো আপনিও পেয়েছেন। এই ভুতুড়ে ঘটনার রহস্য উন্মোচন করতে যুক্তিবাদী সমিতি কি কোনও পদক্ষেপ নেবে?”

প্রবীর বাবু জানালেন,”স্কুল কর্তপক্ষ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সমিতির বাঁকুড়া জেলার এক প্রতিনিধি দল ওই স্কুলে যাবে। তাঁরা ওখানে কু-সংস্কার বিরোধী’অলৌকিক নয়, লৌকিক’অনুষ্ঠান করবে।"

বললাম,”স্কুলে শৌচাগারে ভূত আছে, এই গুজব ছড়ানো হচ্ছে। কে এবং কেন এই গুজব ছড়াচ্ছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। আমার মনে হচ্ছে গ্রামের ওঝাই স্কুলে ভূতের গুজব ছাড়িয়েছে।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমাদের সমিতির প্রতিনিধি দল ওখানে যাক। তারপর ভূতের রহস্য উন্মোচন করা যাবে।”প্রবীর বাবু বললেন।

রবিবার ৩০ জুলাই ২০১৭

কলকাতা থেকে প্রকাশিত অনেক দৈনিক পত্রিকা ও নিউজ চ্যানেলে মির্জাপুর স্কুল ভূতের খবর গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়েছে।

নিউজ চ্যানেল'২৪ ঘন্টা'তে যুক্তিবাদী সমিতি'র বক্তব্য দেখানো হয়,"যুক্তিবাদীরা এই ভুতুড়ে ঘটনার রহস্য উন্মোচন করবেই"

এদিকে কোতুলপুরের মির্জাপুর হাই স্কুলে ভূতের গুজবে ছাত্রীদের আতঙ্ক কাটাতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহানন্দ কুণ্ডু সহ অন্যান্য শিক্ষক এবং স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত সকলে এই সিদ্ধান্ত নেন,"স্কুলের শৌচাগারে ভূত দেখার পর বিশেষ করে ছাত্রীদের মন থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভূতের আতঙ্ক কাটাতে কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করা জরুরি। এর জন্য স্কুলের তরফ থেকে'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সকালে প্রবীর ঘোষকে ফোন করার পর জানতে পারলাম বাঁকুড়া থেকে যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য রামকৃষ্ণ-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কাল মির্জাপুর হাই স্কুলে যাবে। তাঁরা'অলৌকিক নয়, লৌকিক'অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ভুতুড়ে ঘটনার রহস্য উন্মোচন করবেন।

এরপর আমি ফোন রামকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বললাম। ওনাকে বললাম,"এই স্কুলের ভুতুড়ে ঘটনার পেছনে কি কি কারণ থাকতে পারে? সব খবর আমাকে যেন দেওয়া হয়। আমি কোলকাতার মিডিয়ায় এই খবর বিশাল ভাবে প্রকাশিত করতে চাইছি।"

সোমবার ৩১ জুলাই ২০১৭

কোতুলপুরের মির্জাপুর হাই স্কুলে ভূতের গুজবে ছাত্রীদের আতঙ্ক কাটাতে সোমবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে সচেতনতা শিবির করা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুরোধের ভিত্তিতে যুক্তিবাদী সমিতির বাঁকুড়া জেলা শাখা থেকে এক প্রতিনিধি দল কতুলপুর স্কুলে যায়। স্কুলে ভুতুড়ে ঘটনার রহস্য উন্মোচন করার জন্য যুক্তিবাদীরা স্কুলের ভুতুড়ে শৌচাগার নিরীক্ষণ করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ছাত্র - ছাত্রীদের, তাঁদের অভিভাবক, গ্রামের লোকেরদের সঙ্গে কথা বলেন।

একই সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ছাত্রীদের কাউন্সেলিং করানো হয়। অন্য দিকে, যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে স্কুলে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। যুক্তিবাদী সমিতি'র তরফ থেকে স্কুল পরিসরে একটি মঞ্চে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী, তাঁদের অভিভাবক এবং গ্রামের লোকেদের সামনে'অলৌকিক নয়, লৌকিক'শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

স্কুল প্রাঙ্গনে একটি অনুষ্ঠান মঞ্চ তৈরি করা হয়। মঞ্চে রামকৃষ্ণ হাতে মাউথপিস নিয়ে মঞ্চের সামনে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বললেন,"আমরা যুক্তিবাদী সমিতি'র সদস্যরা আপনাদের সামনে একটি অনুষ্ঠান করতে চলেছি। কয়েকটি তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা লৌকিক ভাবে ঘটিয়ে দেখানোর চেষ্টা করবো। একই সঙ্গে প্রশ্ন উত্তর পর্ব চলবে। আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সবার সহযোগিতা কাম্য। যে কেউ নিজের প্রশ্ন আমাদের সামনে রাখতে পারেন।"মঞ্চের একটি টেবিলে দুধে ভর্তি একটি কাঁচের গ্লাস এবং একটি মড়ার খুলি রাখা হলো। নিজের ডান হাতে এই খুলি নিয়ে দর্শকের সামনে তুলে ধরে যুক্তিবাদী বলবেন,"এখানে আসার সময় আমরা শুনেছি এই স্কুলের শৌচাগারে অতৃপ্ত আত্মার মানে ভূতেরা আড্ডা দিচ্ছে। যদি সত্যিই কাছাকাছি কোনও অতৃপ্ত আত্মা বা ভূত থেকে থাকে তাহলে আমরা তাকে এই মঞ্চে ডেকে এই এক গ্লাস দুধ খাওয়াবো।"

খুলির দিকে বড় - বড় চোখ করে জোরে -জোরে মন্ত্র পাঠ শুরু হলো। হিং টিং ছট ফট...। যদি কোনও অতৃপ্ত আত্মা বা ভূত আসেপাশে থাকে তাহলে এই খুলির মধ্যে ঢুকে দেখাও।"

কিছু ক্ষণের মধ্যেই হটাৎ হাতের খুলি একটু নড়ে উঠলো। মনে হচ্ছে একটি আত্মা খুলির মধ্যে ঢুকেছে। বা হাতে দুধের গ্লাস খুলির কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একি গ্লাসে দুধের স্তর নিচে নামতে শুরু করেছেন। খুপরি তে ঢুকে পরা ভূত যেন চুক চুক করে দুধ খাচ্ছে। কিছু ক্ষণের মধ্যেই গ্লাসের প্রায় সব দুধ শেষ হয়ে গেল।

এই দেখে উপস্থিতির গুনজন। তাহলে কি এই মঞ্চের সামনে ভূত এসে হাজির ?

"ভয়ের কিছু নেই। আমরা থাকতে ভূত কোনও ক্ষতি করতে পারবে না"এই বলে ওই যুক্তিবাদী খুলি ও গ্লাস টেবিলে রেখে দিলেন। টেবিল একটি মাটির মালসা রাখা হলো। তাতে কিছু পাঠ কাঠি ভেঙে দেওয়া হলো। এরপর একটি গণ্ডুষ থেকে জল ওই মালসাতে একটু একটু করে দেওয়ার হলো। সঙ্গে সঙ্গে ...ওম হিং হিঙ ক্রিং ক্রিং ফট ফট...মন্ত্র পড়া শুরু করতেই কিছু ক্ষণের মধ্যে মলসা থেকে প্রথমে ঘন কুয়াশার মত ধোঁয়া বেরোতে লাগলো। পর মুহূর্তে ধপ করে আগুন জ্বলে উঠলো। এরপর

একজন যুক্তিবাদী কর্পূরের কয়েকটি টুকরো টেবিলে রাখলেন, সেখান থেকে একটি কর্পূরের ছোট টুকরো নিজের তালুতে রাখলেন। অন্য জনে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে তালুতে রাখা কর্পূরে আগুন ধরিয়ে দিলেন। জ্বলন্ত কর্পূরের টুকরো নিজের তালুতে কিছু ক্ষণ রাখার পর সেটি তুলে নিজের জিভের উপর রেখে দেখলেন। আশ্চর্য জ্বলন্ত কর্পূরের হাতের তালু ও জিভ একটুকুও পুড়লো না।

গ্রামে গঞ্জে ভূতের ঝাড়ফুঁক করতে আসা ওঝার নির্দেশে ভূতে ভর গ্রস্ত মহিলাকে মুখ দিয়ে জল ভর্তি কলসি তুলে দেখান। আজ এই অনুষ্ঠান মঞ্চে এক যুক্তিবাদী মুখে বড়ো কলসি তুলে দেখলেন।'অলৌকিক নয়, লৌকিক'অনুষ্ঠান দেখতে আসা দর্শকেরা জোরে জোরে তালি দিতে লাগলেন।

দর্শকের উদ্দেশ্যে যুক্তিবাদী জিজ্ঞেস করলান,"কেউ কি এটা বলতে পারবেন গ্লাসের দুধ কে খেলো?"

দর্শকদের মাঝ থেকে হাত তুলে শম্পা বললো,"স্কুলের শৌচাগারে যে ভূত আছে সেই মরার খুলিতে ঢুকে গ্লাসের দুধ খেয়েছে।"এই শুনে যুক্তিবাদী বললো,"তুমি কি করে বুঝলে দুধ ভুতে খেয়েছে?"শম্পা বললো,"আমি ওখানে ভূত দেখেছি। অসুস্থ হয়ে যাবার কারণে মা আমাকে এক ওঝার কাছে নিয়ে গেছিল। সেই ওঝা আমাকে ঝাড়ফুঁক করে বলেছে, এই স্কুলে অনেক অতৃপ্ত আত্মা ও ভূত আছে। আপনিও ওই ওঝার মতন ভূতকে বশ করতে পারেন। আপনারা তন্ত্রমন্ত্র জানেন। অলৌকিক শক্তি আছে আপনাদের।"

এই শুনে রামকৃষ্ণ হেসে বললো,"আমার যুক্তিবাদী। আমাদের কাছে কোনও অলৌকিক বা তন্ত্রমন্ত্র করার শক্তি নেই। আমার যুক্তিবাদীরা অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জানাই এবং তাঁদের বুজরুকি ফাঁস করি।"

এর পর মরার খুলির দুধ খাওয়া পেছন লৌকিকক কৌশল ফাঁস করে দেখানো হল।

যুক্তিবাদী সমিতি'র একজন সদস্য জিজ্ঞেস করলেন,"আচ্ছা শম্পা তুমি কি নিজের চোখে ভূত দেখছো?"

"হ্যাঁ। আমি কেনো, এই স্কুলের অনেক ছাত্রীরাও শৌচাগারে ভূত দেখেছে। ভূত দেখে আমার মতন অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে"

"বাহ বাহ। দারুন ব্যাপার। তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউ কি স্মার্ট ফোনে ওই ভূতের ছবি তুলেছ?"যুক্তিবাদীর প্রশ্ন করলেন।

এক ছাত্রী বললো,"ভূতের আবার ছবি তোলা যায় নাকি!"

“কেন? যদি চোখে দেখা যায় তাহলে অবশ্যই ছবি তোলে যাবে।”ওই যুক্তিবাদী সদস্য আবার জিজ্ঞেস করল।

একসঙ্গে কয়েকজন ছাত্রীরা বলে উঠলো,”তাহলে আমারা কি ভূত দেখিনি? অন্য কিছু দেখেছিলাম?"

যুক্তিবাদীরা বললেন,”হ্যাঁ। তোমার যা দেখছো ওটা মনের ভুল। বাস্তবে ভূত বলে কিছুই নেই। ভূত শুধুমাত্র মনোজগৎ এর কল্পনা, মনের বিভ্রম। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে - মন, চিন্তা বা চৈতন্য মস্তিস্ক স্নায়ুকোষেরই ক্রিয়- কর্মের ফল, মস্তিস্ক বহির্ভুত কোনও বস্তু বা পদার্থ নয়। মস্তিকের স্নায়ুকোষ ছাড়া চিন্তা, মনের অস্তিত্ব অসম্ভব বা অবাস্তব। মানুষের মৃত্যুর পর সাধারণভাবে দেহও বিলীন হয় পুড়ে ছাই হয়ে, কবরের মাটিতে মিশে গিয়ে। দেহ বিলিনের সঙ্গে সঙ্গে দেহাংশ মস্তিস্ক স্নায়ুকোষও বিলীন হয়। এই পর স্নায়ুকোষ নেই, কিন্তু তার কাজ কর্ম আছে এবং কাজ কর্মের ফল হিসাবে মনও আছে - এমনটা শুধু কল্পনাতেই সম্ভব। এই আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তের পৌঁছাতে পারি, চিন্তা, চেতনা, চৈতন্য বা মনই যদি আত্মা হয়, তাহলে আত্মা কখনই অমর হতে পারে না অর্থাৎ মানূষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মার মৃত্যু হয়ে যায়। এর পর অতৃপ্ত আত্মা বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। মৃত্য আত্মা ভূত হয় না।”

এক ছাত্রী জিজ্ঞেস করলো,”যদি কোনও মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মার মৃত্যু ঘটে। মানুষ মরে ভূত হয় না। তাহলে শৌচাগারে ভুতের মত ছবি কেনই বা দেখলাম?”

যুক্তিবাদী বললো,”আমরা বাল্যকালে মা, দাদু, ঠাকুমার কাছে ভূত-প্রেত ইত্যাদির গল্প শুনে থাকি। এই গল্প আমাদের মনে আজ গেঁথে আছে। কিন্তু পড়া লেখা করার পরেও বাল্যকালে শোনা ভূতের গল্প মাস্তিকে জমে থাকে। ওই গল্প সত্যি মনে হয়। এছাড়া, আজকাল বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ভূত প্রেত গল্পের সিরিয়াল দেখানো হয় যা বিশেষ করে বাচ্ছাদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। টিভিতে দেখা ভূতের গুলগল্প কখনোবা সত্যি মনে হয়। এমন অবস্থায় কেউ যদি এই গুজব ছাড়িয়ে রাখে যে অমুক জায়গায়তে ভূত আছে। কেউ যদি ওই ভুতুড়ে জায়গায় যায় তাহলে তাকে ভূত দেখ দেয়। অথবা তাঁকে ভূতে ধরে। গ্রামের এমনও গুজব ছড়ায়, এই স্কুলের শৌচাগারে অতৃপ্ত আত্মা বা ভূত আছে। এই গুজবে হয়তো প্রথমে শম্পা। ও যখন শৌচাগারে গেছে তখন দৃষ্টি ভ্রমের কারণে কোনও অস্পষ্ট ছবি দেখে। তৎক্ষণাৎ তাদের মস্তিষ্কে ভূতের গুজবের কথা মনে পড়ে যায়। ভয়ে এই ছবিকে ভূত বলে বিশ্বাস করে। ভূত -ভূত বলে চিৎকার করে। আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরে শম্পাকে ওর মা গ্রামের এক ওঝার কাছে নিয়ে যায়। ওঝাও বলে, স্কুলে ভূত আছে। পরের দিন যখন শম্পা আবার স্কুলে এসে। সে ওই ওঝার কথা বলতে থাকে। এর ফলে ছাত্রীদের মধ্যে ভূতের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এর পর ভূতের গুজবে বিশ্বাস করা ছাত্রীরাও শম্পার মতন দৃষ্টি ভ্রমের কারণে শৌচাগারে কোনও আকৃতির ছবি দেখে। ভূত দেখার মতন ভয়ে

আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। স্কুলে ভুতুড়ে গানহিস্টিরিয়া ছড়িয়ে পড়ে। বাস্তবে ভূত কোনও যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা শুধু আছে আমদের মনের মধ্যে। এই ভূত শুধুমাত্র যুক্তি ও জ্ঞানের আলোইও দূর করা সম্ভব।"

এক ছাত্রী জিজ্ঞেস করল,"তাহলে ওই ওঝা শম্পাকে কেন ভূতের ঝাড়ফুঁক করলো? কেনো ওঝা বললো, আমদের স্কুলের ভূত আছে?"

"দারুন প্রশ্ন করেছ। আমরা এই প্রশ্নের অপেক্ষা করছিলাম। এই স্কুলে ভুতুড়ে ভয়ে অসুস্থ্য হওয়া বেশিরভাগ ছাত্রী গ্রামে তাকে। অনেকে গরীব, চাষী, শ্রমিক পরিবার থেকে। কিছু মেয়ের অপুষ্টির অভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে থাকে। এঁদের পরিবারও ভূত প্রেত, অতৃপ্ত আত্মা, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, ওঝা, তান্ত্রিক ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন। এমন অবস্থায় যখন শম্পা স্কুলের শৌচাগারে ভূতের ভয় পায়। সে হয়তো কোনও মানসিক চাপ বা দুঃচিন্তায় ছিল। এমন অবস্থায় বাড়ি ফেরার পর তাঁকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এর জন্য নিয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু ভূত, অতৃপ্ত আত্মা ইত্যাদিতে বিশ্বাসী শম্পার মা মেয়েকে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ওঝা ঝাড়ফুঁক করে। ওঝাই এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় করে দেয় যে স্কুলে ভূত আছে। ওই ভূত যে কাউকে ধরতে পারে। ক্ষতি করতে পারে। শম্পাও স্কুলে আসার পর ওঝার জনে জনে কথা বলতে থাকে। এর ফলে স্কুলে ভুতুড়ে গনহিস্টিরিয়া মতন আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু যদি শম্পাকে তার মানসিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো তাহলে স্কুলে ভুতুড়ে গনহিস্টিরিয়ার পরিবেশ নাও তৈরি হত। কারণ আজও এমন অনেক মানুষ আছেন যারা কোনও ধরনের মানসিক রোগের পেছনে ভূত প্রেত, অতৃপ্ত আত্মা ইত্যাদির কারণ মনে করেন। রুগীকে চিকিৎসা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের দ্বারা করানোর পরিবর্তে ওঝা, তান্ত্রিকের হাতে তুকতাক বা ঝাড়ফুঁক করার জন্য নিয়ে যান। বাস্তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ভূতে ভর, ভূত দেখতে পাওয়া ইত্যাদি একটি মানসিক রোগ। এই ধরনের রোগের আধুনিক মনোরোগ বিশেষজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসা সম্ভব।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ‘ভূতে পাওয়া’বলে পরিচয় মনের রোগ। মানসিক বা শারীরিক যে কোনও রোগের চিকিৎসা হাসপাতালে চিকিৎসকের হাতে করুন। কিন্তু ভুল করেও কোনও ওঝা বা তান্ত্রিকের কাছে যাবেন না। “ যুক্তিবাদীরা বোঝানর চেষ্টা করলো।

অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের প্রতি যুক্তিবাদী সমিতি'র সভাপতি প্রবীর ঘোষের ২৫ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে রামকৃষ্ণ বললো,"এই অনুষ্ঠান মঞ্চে যদি কোনও ওঝা তান্ত্রমন্ত্র করে কোনও ভূত বা অতৃপ্ত আত্মা চাক্ষুস দেখাতে পারে তাহলে তাঁকে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।"

যুক্তিবাদীদের চ্যালেঞ্জের কথা শুনেই মঞ্চের সামনের উপস্থিত দার্শেকর মধ্যে গুঞ্জন সৃষ্টি হল।

গ্রামের এক মধ্য বয়স্ক ব্যক্তি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন,”তাহলে কি আপনার এটা বলতে চাইছেন ভূত বলে কিছু নেই। সবই মনের ভুল। গ্রামের ওঝা মিথ্যে কথা বলেছে?”

একজন যুক্তিবাদী বললেন, “আমাদের এই চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে আপনাদের এটাই বোঝাতে চাইছি, ভূত, অতৃপ্ত আত্মা, অলৌকিক ক্ষমতাবান কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব বিশ্বে নেই। অলৌকিকতা যা আছে, তা শুধুই পত্র পত্রিকা, বইয়ের পাতায়। ভুতের, অতৃপ্ত আত্মা ইত্যাদির মতন অন্ধ বিশ্বাস থেকে যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। যদি কোথায় কোনও ধরনের ভুতুড়ে ঘটনা ঘটে তাহলে তার পেছনে যুক্তি যুক্ত কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।

এক ছাত্রী জিজ্ঞেস করলো,”তাহলে ওঝা ভুতে ভরের ঝাড়ফুঁক করার নামে ভুতের গুজব ছড়িয়েছে?”

"একশো শতাংশ যুক্তিযুক্ত কথা। এই স্কুলে যে ভূতের গুজব ছড়িয়েছে তার পেছনে ওই ওঝার ষড়যন্ত্র চলছে। ভূতের গুজবের ফলে গেল শুক্রবার ছাত্রী শম্পা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে ঝাড়ফুঁক করার জন্যে ওই ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তুকতাক, ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ, কবচ দেবার বিনিময়ে ওঝা কিছু টাকা নেয়। ওঝা চাইছে ভুতুড়ে আতঙ্কের ফলে বেশি বেশি করে ছাত্র - ছাত্রী, গ্রামের মানুষ অসুস্থ হয়ে তাঁর কাছে ঝাড়ফুঁক করার জন্য যাক যাতে ওনার আয় বাড়ুক।

কিন্তু তোমার হয়ত এটা জানো কি না, ভারতীয় আইন দ্য ড্রাগস কসমেটিক অ্যাক্ট, ১৯৪০ আইন অনুযায়ী , তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, তেল পড়া, নুন পড়া, তাবিজ, কবচ, দৈব শক্তি ইত্যাদির সাহায্যে যে কোনও মানসিক বা শারীরিক রোগ সরানোর বা দাবি করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। যে কোনও রোগ গ্যারান্টি দিয়ে সরানোর নামে যারা তাবিজ, কবচ ইত্যাদি বিক্রি করে, তাদের ওই তাবিজ, কবচ ইত্যাদি ওষুধ হিসেবেই বিবেচিত হবে। বিনা লাইসেন্সে এই জাতীয় ওষুধ বিক্রি অবশ্যই অপরাধ। ওই তাবিজ, কবচে অসুখ না সারলে, মৃত্যু হলে, ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের এস ৩২০ ধারা মতে শাস্তি পাবে। শাস্তি, কমপক্ষে ৫ বছরের জেল থেকে আজীবন কারাদণ্ড। সঙ্গে জরিমানা কম করে ১৯ হাজার টাকা।”

ভূতের গুজব ছড়িয়ে স্কুলের ছাত্র - ছাত্রীদের এবং গ্রামের লোকেদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। যারা ভূতের গুজব ছড়িয়ে নিজের ঝাড়ফুঁকের মতন লোক ঠকানো ব্যবসা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ। দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিজস (অবজেকশনাবল এডভার্টাইসমেন্ট) এক্ট , ১৯৫৪ এই আইনে যে লোক ঠকানো অভিযোগে ওই ওঝাকে জেলে ঢোকানো সম্ভব।

যুক্তিবাদী সমিতি'র'অলৌকিক নয়, লৌকিক'অনুষ্ঠান দেখার পর ছাত্রীরা বললো,''অন্ধবিশ্বাসের কারণে এক ওঝার কথা শুনে আমাদের আমের মধ্যে যে ভুতুড়ে আতঙ্ক জন্ম নিয়েছিল তা দূর হয়ে গেছে। আজকের পর আবার এই ধরনের ভুতুড়ে ঘটনা ঘটে তাহলে আমার কোনও ভয় পাবো না। যদি কোনও ছাত্রী ভুতের ভয়ে আতঙ্কিত বা অসুস্থ্য হয়ে পড়ে তাহলে তাকে চিকিৎসার জন্য ওঝার পরিবর্তে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাব। এবার থেকে ভুতের গুজবে কান দেবো না।''

স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী শিল্পা দে বলেন,''এতদিন ভূতের ভয় পেতাম। কিন্তু ভূত বলে বাস্তবে যে কিছু নেই, এদিনের সচেতনতা শিবির থেকে তা বুঝতে পেরেছি। তাই দু'দিন আগে যে শৌচালয়ের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিলাম, আজ সেখানে সাহসের সঙ্গে ঢুকতে পেরেছি।''

এ দিন স্কুলে আসা যুক্তিবাদী সমিতি'র সদস্যরা বলেন,'‘কুসংস্কার আর গুজব কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, এই স্কুলের বর্তমান অবস্থাটাই তা বলে দিচ্ছে। আমরা হাতে কলমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিশু মন থেকে আতঙ্ক কাটানোর চেষ্টা করেছি। দেখা যাক, কতটা কাজে লাগে।''

এদিনের শিবিরে কোতুলপুরের বিডিও গৌতম দত্ত, জেলা সর্বশিক্ষা অভিযান দপ্তরের দুই আধিকারিক সহ প্রায় ১৫০জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।উপস্থিত ছিলেন কোতুলপুর থানার পুলিশ আধিকারিক, মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নমিতা পালও।

মঞ্চে মাইক হাতে নিয়ে বিডিও ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন,''আমার লজ্জা লাগছে, এমন একট বিষয় নিয়ে শিবির করতে। যখন মেয়েরা চাঁদে যাচ্ছে, ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে লড়ছে। কারও কথা কানে শুনে নয়, বিজ্ঞান ও যুক্তি এবং নিজেদের শিক্ষা দিয়ে বিষয়টিকে বোঝো। তা হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। স্কুলে ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক কাটাতে এদিন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সদস্যেরাও পড়ুয়াদের ভয় কাটানোর চেষ্টা চালান।''

মির্জাপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহানন্দ কুণ্ডু বলেন,”এদিন সকালে দুটি ক্লাস হওয়ার পর সচেতনতামূলক শিবির হয়। বিজ্ঞানভিত্তিক অনুষ্ঠান দেখে ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক কেটে গিয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে বহু ছাত্রী এদিন স্কুলের শৌচালয়ে ঢুকে প্রমাণ করে দিয়েছে যে তাদের মধ্যে ভূতের কোনও ভয় নেই।”

শেষ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গ্রামের লোকের বুঝতে পারলো, এই স্কুলের শৌচাগারে ভূত বা অতৃপ্ত আত্মা আছে এই গুজব গ্রামে বাগ ওঝাই ছড়িয়েছিল। ভূতের গুজব ছড়িয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভূতুতে আতঙ্ক তৈরি করার পেছেন ওঝা যে ষড়যন্ত্র করছে তা আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ।

যুক্তিবাদী সমিতি'র তরফ থেকে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বলা হলো,”স্কুলের ভূতের গুজব ছাড়ানোর পেছনে যে ওঝার হাত আছে তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হোক।”

কতুলপুর স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের মনের থেকে ভূতের আতঙ্ক কাটাতে যুক্তিবাদী সমিতি'র এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ কি কি উদ্যোগ নিয়েছে এই বিস্তৃত খবর নিলাম। ফোনে যুক্তিবাদী সমিতির সভাপতি প্রবীর ঘোষের সাক্ষাৎকার নিলাম।

আমার পত্রিকা এবং বন্ধু সাংবাদিকে নিউজ পাঠালাম।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত’অভয়বঙ্গ পত্রিকা’- এর সম্পাদক জগদীশ যাদবকে খবর লিখে পাঠালাম। তিনি তার হিন্দি নিউজ পোর্টাল’এটিভিঅভয়ডটকম’-এ গুরুত্ব সহকারে আমার নাম সহ খবর প্রকাশিত করলেন।

"তথাকিত ভূত দেখে প্রায় ২০ যান ছাত্রী অসুস্থ। যুক্তিবাদী সমিতি করলো ভূতুতে রহস্যের উন্মোচন : সন্তোষ শর্মা।

খবরের একটি অংশ তুলে ধরছি।

"....যুক্তিবাদী সমিতি'র সভাপতি প্রবীর ঘোষ বললেন, বাস্তবে ভূতের কোনও অস্তিত্ব নেই। কোনও মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মারও মৃত্যু হয়ে যায়। ভূত একটি গুজব মাত্র। তিনি বলেন, কেউ দুষ্টুমি করার জন্য স্কুলের শৌচাগারে ভূত আছে এই গুজব ছড়িয়েছে। এক ওঝার কথা মত যখন এক ছাত্রী বললো, স্কুলের শৌচাগারে ভূত আছে তখন ওই ছাত্রীর কথা গুজব হয়ে অন্যান্য ছাত্রীদের মধ্যেও ছাড়িয়ে পরে। এর পর যেই না কোনও ছাত্রী শৌচাগারে যাচ্ছে সে ভূত দেখার মত ভয় পেয়ে ভূত ভূত বলে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ফলত, স্কুলে ভূতের গুজব গনহিস্টিরিয়ার মতন ছাড়িয়ে পড়ে।

ঘোষ বাবু আরও বলেন, স্কুলে যে গনহিস্টিরিয়া অবস্থা তৈরি হয়েছে তা কাউন্সেলিং -এর সাহায্যে চিকিৎসা সম্ভব। প্রবীর বাবু জানান, এখনো কেউ যদি এটা দাবি করে, ওই স্কুলে ভূত আছে তাহলে তাঁকে আমি ২৫ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, তিনি প্রমান করে দেখান ভূত আছে।"

এদিকে কলকাতা থেকে'ইটিভি বাংলা'নিউজ চ্যানেলে'ভূতের ভবিষ্য' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান দেখায়। এই অনুষ্ঠানে প্রবীর ঘোষের ভূত নিয়ে যুক্তিবাদী বক্তব্য প্রচার করে হয়।

মঙ্গলবার ১ আগস্ট ২০১৭

কতুলপুর হাইস্কুলে ভূতের আতঙ্ক কাটতে যুক্তিবাদী সমিতি'র যে উদ্যোগ নিয়েছে তার বিস্তারিত খবর আজ বাংলা, হিন্দি প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে প্রচার করা হয়েছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হিন্দি দৈনিক'যুবাশক্তি','ভারত এক নজর'পত্রিকায় হাফ পৃষ্টা জুড়ে খবর ছাপা হয়েছে।

পাঠকের সামনে উদাহরণস্বরূপ একটি খবর'আনন্দবাজার পত্রিকা'থেকে তুলে দিচ্ছি।

"গুজবের জেরে আতঙ্ক ছাত্রীদের"

নিজস্ব সংবাদদাতা

কোতুলপুর ১ অগস্ট, ২০১৭

আতঙ্ক: কোতুলপুরের স্কুলে সোমবার।

স্রেফ অন্ধবিশ্বাস আর গুজবের চোটে পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। গুজব ছড়িয়েছে,'ভূত'আছে স্কুলের শৌচাগারে। সেই গুজবে ঘি ঢেলেছে এলাকার এক ওঝা। তাতেই কার্যত হিস্টিরিয়ার দশা স্কুলের ছাত্রীদের।

পরিস্থিতি সামলাতে সোমবার স্কুলে সচেতনতা শিবির করল প্রশাসন। এ দিন স্কুলে আসেন বিডিও (কোতুলপুর) গৌতম বাগ, কোতুলপুর থানার পুলিশ আধিকারিক, মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নমিতা পাল। ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সদস্যেরাও। মাইক হাতে নিয়ে বিডিও ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন,'"আমার লজ্জা লাগছে, এমন একট বিষয় নিয়ে শিবির করতে। যখন মেয়েরা চাঁদে যাচ্ছে, ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে লড়ছে।

কারও কথা কানে শুনে নয়, বিজ্ঞান ও যুক্তি এবং নিজেদের শিক্ষা দিয়ে বিষয়টিকে বোঝো। তা হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে।”

এ দিন সকালে মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল জোরকদমে ওই শৌচাগার পরিষ্কারের কাজ চলছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহানন্দ কুণ্ডু জানান, এই স্কুলে ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে সংখ্যা প্রায় ৮০০। আশপাশের রায়বাঘিনি, হন্নে, ঝোড়ো মুরাহাট, হাজরাপুকুর, জলজলা, হরিহরচাকা, দেহয়ুাবনি গ্রামের গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়ে। অনেকেই সকালে মুড়ি খেয়ে দুপুরে মিড-ডে মিল খায়। স্কুলে এমনিতেই শারীরিক ভাবে অসুস্থ কিছু ছাত্রী আছে, যাদের নিয়মিত বাইরের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

মহানন্দবাবু বলেন,”ওই ছাত্রীদেরই কয়েক জন শৌচাগারে গিয়ে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তা দেখে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে আরও পড়ুয়াদের মধ্যে। পুরোটার পিছনেই রয়েছে ভুল ধারণা।”

তিনি জানান, সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে বাসুদেবপুরের এক ওঝা। এক ছাত্রীকে ঝাড়ফুঁক করে সেই ওঝা বলে দেয়, মেয়েটিকে ভূতে ধরেছিল। তাতেই আতঙ্ক আরও বেড়েছে। এই অবস্থায় স্কুলের মেয়েদের শৌচাগার সারানো বা রং করার দাবি তুলেছেন পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা।

মেয়েদের শৌচাগারে গিয়ে কিছু ছাত্রী কেন অসুস্থ হয়ে পড়ছে, তা জানতে এসেছিলেন কোতুলপুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক পলাশ দাস এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ পৃথা মুখোপাধ্যায়। তাঁদের সামনেই এ দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী।

পরে ওই দু’জনই বললেন, “বেশির ভাগ মেয়েই খালি পেটে বা সামান্য খেয়ে থাকে। ফলে তাদের শরীর এমনিতেই কমজোর। অসুস্থ হওয়ার মূল কারণ ওই শারীরিক দুর্বলতাই। তবে, কাউকে ভর্তি করতে হয়নি।”তাঁদের মতে, একটা’প্যানিক’থেকে এই কাণ্ড ঘটছে।

এ দিন স্কুলে আসা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সদস্য রামকৃষ্ণ বলেন,”কুসংস্কার আর গুজব কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, এই স্কুলের বর্তমান অবস্থাটাই তা বলে দিচ্ছে। আমরা হাতে কলমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিশু মন থেকে আতঙ্ক কাটানোর চেষ্টা করেছি। দেখা যাক, কতটা কাজে লাগে।”

অন্য দিকে, যুক্তিবাদী সমিতি'র প্রস্তাবে স্কুল কতৃপক্ষ অভিযুক্ত ওঝার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এক ওঝা দম্পতি শীতল বাগ এবং শিখা বাগকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করে। আদালত ধৃতদের ১৪ দিন জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দেয়।

এই খবরটি আমি প্রবীর ঘোষকে জানিয়ে বললাম,"যুক্তিবাদী সমিতি'র আন্দোলনের পাতায় আজকের ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যুক্তিবাদীরা গত কয়েক দিন ধরে কতুলপুর স্কুলের ভুতুড়ে রহস্য উন্মোচন করে। আজ যুক্তিবাদীদের কথা মতন ভূতের গুজব ছাড়ানোর অভিযোগে এক ওঝা দম্পতিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এই পর কেউ যদি কোথাও ভূতের গুজব ছাড়ানোর চেষ্টা করে তাহলে এই অভিযুক্তের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ।"

এই পর আমি একটি খবর লিখে'অভয়বঙ্গ পত্রিকা'র সম্পাদক জগদীশ যাদবকে ই-মেল করে পাঠালাম। আমার লেখা খবরটি হিন্দ নিউজ পোর্টাল'এটিভিঅভয়ডটকম'এ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত করা হল।

বুধবার ২ আগস্ট ২০১৭

স্কুলে ভূতের গুজব ছড়ানোর অভিযোগে এক ওঝা দম্পতি গ্রেপ্তার। যুক্তিবাদী সমিতি করলো ভুতুড়ে ঘটনার রহস্য উন্মোচন।

এই খবরটি কলকাতা থেকে'সলাম দুনিয়া, দৈনিক জাগরণ, দৈনিক বিশ্বমিত্র, প্রভাত খবর, যুবাশক্তি, ভারত এক নজর, ভারতমিত্র, আনন্দবাজার পত্রিকা, সংবাদ প্রতিদিন সহ অনেক নিউজ পেপারে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করল।

পাঠকের সামনে'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত খবর তুলে ধরছি।

"গুজব ছড়ানোর নালিশ, ধৃত ওঝা দম্পতি

নিজস্ব সংবাদদাতা

কোতুলপুর ২ অগস্ট, ২০১৭

গুজব ছড়িয়েছিল, স্কুলের শৌচাগারে'ভূত'রয়েছে। তাতেই আতঙ্কিত হয়ে একে পর এক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় এ বার সেই গুজব ছড়ানোয় অভিযুক্ত ওঝা দম্পতিকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

কোতুলপুর ব্লকের মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহানন্দ কুণ্ডুর নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোরে কোতুলপুর থানার বাসুদেবপুর গ্রাম থেকে ওঝা দম্পতিকে গ্রেফতার করা হয়।

এসডিপিও সুকোমলকান্তি দাস (বিষ্ণুপুর) বলেন,"ধৃতদের নাম শীতল বাগ ও শিখা বাগ। তাঁদের বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে।"বিষ্ণুপুর আদালত ধৃতদের ১৪ দিন জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দেয়।

প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ,"সেখানে শীতল বাগ ও শিখা বাগ নামের দুই ওঝা ঝাড় ফুঁক করে নিদান দেন, স্কুলের শৌচাগারে ভূত রয়েছে। মন্দ হাওয়ায় ছাত্রীটি অসুস্থ হয়েছে। সে কথাই ছড়িয়ে পড়ে। সেই ভুল ধারণা নিয়ে শৌচাগারে ঢুকে পরে কয়েকজন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই বিভ্রান্তি ও গুজব ছড়ানোর জন্য ওই ওঝা দম্পতির বিরুদ্ধে আমি কোতুলপুর থানায় অভিযোগ করি।"

ওঝা দম্পতি কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ

গত ক'দিন ধরে আতঙ্কের জেরে স্কুলে পঠনপাঠন প্রায় শিকেয় ওঠার অবস্থা হয়েছিল।

পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর। স্কুলের শৌচাগার সাফ-সুতরো করা হয়।

কোতুলপুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক পলাশ দাস এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ পৃথা মুখোপাধ্যায় বলেন,"বেশির ভাগ মেয়েই খালি পেটে বা সামান্য খেয়ে থাকে। ফলে তাদের শরীর এমনিতেই কমজোর। অসুস্থ হওয়ার মূল কারণ ওই শারীরিক দুর্বলতাই।"তাঁদের মতে, একটা'প্যানিক'থেকে এই কাণ্ড ঘটছে।

মঙ্গলবার থেকে অবশ্য স্কুলে স্বাভাবিক পঠনপাঠন শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তিনি বলেন,"পঠন পাঠন স্বাভাবিক। আর কেউ অসুস্থ হয়নি।"এ দিনও ওই স্কুলে গিয়ে বিডিও নিজে মেয়েদের ক্লাসে গিয়ে বোঝান। যুক্তিবাদীরা সচেতনতার শিবির করেছে। শৌচাগারও নিয়ম করে পরিষ্কার করা হচ্ছে।

সামনেই ইউনিট টেস্ট থাকায় পড়াশোনা স্বাভাবিক গতিতে চলায় স্বস্তি পেয়েছে ছাত্রছাত্রীরাও।

তবে এ দিন বিষ্ণুপুর আদালতে ধৃত দুই ওঝা অবশ্য কবুল করেছেন,"কোথাও ভূত-টুত বলে কিছু নেই। সবই মনের ভুল।"

শেষ পর্যন্ত যুক্তিবাদী সমিতি'র প্রয়াসে এক ভুতুড়ে ঘটনার রহস্য উন্মোচন সম্ভব হল। পাঠকের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা, "দি কোথাও কোনও ধরনের ভূতুড়ে ঘটনা ঘটে তাহলে তার পেছনে আসল কারণ জানার বা রহস্য উন্মোচন করার জন্য যুক্তিবাদী সমিতি'র সঙ্গে যোগাযোগ করুন। চ্যালেঞ্জ সহ কথা দিচ্ছি যুক্তিবাদীরা যে কোনও ভুতুড়ে ঘটনার রহস্য ফাঁস করে দেখাবেই"

বৃহস্পতিবার ১ মার্চ ২০১৯

কতুলপুর হাইস্কুলে ভূতের আতঙ্কের পেছনে আসলো রহস্য উন্মোচন নিয়ে আমার একটি লেখা মধ্যপ্রদেশের ভোপাল থেকে প্রকাশিত'স্রোত'বিজ্ঞান ও টেকনোলজি ফিচার পত্রিকার মার্চ, ২০১৯ -এর বার্ষিক সংখ্যা ১৩ এ'স্কুলে ভুতুড়ে দৃশ্য'শিরোনামের সাথে ৫ পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপা হয়। এর পর এই লেখাটি সেপ্টেম্বর মাসে'স্রোতে'র অনলাইনে সংস্করণেও বিস্তারিত প্রকাশিত করা হয়।

সোমবার ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

'স্রোত'পত্রিকার মতন আমার লেখা মধ্যপ্রদেশের ইনদোর থেকে প্রকাশিত'বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত'শিশু মাসিক পত্রিকা'দেবপুত্র'-এর সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সংখ্যায়'ভুতুড়ে শৌচাগার' শিরোনামের সাথে প্রকাশিত করা হয়।

ভূত তাড়াতে এসে মহা ফাঁদে পড়ল ওঝা

সন্তোষ শর্মা

আত্মকথা

সাল ২০০২ ফেব্রুয়ারী মাস। মাত্র দু সপ্তাহ হয়েছে কলকাতার খিদিরপুরে বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ হাসপাতালের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ একটি কোম্পানির অধীনে কাজ করছি। সকালে বেড়িয়ে সেই রাতে বাড়ি ফিরি। একদিন রাতে কাজ থেকে বাড়িতে ফিরেই খবর পেলাম আজ নাকি এক ভাড়াটিয়া মহিলার উপর ভূতে ভর করেছে। ভূত তাঁকে মেরে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। ভূতে ভরগ্রস্ত অবস্থায় ওই মহিলা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন। এও শুনলাম বাড়িতে ওঝা ডাকা হচ্ছে। ওঝা নাকি ভূত তাড়াবে। সেই বাল্যকাল থেকে বাড়িয়ে ভূতে ভর, ঈশ্বরে ভর, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, ওঝা, জ্যোতিষী, তান্ত্রিকে, বাবাজিকে, মাতাজির আনাগোনা দেখছি। এমন অবস্থায় আজ যখন এই খবর শুনলাম বাড়িতে এক মহিলার উপর ভূতে ভর করেছে। এবং সেই ভূতে তাড়াতে বাড়িতে আবার ওঝা আসতে চলেছে। তখন ঠিক করলাম এই ওঝাকে সবার সামনে জব্দ করবো। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে ভূত তাড়াতে এসে মহাফাঁদে পরলো ওঝা। আজ সেই ঘটনা আমার স্মৃতির ডাইরির পাতা থেকে লিখছি। আশা করি আমার এই লেখা পাঠকের মনে ভূত আছে কি নেই? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করবে।

মঙ্গলবার ১২ ফেব্রুয়ারী ২০০২

রাতে কলকাতার খিদিরপুরে বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ হাসপাতাল থেকে ফিরে বাড়ির উঠোনে পা রাখতেই আমার মা মিথিলেশ বললেন,"আজ তো সীমার মাকে ভূতটা মেরে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতোই। কপাল ভালো যে বাচ্চা মেয়ের বুদ্ধির জোড়ে তাঁর মা বেঁচে গেলো। না হলে বাড়িতে অঘটন ঘটে যেতো। ভূত সীমার মাকে মেরে ফেলতো।"

"কি বলছো মা? আমাদের বাড়িতে আবার ভূত কোথা থেকে এলো? ভূত আবার কাউকে কি ভাবে নিজে যাবে? ভূত বলে কিছুই নেই। ওই সব বাজে কথা।"আমি বললাম।

এক গ্লাস জল আমাকে হাতে দিয়ে মা বললেন,"তুই তো জানিস আমাদের বাড়িতে এক সপ্তাহ আগে এক ভাড়াটিয়া এসেছে। দুই বাচ্চা। একটি মেয়ে সীমা। সীমার মায়ের উপর একটি ভূত প্রায় ভর করে। সেই ভূত আজ বিকেলে বউটিকে মারতে আমাদের বাড়িতে চলে এসেছিল।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম,"কি বলছো? আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। অনেক বছর আগে বাড়িতে কোনও কোনও ভাড়াটিয়া মহিলার উপর ভুতে ভর বা ঈশ্বরে ভর হতে দেখেছি। কিন্তু আবার বাড়িতে নতুন করে ভুতের উপদ্রব শুরু হল। চিন্তা কর না। দেখো আমি এই ভূতকে কি ভাবে জব্দ করছি।

আচ্ছা বলতো কি হয়েছিল?

মা বললেন,"আমি সন্ধ্যা বাতি দিছিলাম। তখন ঐ ভাড়াটিয়া মহিলার বড়ো মে সীমা দৌড়ে আমার কাছে এলো। সামনে এসেই কেঁদে উঠলো সে।"

মাথায় বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,"কাঁদছিস কেনো? কি হয়েছে বলো?"

সীমা বলল,"আমার মা মরে যাবে। জেঠিমা তাড়াতাড়ি চলো। আমার মা গলায় দড়ি দিচ্ছি।"

কি বলছিস তুমি!"এই বলে আমি সন্ধ্যাবাতি রেখে তোমার ঠাকুমা দুঃখিনী এবং ছোটোমা সময় মাইল ছুটে গেলাম সীমার সঙ্গে ওর মহিলার ঘরে।

"ঘরে ঢুকেই দেখি চৌকির উপর দাড়িয়ে সীমার মা টালির ছাদের নিচে লাগানো বাঁশের সঙ্গে নিজের শাড়ির আঁচল বাঁধছে।"

আমি ডাকলাম,"ও সীমার মা। এটা কি করছো। নিচে নেমে এসো বলছি"

আমার ডাকে কোনো সাড়াশব্দ না দিয়ে মহিলা আগের মতো শাড়ি বাঁশে বেঁধে দিল। হটাৎ কিছু বোঝার আগেই মহিলাটি শাড়ির অন্য প্রান্ত নিজের গলাতে জড়িয়ে ঝুঁলে পরলো

আমরা তিনজনে মহিলাকে জাপটে ধরলাম। গলায় জড়ানো শাড়ির ফাঁস খুলে নিচে নামানো হলো। বিছানাতে তাকে শোয়ানো হল। এই মধ্যে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বালিত থেকে গ্লাসে করে জল তাঁর চোঁখমুখে দিলেন। হাত পাখা দিয়ে হাওয়া করলাম। কিছু ক্ষণ পর সে পিটপিট করে চোঁখ খুলে তাকালো।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ও সীমার মা। আপনি এটা কি অনর্থ করতে যাচ্ছিলেন? দুমাসের শিশুকে এভাবে রেখে আত্মহত্যা কেনো করতে যাচ্ছেন?"

কোনও কথা না বলে মহিলাটি আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল চোঁখে তাকিয়ে রইল।

একটু জল খেয়ে সে বললো,"আপনারা আমাকে এমনভাবে দেখছেন কেন?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম,"ও বউ তুমি আত্মহত্যা কেন করতে যাচ্ছিলে?"

এই শুনে অবাক চোঁখে মহিলা বললো,"কই আমি কিছু করিনি। আমি বিছানাতে কি করে এলাম? আমি তো আমার বাচ্চার জন্য দুধ গরম করছিলাম।"

তোমার ঠাকুমা বোঝালেন,"দেখো কোনও সমস্যা হলে আমাকে বলো। আমি তোমার মায়ের মত।"

হটাৎ কি হলো সীমার মা জোরে জোরে হাসতে লাগলো।

এই দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম,"ও বউ কি করছো? এভাবে হাসছো কেন?"

মুখের উপর হাত রেখে সীমার মা বললো,"মনে হয় ঔ মেয়েটা আজ আবার আমার কাছে এসেছিলো। ওই মেয়টার ভূত আমাকে মেরে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।"

এই শুনে ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন,"একি ভুলভাল কথা বলছো? ভূত তোমাকে মেরে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই? চিন্তা করো না। তোমাকে ওই ভূতের হাত থেকে আমি বাঁচানোর চেষ্টা করছি।"

এই বলে নিজের ঘরে ঠাকুমা চলে গেলেন। একটু পরে তিনি আবার ফিরে এলো।

সীমার মায়ের কপালে ছাইভস্ম ঘসে দিয়ে ঠাকুমা সান্তনা দিয়ে বললেন,”এটা বাবাজীর দেওয়া ছাইভস্ম। তোমার কপালে বাবাজির ছাইভস্ম যতক্ষণ লেগে থাকবে, ততক্ষণ কোনও ভূত তোমাকে ছুঁতেও পারবে না।”

আমরা সবাই বললাম,”আজ রাতে একটু সাবধানে থেকো বৌমা। কিছু হলে ডাক দিও।”

মা মাথার ঘাম মুছে বললেন,”আর একটু দেরি হলে কি বাড়িতে একটা অঘটন ঘটে যেতো। উটকো থানা পুলিশের ঝামেলা বাড়ত। সবথেকে বড় চিন্তার বিষয় হলো এই আত্মহত্যার দঘটনার পর বাড়িতে সব সময় ভূতের ভয় লেগে থাকতো সব ভাড়াটিয়া বাড়ি ছেড়ে চলে যেত। পুরো গ্রামের লোকের চোখে আমাদের বাড়িটা ভুতুড়ে বাড়ি হয়ে যেত। ভূতের ভয়ে এই বাড়ীতে কেউ আসতে ভয় পেতো। কেউ আসতো না এখানে।”

এই শুনে আমার মানের মধ্যে চিন্তা শুরু হলো। মায়ের কথায় যুক্তি আছে। আজ সত্যিই যদি সীমার মা আত্মহত্যা করে দিতেন তাহলে খুব বড়ো ঝামেলা বাড়ত। যাক শেষ পর্যন্ত মা ওই ভাড়াটিয়া মহিলাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আসলে ভুতুড়ে রহস্য কি সেটা আমাকে জানতেই হবে।

গ্লাসের জল শেষ করে মায়ের হাতে গেলাম দিয়ে যেই না সীমার মায়ের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। মা জিজ্ঞেস করলেন,”কোথায় যাচ্ছিস?”

বললাম,”একটু সীমার মাকে দেখে আসি।”

মা বললেন,”না না। ওখানে যাবি না। সারাদিন খাটাখাটনি করে এসেছিস। নে হাতপা ধুয়ে একটু খেয়ে নে।”

“সীমার মায়ের সঙ্গে দুটো-একটি কথা বলে চলে আসবো।”এই বলে আমি সীমার মায়ের ঘরের সামনে গেলাম।

ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরে থেকে কাকী ও কাকী বলে দুবার ডাক দিলাম।

আমার ডাক শুনে কিছু ক্ষণ পর ছোট্ট মে সীমা দরজা খুলে বেরিয়ে এলো।

বললো,”ওহ সন্তোষ দা তুমি এসেছো। এসো ঘরে। আসো।”

ঘরে ঢুকে দেখিখাতের উপর কাকী অর্থাৎ সীমার মা নিজের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। মাথা নিচু করে একমনে বিড়বিড় করে কিছু বলে চলছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,”ও কাকী, কি হয়েছে আপনার?”

আমার কথায় কোনও সারা-শব্দ না দিয়ে আগের মতো মাথা নিচু করে বিরবির করে চলেছেন।

এবার একটু জোরে ডাকলাম,”ও কাকী শুনতে পাচ্ছেন না।”

হটাৎ তিনি বড়ো বড়ো চোঁখ করে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,”কে তুমি? এখানে কেন এসেছিস?”

“আমি সন্তোষ। চিনতে পারছেন না।”

আবার বড়ো বড়ো চোখ করে কিছু ক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রহিলেন।তার পর কাকী বললেন,”ওহ্। কখন এলে। বাস। বসো।”

ঘরের কোন রাখা একটি চেঁয়ার টেনে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম,”কাকী শুনলাম নাকি আপনি আত্মহত্যা করতে গেছিলেন? কি হইছে আপনার?”

“আরে না। আমি না। ওই মেয়ের ভূত। আমাকে নিতে এসেছিল।”কাকী বললেন।

জোর গলায় বললাম,”কি সব উলো-পালটা কথা বলছেন? ভূত আবার কাউকে মারতে আসে নাকি। ওসব আপনার মনের ভুল।”

কাকী বললেন,"না সন্তোষ। আমার কথা তুমি নাইবা বিশ্বাস করলে। কিন্তু বিশ্বাস করো, ভূত আছে। একটি সুন্দর মেয়ের ভূত। মেয়েটি আজও আমাকে অনেক ভালো বাসে। সে প্রায় দিন আমার কাছে এসে। ওই মেয়ের ভূত আমাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়।"

একটু হেঁসে বললাম,"ওসব গুলগুল্প। মানুষ মরলে ভূত হয় না। ভূত কাউকে মারতেও কোনও দিন আসতে পারে না।"

"জানি আমার কথা শুনে তুমি হাঁসবে। তুমি শিক্ষিত ছেলে। আমার মতো মুখসুককো কাকীর কথা কেন বিশ্বাস করতে যাবে।"কাকী এক চোখে তাকিয়ে আমার উদ্দেশে বললেন।

"ঠিক আছে কাকী একটু বিস্তারিত ভাবে বলবেন মেয়েটি কে? কোথায় থাকে? সে কি করে ভূত হয়ে গেলো? এই ভূত আপনাকে কেন নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই?"

আমার প্রশ্ন শেষ হবার মাঝেই থামিয়ে দিয়ে কাকী বললেন,"তুমি ঐসব শুনে তুমি কি করবে। তুমি তো ভূতে বিশ্বাস করুন না। যাও তোমার মা ডাকছেন খাবার জন্য।"

কই না তো। আমি তো মায়ের কথা শুনতে পেলাম না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

"ঠিক আছে। আপনার কথা বিশ্বাস করছি। এবার তো বলবেন কে সেই মেয়ে ভূত? কেন সে আপনাকে মারতে চাইছে?"

হঠাৎ রেগে গিয়ে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে কাকী বললেন,"আমি বলছি চলে যা এখান থেকে? কেনো এসেছিস আমার বৌদির কাছে? বেশি প্রশ্ন করলে তোর ঘাড় মটকে দেবো। আমার বৌদির সঙ্গে তোকেও মেরে ফেলবো।"

কাকীর মুখে এমন কথা শুনেই ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। মানে হচ্ছে কাকীর মানসিক অবস্থা ভালো নেই। বিকেলের ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রভাব থেকে কাকী এখনো পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি। এই অবস্থাতে বেশি কথা বাড়ালে হিতে বিপরীত হতে পারে।

এই ভেবে বললাম,"ঠিক আছে কাকী। ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবো। কিন্ত আপনি কিছুই বলতে চাইছেন না। এখন আসি। মানে হয় মা আমার জন্য খাবার নিয়ে বসে আছেন।"

কথা শেষ করে আমি চেয়ার থেকে যেই না উঠতে যাচ্ছি। কাকী বললেন,"আরে নানা। একটু বসো। চা করে দি।"

আমি বললাম,"না কাকী। চা খাবো না। অনেক রাত হয়ে এলেও। শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য এসেছিলাম। আসি কাল সকালে বাকি কথা শুনবো।"

"ঠিক আছে।একুট বসো। তাহলে বলছি।"

কাকী বলতে শুরু করলেন,"তোমাদের বাড়িতে আসার আগে স্বামীর ও দুই বাচ্চা নিয়ে অন্য বাড়িতে ভাড়া থাকতাম।

ওই বাড়ির মালকিন মানে বাড়িবালির একটি মেয়ে ছিল। নাম কি জেনো। হ্যাঁ মঞ্জিরা। দেখতে ঠিক যেন সরস্বতীর মত সুন্দরী। যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি সুন্দর সাজপোশাক পরতো। দেখলেই মনে হত কোনও রাজকন্যা। সে কলেজে পড়তো। কলেজ ছাত্রী। তার মুখে সব সময় হাঁসি লেগেই থাকতো। সে আমাকে ওবৌদি বলে ডাকতো।"

“প্রতিদিন কলেজ থেকে ফিরে নিজের ঘরে না গিয়ে প্রথমে আমার কাছে চলে আসতো। আজ কলেজে সে কার সঙ্গে কিকি কথা বলেছে। ওর যে ছেলেকে ভালোবাসতো। তার সঙ্গে কিকি প্রেমের কথা হলো। সব কথা মনের আনন্দে আমাকে বলতো। কথা বলার সঙ্গে তার হাসি থামার নাম নিতো না। আর কথার মাঝে মধ্যে লজ্জা পেয়ে সে পেয়ে দুহাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে নিত।”

মঞ্জিরা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতো,”ও বৌদি তুমি খুব ভালো। আমি যদি মরেও যাই তাহলে তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। তোমার সঙ্গে থাকব।”

আমি বলতাম,”এমন অশুভ কথা মুখে আনতে নেই।পড়াশোনা করে আরোও বড়ো হবে। চাকরী করবে। স্কুলে দিদিমুনি হবে। এর পর তোমার বিয়ে হবে। রাজকুমারের মত বর পাবে। সংসার করবে। আমরা সবাই তোমার বিয়েতে খুব আনন্দ করবো।”

“না বৌদি। আমি কোনও দিন বিয়ে করবো না। আমার ওসব ভাল্লাগেনা না। আমাকে বিয়ের কথা বোলো না। আমি কোথাও যাবো না। আমি সারা জীবন তোমার সঙ্গেই থাকবো। তুমি আমার প্রিয় বৌদি। আমি যদি মরেও যাই তোমার কাছেই ফিরে আসবো। তোমার সঙ্গে থাকব।”এই বলে বলে আমাকে জড়িয়ে গালে চুমু দিয়ে দৌড়ে নিজের ঘরে চলে যেতো মাঞ্জিরা। তার পায়ের নুপুরের ঝুমঝুম শব্দ কানে ভেসে আসতো।

প্রায় দিন ও কলেজ থেকে ফিরে সবার আগে আমার কাছে আসত। অনেক গল্প করত সে।এবং চলে যেত।

এক দিনে বিকেলের ঘটনা.

“অনেক ক্ষণ হয়ে গেলো। কলেজ থেকে কি মঞ্জিরা এখনও ফেরেনি? ও সীমার মা আমার মেয়ে কি তোমার কাছে? তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও। বেলা হয়ে এলো কখন খাবে?”মঞ্জিরার মা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বললাম,”না তো। জানি না। মঞ্জিরা তো আজ আমার কাছে এলো না তো। মনে হচ্ছে কলেজ থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে গেছে। তাই সোজা নিজের ঘরে চলে গেছে।”

এর কিছুক্ষণ পরে মঞ্জিরার মায়ের কান্নার আওয়াজ শুনে ছুটে গেলাম। দেখি মঞ্জিরার ঘরের দরজা খোলা। ঘরে ঢুকেই আমি যা দেখলাম তাতে আমার চোখে জল চলে এলো। মঞ্জিরা গলায় দড়ি দিয়েছে।

মনের কোনে প্রশ্ন,”এমন কি হলো যে এই টুকু মেয়ে আজ এভাবে হটাৎ আত্মহত্যা করলো?”

চোখ তুলে আবার মঞ্জিরার দিকে তাকালাম। দেখি মঞ্জিরা অপলক চোখে আমার দিয়ে তাকিয়ে আছ। মনে হলো ও আমাকে কিছু বলতে চাইছে। তার ঠোঁটের কোণে স্পষ্ট হালকা হাঁসির রেখা। এই দেখে আমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেলাম। আমি আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। দুঃখ কষ্টে দু চোখে অঝরে জল পরতে লাগলো।

“ঐ টুকু সুন্দর ও হাসিখুশি মেয়ে মঞ্জিরা হটাৎ আত্মহত্যা কেন করলো? সে তো সব কোথায় আমাকে খুলে বলতো। সব সময় হাশিখুশি। কিন্তু কোন দুঃখে? কোন আঘাত সহ্য না করতে পেরে এভাবে নিজেকে শেষ করে দিলো।”এই প্রশ্নগুলো চিন্তায় বারবার ঘুরে বেড়াতে লগলো।

সব সময় মঞ্জিরার কথা কানে ভাসতে লাগলো। তার কথা ভেবে চিন্তায় দুচোখ ভরে জল চলে আসত।

দু দিন পর.

মঞ্জিরার আত্মহত্যার ঘটনার আজ দুই দিন হয়ে গেলো। বিকেলে বেলা। ঘরের মধ্যে নিজের বাচ্চাকে দুধ খাওয়া ছিলাম।

হটাৎ কানে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম,”ও বৌদি কি করছো?”

“কে?”এই বলে সামনে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। মনে হচ্ছে মনের ভুল।

এবার খুব কাছ থেকে স্পষ্ট ডাক শুনতে পেলাম,”ও বৌদি। আমাকে চিনতে পারছো না। আমি মঞ্জিরা। আমি মরে যেতেই আমার কথা একবারও মনে পরল না তোমার। দু দিনেই আমাকে ভুলে গেলে বৌদি।”

“এটা তো মঞ্জিরার গলার আওয়াজ। এই শুনে আমার সারা শরীরে শিহরণ দিয়ে উঠলো। আমার সামনে কেই নেই। কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেলাম মঞ্জিরা কথা। নানা এ হতে পারে না।”চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম।

এবার স্পষ্ট মনে হল কেউ যেন আমার কানের পাশে থেকে বললো,”ও আমার ভালো বৌদি। দেখো আমি এসেছি। আমি মঞ্জিরা। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না। এই তো তোমার পাশে বসে আছি।”

এই শুনে আমি প্রচন্ড ভয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম।

এই পর মঞ্জিরার সেই হো হো হাসি। আবার সে বললো,”ও বৌদি কি হলো? এভাবে হটাৎ লাফিয়ে উঠলে কেন? ভয় পেয়ে গেলে নাকি? আমি তোমকে নিতে এসেছি। চলোনা আমার সঙ্গে।”

এবার সত্যি আমার প্রচন্ড ভয় করতে লাগলো। ভয়ে হাত পা কাঁপতে লাগলো। ভয়ে সারা শরীর থেকে ঘাম ঝরতে শুরু করলো।

মাথায় দুঃচিন্তা শুরু হলো,”দু দিন হলো মঞ্জিরা আত্মহত্যা করছে। তাহলে কি মরেও তার আত্মা শান্তি পাই নি। সে কি ভূত হয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে? সে আমাকে মেরে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছে এসেছে? নানা। এটা হতে পারে না।”

আবার হোহো হাঁসির সঙ্গে শুনলাম,”ও বৌদি।কি হলো? ভয় পাচ্ছো নাকি? আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে আসিনি। তুমি আমার ভালো বৌদি। আজ আসি। তুমি ভলো থেকো।”

কথা শেষ হতেই মানে হলো কেউ যেন গালে চুমু দিয়ে দৌড়ে চলে গেলে। বারান্দায় নুপুরের ঝুমঝুম মঞ্জিরার ঘরের দিকে চলে গেল।

এই ঘটনার পর থেকেই মঞ্জিরা আমার কাছে প্রায় দিন বিকেলে বেলায় এসে। ও বৌদি বলে ডেকে। আর হো হো করে হেঁসে কথা বলতো। এবং দৌড় চলে যাবার সময় তার সেই নুপুরের শব্দ কানে শুনতে পেতাম।

একদিন বিকেল মঞ্জিরা এলো। জানি না কেন আজ আমাকের জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষন কান্না কাটি করলো। এই পর বললো,”ও বৌদি চলো আমার সঙ্গে।”এই বলে সে দু হাত দিয়ে আমার গলা টিপে ধরলো।

কোনও রকম ভাবে হাত দুটি ছাড়িয়ে আমি সোজা মঞ্জিরার মায়ের ঘরে দৌড়ে চলে এলাম।

হন্তদন্ত আমাকে এভাবে আসতে ডেকে মঞ্জিরার মা জিজ্ঞেস করলে,”কি হলো সীমার মা? এভাবে হাপাচ্ছো কেন? বসো জল দিচ্ছি।”

একুট জল খাবার পর আজ বিকেলে মঞ্জিরা যা কিছু করেছে, সব খুলে বললাম।

এই শুনে শাড়ির আঁচলে মুখ গুঁজে কাঁদতে শুরু করে দিলেন,”বেচারি মরেও আমার মেয়ের আত্মা শান্তি পেলো না।”

শেষে একদিন বাড়িতে এক ওঝাকে ডেকে পাঠানো হল। যে ঘরে মঞ্জিরা আত্মহত্যা করেছিল সেই ঘরে ওঝা কি সব মন্ত্রতন্ত্র করলো।

এই পর আমাকে ঝাড়ফুঁক করে একটা তাবিজ আমার বা বাহুতে বেঁধে দিলেন। এবং ওঝা বললেন,"অপঘাতে মৃত্যু হবার জন্য মঞ্জিরার আত্মা মুক্তি পাচ্ছে না। সে এই বাড়ির মায়া ছেড়ে যেতে চাইছে না। তবুও আমি ঘরে মন্ত্র পড়ে দিয়েছি। ও আর এই ঘরে ঢুকতে পারবে না।"

ওঝা আমাকে বললেন,"বৌমা একটু সাবধানে থেকো। হয়তো মঞ্জিরার অতৃপ্ত আত্মা মানে তার ভূত তোমার কাছে আবার আসার চেষ্টা করবে। কিছু এখন পাবার কিছু নেয়। হাতে যে তাবিজ বেঁধে দিলাম। সেটা ভুল করেও খুলে ফেলো না। মঞ্জিরার ভূত তোমার উপর ভর করতে পারে। ও তোমাকে মেরে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। তাই সে বারে বারে তোমার কাছে ফিরে আসছে। সে বাবার আসতে পারে। তাই সাবধান। রাতের অন্ধকারে একা ঘরে বাইরে বেরিও না। একা কোথাও যেও না।"ওঝার কথা শুনে আমার মনের ভয় আরো বেড়ে গেলো।

পরের দিন বিকেলে.

ওঝার ঝাড়ফুঁক ও মাদুলি দেওয়া সত্ত্বেও একদিন পরেই বিকেলে আমর উপর মঞ্জিরার ভূত ভর করলো। এই দেখে বাড়ির সবাই প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেলে। পাড়া প্রতিবেশীর বাড়িতে ভিড় জমে গেলো। ভূত তাড়াতে আবার সেই ওঝাকে বাড়িতে ডাকা হলো।

ওঝার সামনেই মঞ্জিরা বারবার একটি কথাই বলছিল,"হ্যা।আমি মঞ্জিরা। এই বাড়ির মেয়ে। আমি বৌদিকে কোনও দিন ছাড়বো না। আমি বৌদির সঙ্গে থাকবো। কেউ আমাকে আমার বৌদি থেকে দূর করতে পারবে না। ও বৌদি আমি তোমার কাছেই থাকবো।"এই বলে সেই হোহো করে হাসি মঞ্জিরার।

মঞ্জিরার ভূত তাড়াতে আমার উপর ওঝার ঝাড়ফুঁক প্রায় ঘন্টা খানেক চলে। আমরা শরীর থেকে মঞ্জিরার ভূতকে বের করার জন্য ওঝা আমাকে ঝাঁটা ও লাঠিপেটাও করে।

শেষ পর্যন্ত ভূত আমাকে ছাড়তে রাজি হয়। কিন্তু যাবার সময় মঞ্জিরা বলে গেলো,"ও বৌদি। আমি আবার ফিরে আসবো। তোমাকে নিয়ে আবার আসবো।"

ওঝা বললেন,"দেখো বৌমা এই ভূত তোমাকে মেরে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। আমার মনে হচ্ছে মঞ্জিরার আত্মা এখনো এই বাড়ীর আশে পাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমিই এই ভূতের শেষ নিশানা। এই ভূতের হাত থেকে রক্ষা পেতে একটা উপায় আছে। তুমি এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও।"

"ওঝার কথা মত তোমার বাড়িতে চলে এলাম। কিন্তু মঞ্জিরর ভূত এখানেও চলে এলো। আমার প্রচন্ড ভয় করছে। আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমার বাচ্চা দুটোর কি হবে।"

সব শুনে আমি বললাম,"কাকী চিন্তা করো না। আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন। ভূত বলে কিছুই। ওটা আপনার মনের ভুল।"

"না সন্তোষ। তুমি দেখলে বুঝতে পারবে এটা আমার মনের ভুল নয়। সত্যি ভূত আছে। মঞ্জিরার ভূত।ও আমাকে নিতে তোমার বাড়িতেও চলে এসেছে। সেই আজ বিকেলে আমার উপর ভর করেছিল। তাই মানে হয় আমিও ঘর গলায় দড়ি দিতে গেছিলাম।"কাকী বললেন।

আমি বোঝালাম,"আপনার কথা থেকে এটা বুঝতে পারছি মঞ্জিরা আপনাকে খুব ভালোবাসতো। পছন্দ করতো। আপনার সঙ্গে অনেক গল্প গুজব করতো। কিন্তু হটাৎ সেই মেয়েটি আত্মহত্যা করলো। এই ঘটনা আপনার মনে খুব বড়ো আঘাত দিয়েছে। আপনি সব সময় মঞ্জিরার কথা ভাবতে থাকেন। তাই মনে হয় মঞ্জিরা আপনার কাছে

এসে কথা বলছে। ওর কথা হাঁসি শুনতে পাচ্ছেন। এটা আপনার মনের ভুল। ভূতেভর একটা মানসিক রোগ। আমি যে হসপিটালে কাজ করি সেখানে আপনাকে নিয়ে যাবো। ডাক্তারের চিকিৎসায় আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।"

"আমি মূর্খ মানুষ। কোনদিন স্কুলের মুখ দেখিনি। তুমি শিক্ষিত ছেলে। তোমরাই বোঝো ভূত আছে কি নেই।"

হটাৎ কাকী আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে বললেন,"আমার মানে কোনো ভুল নেই। আমার কোনও রোগ হইনি। ভূত আছে। মঞ্জিরার ভূত।"এবং তিনি হো হো করে হাসতে লাগলেন।

"ও কাকী কী হলো? হাসছো কেন?"জিজ্ঞেস করলাম।

যেই না আর একটি কথা বলতে যাবো। আবার আগের মতো আমার দিকে বড়ো বড়ো চোঁখ করে কাকী বললেন,"আমি মঞ্জিরা। তুই কে? তুই আমার বৌদির কাছে থেকে দূর করতে এসেছিস? যদি তুই আমাদের মাঝে আসার চেষ্টা করিস, তাহলে তোকেও গলায় দড়ি দিয়ে মেরে ফেলবো। তোর ঘাড় মটকে দেবো। ঘর থেকে বেরিয়ে যা বলছি।"

এই শুনে বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল।

মনে মনে বললাম,"মনে হয় আর কথা বাড়ালে বিপদ বাড়তে পারে। আমার যদি এই ভূতে ভরগ্রস্ত অবস্থাতে বাড়িতে উৎপাত শুরু করে। আমার যদি গলায় দড়ি দিয়ে যায় তাহলে অঘটন ঘটে যাবে। কারণ কুসংস্কারে ডুবে থাকা এই কাকীর মানসিক অবস্থা ঠিক নেই। বিকেলের ভুতুড়ে ঘটনার পর থেকেই মনে হচ্ছে কাকী ভূতের ভরগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। তাই আমার প্রশ্ন ঠিক মত উত্তর না দিয়ে আমাকেও মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন।"

পাসে বসে থাকা বাচ্চা মেয়ে সীমাকে দেখে মনে হচ্ছে নিজের মায়ের এমন কান্ডকারখানা দেখে প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছে। তাই সে জোরে চিল্লিয়ে উঠলো।

ভয় পেওনা সীমা। আমি তো আছি। তোমার মায়ের কিছু হবে না।

ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। পেছনে সীমাও বেরিয়ে এলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,"খুকি তুমি কখন দেখলে তোমার মা গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছে?"

সীমা বললো,"বিকেলে মা আমার ছোট্ট ভায়ের জন্য দুধ গরম করছিল। আমি পাসে বসেছিল। হটাৎ দেখি মা নিজে-নিজেই কথা বলতে লাগলো। এর পর হোহো কার হাসতে লাগলো। কিছু বোঝার আগেই উঠে চৌকির উপর দাড়িয়ে পড়লো। এর পর নিজের শাড়ি নিজের গলায় যাতে লাগলো। এই দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। মামা বলে ডাকতেও, মা কিছুই শুনছিল না।"

"এর পর আমি তোমার মায়ের কাছে দৌড়ে গেছিলাম। তোমার মা, ঠাকুমা, কাকী এসে আমার মাকে বাঁচালো। দাদা আমার খুব ভয় করছে।"

আমি বললাম,"আরে চিন্তা করিস না। আমরা তো আছি। আমার থাকতে তোর মায়ের কিছু হবে না। আমি এখন আসছি। কিছু হলে বলবি।"

আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। হাত পা ধুয়ে খেতে বসলাম।

মাকে বললাম,"ভূত বলে কিছু নেই। সীয়ার মায়ের উপর কোনও ভূতে ভর করেনি। ওনার মানসিক রোগ হয়েছে। আমি কাকীকে কাল সকালে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাবো। মানসিক চিকিৎসা করলে কাকী ভালো হয়ে যাবেন। ভুতুড়ে মনের রোগ ঠিক হয়ে যাবে।"

মা বললেন,"আমি এতো কিছু জানি না। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি এই সব ব্যাপারে পড়বি না।"

সরাদিনের কাজের শেষে শরীর ক্লান্ত। খাওয়া দাওয়ার পরে আমার ডাইরি-তে আজকের কাকীর ভুতুড়ে ঘটনা লিখে রাখলাম।

এর পর বিছানাতে গা এলিয়ে দিতেই এক সাথে অনেক স্মৃতি কথা মনে পড়তে লাগলো। সেই ছোট্ট বেলা থেকে বাড়িতে ভাড়াটিয়া মহিলাদের উপর ভূতেভর, ঈশ্বরেভর, ওঝা, তান্ত্রিক দেখেছি। ভূত ছাড়াতে বাড়িতে ওঝা ডাকা হতো। ভূত তাড়াতে ওঝার ঝাড়ফুঁক চলতো। রাত দুপুরে বাড়িতে ভূতের ও ওঝার উৎপাতে তখন আমরা ছোট-ছোট্ট ভাই বোন দিনের বেলাতেও ভয়ে কাবু হয়ে থাকতাম।

এর পর আমি যখন মলদা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোস্টেলে থাকতাম। সেখানেও এক মহিলা ভূতের খপ্পরে পড়েছিলাম। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলো স্মৃতির পাতায় আজও জ্বলজ্বল করছে।

এই সব স্মৃতি পৃষ্টা ওল্টাতে ওল্টাতে কখন যে ঘুমিয়ে পরলাম মনে নেই।

বুধবার ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০২

সকালে বাড়িতে হৈ-চৈ শুনে ঘুম ভেঙে গেলো। বিছানা থেকে উঠতে শুনি,"সীমার মায়ের উপর থেকে মঞ্জিরার ভূত তাড়াতে বাড়িতে পুট্টু ওঝাকে ডাকা হয়েছে।"

এই শুনে আমার মাথা রগে প্রচন্ড গরম হয়ে গেলো। একি বাদরামি। আমার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী বই পত্র পড়াশোনা এবং আলোচনার জন্য এই বাড়ি থেকে ভূত-প্রেত, ওঝা-তন্ত্রককে তাড়িয়েছি। আজ আমার কোন সাহসে ওঝা ভূত যাতে আমার বাড়িতে আসতে চলেছে? দাড়াও আজ ওঝাকে হাড়েহাড়ে দেখিয়ে ছাড়বো ভূত কাকে বলে? ভূতে ভর কেন হয়? দেখাচ্ছি মজা।

মাকে জিজ্ঞেস করলাম,"বাড়িতে কে ওঝা ডেকেছে?"

মা বললেন,"তোমার ঠাকুমা।"

সোজা ঠাকুমার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস,"তুমি আবার ওঝাকে বাড়িতে ডাকছো কেন? আমি সীমার মাকে মনরোগ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবো। চিকিৎসা করলে কাকীর সঙ্গে যে ভুতুড়ে ঘটনা ঘটেছে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।"

এই শুনে ঠাকুমা রেগে বললো,"তুই কি বুঝবি সীমার মা কি ভয়ঙ্কর ভূতের খপ্পড়ে পড়েছে। যদি এই ভূতকে ওর শরীর থেকে এবং বাড়ি থেকে না তাড়ানো হয় তাহলে শুধু সীমার মায়ের নয়, বাড়ির সবার ভূত ক্ষতি করবে। একমাত্র পুট্টু ওঝা বাবাজি এই ভূতের হাত থেকে সীমার মা ও আমাদের রক্ষা করতে পারবেন।"

আমি বললাম,"এই বাড়িতে আমি থাকতে আর কোনও ভুতেভর। ওঝার ঝাড়ফুঁক চলবে না। আমার বারণ করা সত্ত্বেও যদি বাড়িতে ওঝা ডেকেছো তাহলে খুব খারাপ হয়ে যাবে।"

ঠাকুমা ধমকের সুরে বললেন,"ওঝাকে আমি বাড়িতে ডেকেছি। তুই এব্যাপারে একদম নাক গলাবি না। যা তোর অফিস যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।"

আমি বললাম,"আমি বলছি ওঝাকে আমাদের বাড়িতে এখনই আসতে বারণ কারো। আমি সীমাকে মাকে একটু পরে ডাক্তারের কাছ নিয়ে যাবো।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই ঠাকুমা হুমকির সুরে বললেন,"তোর সাথে ফালতু তর্ক করতে চাইনা। দুটো বই কি পড়ে ফেলেছিস, আমাকেই জ্ঞান দিচ্ছিস। যা নিজের কাজে।"

এর মধ্যে মা আমার সামনে এসে বললেন,"আমি কোনও ঝগড়া-ঝাটি চাই না। সন্তোষ তোর অফিসে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি স্নান কার রেডি হয়ে যা। রান্না হয়ে গেছে।"

আমি বললাম,"আজ অফিসে যাবো না। দেখি আজ পুট্টু ওঝা কি করে ভূত তাড়ায়। ওঝাকেই বাড়ি ছাড়া করবো।"

এই শুনে ঠাকুমার আমাকে ঠেলে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন এবং বললেন,"যতক্ষণ পর্যন্ত পুট্টু ওঝা বাবাজি সীমার মায়ের ঘাড়ে চাপা ভূতকে জব্দ করছেন না। ততক্ষণ তুই এই ঘরে বন্ধ থাকবি।"

এই শুনে মায়ের চোঁখে জল। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,"দেখ আমি কোনও অশান্তি চাই না। এমনিতে তোর ঠাকুমার সঙ্গে আমার মনমালিন্য। এমন অবস্থায় আমি চাইনা তোমাকে নিয়ে ঠাকুমা নতুন করে কোনও অশান্তি সৃষ্টি করুক।"

আমি মাকে বোঝালাম,"দেখো মা। আমিও অশান্তি করতে চাই না। সীমার মাকে কোনোও ভূতে ধরেনি। ভূতে ভর একটি মানসিক রোগ। সীমার মায়ের ভূতে ভার নামক একিট মানসিক রোগ হয়েছে। ডাক্তার দেখলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠাবেন। এখন যদি ওঝা ভূত তাড়ানোর নামে ঝাড়ফুঁক করেন। ঝাঁটা-লাঠিপেটা করে তাহলে কাকীর মানসিক রোগ আরো বেড়ে যাবে। আমি থাকতে ওঝাকে এই সব করতে দেব না।"

মা বললেন,"আমি এতো কিছু বুঝিনা। অনেক কষ্ট তোকে পড়িয়ে লিখিয়ে মানুষ করেছি। অনেক কষ্ট করে একটা চাকরি পেয়েছিস। তোর বিয়ের জন্য আমরা মেয়ে দেখছি। তাই তুই নিজের অফিসে যা। দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

আমি আবার বললাম,"আজ অফিস যাবো না। ওঝাকে শায়েস্তা করবো। ভূত ভারের ঝাড়ফুঁক করার নামে ওঝা যদি মহিলাদের মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করে। তাহলে আমি বাড়িতে পুলিশ ডাকবো।"

আমার কথা শুনেই আমার হাত নিজের মাথায় রেখে বললেন,"তোকে আমার দিব্বি। তুই ওঝারকে কিছু বলবি না। আমার দিব্বি পরেও তুই যদি ওঝার সঙ্গে কোনও ঝামেলা করবি। তাহলে তুই আজ আমার মড়া মুখ দেখবি।"

মায়ের হাত ধরে বললাম,"দেখো তুমি যখন আমাকে পড়িয়ে লিখিয়ে মানুষ করেছো। আমার শিক্ষার উপর বিশ্বাস রাখো। আমি এমন কোনও কাজ করবো না। যাতে আমাদের বাড়িতে অশান্তি হবে। তুমিও তো আমাকে অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছো। আর আমি ওঝার অন্যায়ের বিরুদ্ধে যখন রুখে দাঁড়াচ্ছি, তুমি কেন আমাকে বাধা দিচ্ছো? কেন দিব্বি দিচ্ছো মা?"

মা বললেন,"আমার ভয় হচ্ছে ওঝা মন্ত্রতন্ত্র করে যদি তোর কোনোও ক্ষতি না করে দেয়। তোর কিছু হয়ে গেলে আমার কে দেখবে বল?"

"আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। আমি আমি এত বইপত্র পড়ে জ্ঞান অর্জন করিনি। ওঝার কোনো তন্ত্রমন্ত্র আমার উপর প্রভাব ফেলতে পারবে না। আমার কিছুই হবে না। ওঝাকে কি ভাবে ফাঁদে ফেলতে হয়, সেটা আমি ভলো মতন জানি। তাই তুমি নিশ্চিন্ত থাকি।"আমি হেঁসে বললাম।

আমি মায়ের মনের কথা বুঝতে পারছি। কোনও মা চায় না, তার সন্তানের কোনোও ক্ষতি হোক।

সেই বাল্যকাল থেকে। ছোট্ট বেলা থেকে বাড়িতে ভূতেভর, ঈশ্বরে ভর, ওঝা তান্ত্রিকের ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি দেখে বড়ো হয়েছি। কিন্তু সত্যি কি ভূত, ঈশ্বর আছে? ওঝা বা তান্ত্রিক মন্ত্রতন্ত্র কার অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারে কি না? ওঝার ঝাড়ফুঁকে সত্যি কি ভূতেভর সুস্থ হয়ে যায় ইত্যাদি হাজার প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমি অনেক

বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদী বইপত্র নতুন করে পড়া শুরু করেছি। জ্ঞানের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের জমে থাকা ভূত-প্রেত, ওঝা-তান্ত্রিকের কমর্কান্ড ইত্যাদির মত হাজারো অন্ধবিশ্বাস দূর হতে থাকে।

আজ আমি এক নাস্তিক ও যুক্তিবাদী। এমন অবস্থায় আজ যখন আমাদের বাড়িতে ভূতেভরে মত ঘটনা ঘটেছে। ওঝা ঝাড়ফুঁক করার জন্য বাড়িতে আসছে। তাহলে তো ভূত এবং ওঝা দুজনকেই জনসমক্ষে পরীক্ষা নেওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ সকালে এসেছে। এই সুবর্ণ সুযোগ আমি কোনও মূল্যে হাত ছাড়া করতে চাই না।

আজ যদি ওঝার কুকীর্তি ফাঁস না করতে পারি। তাহলে আমি যে সব বন্ধুদের যুক্তিবাদী কথাবার্তা বলে বেড়াই। যাদের এটা বোঝাই ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই। ওঝা বা তান্ত্রিক কোনও ধরনের ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র করে কোনও রোগ ঠিক করতে পারে না।

এখন আমি যদি বাড়িতে ভূতের উৎপাত। ওঝার কান্ড-কারখান বন্ধ না করতে পারি। তাহলে বন্ধুরা, আত্মীয়, পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই আমাকে প্রশ্ন করবেন,"তোমার বাড়িতে এক ভাড়াটিয়া মহিলার উপর ভূতের ভর হল। তাকে ঝাড়ফুঁক করার জন্য ওঝা তোমার বাড়িতে এলো। আর তুমি কেন মুখ বুঝে থাকলে? কেন ওঝার মুখোমুখি হবার সাহস দেখালে না?"

আমি জোর গলায় বললাম,"দেখো মা আমি এমন কোনো কাজ করবো না যাতে বাড়িতে অশান্তি বাড়ে। আমি শুধু এইটুকু দেখতে ওঝা আমার প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতে পারছে কি না। এর জন্য আজ আমি ওঝাকে চ্যালেঞ্জ জানাবো। দয়াকরে আজ আমার পথে বাধা দিও না।"

"ঠিক আছে। তুই যখন এতো করে বলছিস। তাহলে বাধা দেব না। কিন্তু একটু সাবধানে থাকিস।"এই বলে মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। এই দেখে আমি হাসবো না কাঁদবো ভেবে পেলাম না। বাড়ির সামনে পাড়া-প্রতিবেশী লোকেদের মেলা ভিড়। কারণ এনারা আমার বাড়িতে ভূতেভর এবং ওঝার ঝাড়ফুঁক তামাশা দেখতে ভিড় করেছেন। অবাক করার মতো বিষয় হলো এই ভিড়ের মধ্যে আমার বাল্যকালের গৃহ শিক্ষিক তপন স্যার কেও দেখতে পেলাম।

কাছে গিয়ে স্যারকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলাম,"আপনি এখানে? কেমন আছেন?"

"ভালো আছি সন্তোষ।"

"বলুন কোনও কাজ আছে কি?"আবার জিজ্ঞেস করলাম।

স্যার হেঁসে বললেন,"নানা। কোনও কাজ নেয়। শুনলাম তোমার বাড়িতে এক মহিলাকে ভূতে ভর করেছে। ওঝা আসছে ঝাড়ফুঁক করতে। তাই দেখতে চলে এলাম।"

এই শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম,"আমি কোন মূর্খের স্বর্গে বাস করছি। যে শিক্ষকের হাত ধরে অ-আ-ক-খ লিখত ও পড়তে শিখেছি। বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে কলেজ পাস করেছি। বিজ্ঞান এর বইপত্র পড়ে যুক্তিমনস্ক হয়েছি। ভূতে ভর, ওঝার বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী যুদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছি আমি। এমন সময় আমার গৃহ-শিক্ষিক ভূতেভর এবং ওঝার ঝাড়ফুঁক দেখার জন্য এসেছেন! এই ভেবে লজ্জায় মাথা হেট্ হয়ে গেল।"

এদিকে ঠাকুমার ঘরের সামনে মহিলাদের জটলা। কি ব্যাপার। এগিয়ে যেতেই দেখলাম, প্রায় ৩০ বছর বয়সী এক যুবক। গায়ের রং কালো। সাস্থবান। ফুলপ্যান্ট ও জামা গায়ে। একে-একে মহিলারা সেই যুবকের পায়ে প্রণাম করছেন। যুবকটি তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আশীর্বাদ দিচ্ছেন।

এই দেখে বুঝতে একটুকুও অসুবিধা হলো না যে ইনিই হলেন সেই পুট্টু ওঝা।

পুট্টুর বাবাও ওঝা ছিলেন। ওনাকে আমাদের বাড়িতে আসতে দেখেছি। তখন তিনি তান্ত্রিকের পোশাকে আসা-যাওয়া করতেন। কিন্তু পুট্টু ওঝা ওঝা তান্ত্রিকের পোশাক পাড়ে নি কেন? এই প্রশ্ন মাথায় এলো।

এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো বলে মহিলাদের জটলা টপকে পুট্টু ওঝার সামনে দাঁড়াতেই যুবকটি বললেন,"তুমিই সন্তোষ শর্মা। তোমার কথা অনেক শুনেছি। তোমার ঠাকুমা তোমার কথা প্রায় দিন বলেন। বলো কি জানতে চাও?"

চমৎকার। আমার সম্পর্কে আগাম খবর রাখেন ওঝা। তাই এনার সঙ্গে সোজা-সাপ্টা কথা বলাই উচিৎ। আমি বললাম,"সীমার মাকে কোনোও ভূতে ভর করেনি। ওনার এটা মানসিক রোগ।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই। আমাকে থামিয়ে দিয়া ওঝা বললেন,"বাহ্ বাহ্। এই হাটু বয়সে তুমি দেখছি সবকিছু জেনে গেছো। তুমি নাকি বলছো ভূত বলে কিছুই নেই। চলো আজ তোমাকে চাক্ষুষ প্রমাণ দেবো সত্যি ভূত আছে কি নেই।"

মনে মনে ভাবলাম,"এখন যদি ওঝার সঙ্গে তর্ক যুদ্ধ শুরু করি। তাহলে ভূতে ভার এই পেছনে আসল সত্যটি। ভূতে ভর এর মনস্তত্ব কারণ উপস্থিত লোকেদের সামনে তুলে ধরতে সমস্যা হতে পারে। তাই সবার আগে এটা দেখার জন্য ধের্য ধরে, একটু অপেক্ষা করতে হবে যে পুট্টু ওঝা ভূতে ভরকে কেন্দ্র করে কি কান্ড-কারখানা করতে চাইছেন। তারপর ওঝাকে যুক্তিবাদী ভাবে জব্দ করা যাবে।"

আমি ওঝাকে বললাম,"ঠিক আছে। আপনি কি করে ভূতে ভরের ঝাড়ফুঁক করেন, সেটা আমিও দেখতে চাই? তার পর এই বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করবো।"

ওঝা বললেন,"তুমি শিক্ষিত ছেলে। তোমাকে বেশি কিছু বোঝাতে হবে না। নিজের চোখে দেখ ভূতে সত্যি ভর করে কি না। আমি কি করে ঝাড়ফুঁক করি। ঝাড়ফুঁকে কি করে ভূত জব্দ হয়। তারপর যদি কোনও প্রশ্ন থাকে আমারকে বলো। আমি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেবো।"

আমি ভালো খোকার মতো মাথা নেড়ে বললাম,"ঠিক আছে। চলুন আপনার ভূতের ঝাড়ফুঁক দেখি।"

সবাই মিলে ঘরের উঠোনে গেলাম। ওঝা হাত দিয়ে গোল করে জায়গা চিহ্নিত করে দিলেন। ঝাঁটা দিয়ে জায়গা পরিষ্কার করা হলো। গোবর জল দিয়ে গোল করে লেপে দেওয়া হলো। এরই পার ওঝার নিজের ঝোলা থেকে একটি ধুনুচি বের করলেন। ধুনুচিতে ধুপ-ধুনো, নারকেলের ছোবার, দিয়ে আগুন জালানেন। দুহাতে ধুনুচি নাচিয়ে নাচিয়ে মন্ত্রতন্ত্র পড়লেন ওঝা।

এই পর সীমার মাকে ডেকে সেই গোল করে চিহ্নিত জায়গাতে বসানো হলো। দেখলাম গত রাতের ঘটনার স্পষ্ট ভয়ের ছাপ ওনার চোঁখে মুখে এখনো লেগে রয়েছে। সীমার মায়ের পাসে পুট্টু ওঝা বসলেন। এবং দুজন মুখোমুখি আমিও বসলাম। উপস্থিত পাড়া-প্রতিবেশীরা একটু দূরে গোল করে দাড়ালেন। মনে হচ্ছে ভুতুড়ে তামাশা হচ্ছে। তাই সব্বাই ভিড় করে দেখতে এসেছে।

রাগ চেপে রেখে ভাবলাম,"সবার আগে ওঝার কান্ড-কারখানা দেখি। তারপর দেখাবো ভুতুড়ে তামাশা কাকে বলে।"

সীমার মা বড়ো-বড়ো চোখ করে চারদিক সবাইকে দেখে চলেছেন।

ওঝা জোরে-জোরে মন্ত্র পড়া শুরু করলেন। হাতে ধুনুচি তুলে সীমার মায়ের মুখের সামনে ঘোরাতে লাগলেন। চারদিক ধোঁয়ায় ভরে গেলো। মানে হচ্ছে ধুনচিতে লংকা পোড়ানো হচ্ছে। তাই আমার চোখমুখ জ্বালা করতে লাগলো।

হটাৎ সীমার হো-হো করে, জোরে হেঁসে উঠলেন। এই দেখে সবাই চমকে উঠলাম। এই কিছুক্ষন পরেই দেখি প্রচন্ড জোরে-জোরে কাকী মাথা ঘোরাতে শুরু লাগলেন।

পুট্টু ওঝা জিজ্ঞেস করলেন,"কে তুই? এখানে কেন এসেছিস?"

সীমার মা আগের মতো মাথা ঘুড়িয়ে চলেছেন।

আবার ওঝা জিজ্ঞেস করলেন,"কে তুই? বল। তাড়াতাড়ি বল।"

"আমি মঞ্জিরা। আমি মঞ্জিরা।"এই বলে আমার সীমার মা আগের মতো মাথা নেড়ে চললেন।

ওঝা আবার জোরে জোরে মন্ত্র পড়া শুরু করলেন। এবং সীমার মাকে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন,"তুই এখানে কেনো এসেছিস? কি চাই তোর? আমি বলছি একে ছেড়ে চলে যা।"

বড়-বড় চোখ করে সীমার মা বললেন,"আমি মঞ্জিরা। আমি আমার বৌদির কাছে এসেছি। বৌদিকে আমি নিতে এসেছি।"

"তুই মঞ্জিরা? এর প্রমাণ দে।"এই বলে ওঝা পকেট পেন বের করলেন। পেন দিয়ে নিজের হাতের তালুতে দুটো শব্দ লিখলেন।

এরপর সীমার মায়ের চোঁখের সামনে তালু মেলে ধরে ওঝা বললেন,"শুনেছি তুই কলেজে পড়াশোনা করেছিস। পড়ে বল আমার তালুতে কি লিখেছি? পড়ে দেখলেই এটা প্রমাণ হয়ে যাবে তুই মঞ্জিরা।"

সীমার মা বড়-বড় চোখ করে ওঝার হাতের তালুর দিখে তাকিয়ে রইলেন।

পুট্টু ওঝা বার বললেন,"কিরে, চুপ করে আছিস কেনো? পড়ে বল, কি লেখা আছে তালুতে?"

না মুখে কোনও শব্দ উচ্চারণ না করে। আবার আগেই মতই সীমার মা চুপ করে ওঝার তালুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এই দেখা আমিও উৎসাহিত হলাম। আমি আগেই শুনেছি সীমার মা নিরক্ষর। কোনও দিন স্কুল ও বইএর মুখ দেখাননি। গরীব মাবাবা মেয়েকে (সীমার মা) খুব ছোট্ট বেলায় বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। স্বামী লরি চালক। বিহারে বাড়ি। কিন্তু দু পয়সা রোজগারে আশায় এই পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতায় এসেছেন। আমাদের মতন কোনও ভাড়া বাড়িতে তাঁদের সংসার চলে। এই অবস্থাতে ভূতে ভরের উটকো সমস্যা জন্ম নিয়েছে। আর্থিক অনটনের মধ্যে এই নিয়ে ওনাদের সংসারে নতুন অশান্তি লেগেছে। এখন যদি ওঝা এই ভুতের হাত থেকে বউকে বাঁচাতে পারে, এই চিন্তায় স্বামীর দুচোখে ঘুম নেই।

কাল রাতে সীমার মায়ের কাছে কথা বলার সময় আমি জানতে পরেছিলাম। তখন কাকী নিজের সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছিলেন। তিনি এটাও জানিয়েছিলেন,”ওনার উপর যে ভূতে ভর করে। তার নাম মঞ্জিরা। সে কলেজে পড়তো।”

আমার মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দিলো,”কাকী পড়াশোনা জানেন না। কিন্তু ওনাকে যে ভূতে ধরেছে সে কলেজ ছাত্রী ছিল। তাহলে তো মঞ্জিরার ভূত ওঝার তালুতে লেখা অবশ্যই পড়তে পারবে!”

আমিও মনোযোগ দিলাম,”সত্যি যদি সীমার মা ওঝার তালুতে লেখা পড়ে শুনিয়ে দেন, তাহলে এটা প্রমাণ হয়ে যাবে যে মঞ্জিরা আত্মহত্যা করার ফলে ভূত হয়ে গেছে। এবং সে তার প্রিয় বৌদি মানে সীমার মায়ের উপর ভর করেছে।”

সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এর পর পুটু ওঝা আবার বললেন,”কিরে তুই কেন পড়তে পারছিস না? ঠিক আছে পড়তে হবে না তোকে।”

“আমি বলছি এখনই একে ছেড়ে চলে যা। না হলে আমি তোকে মন্ত্র পড়ে বোতলে বন্ধ করে দেবো।”

সীমার মা প্রচন্ড জোরে হেঁসে বললেন,”আমি মঞ্জিরা। আমি আমার বৌদিকে নিতে এসেছি। আমি বৌদিকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো। তুই যদি আমাদের মাঝে আসার চেষ্টা করিস, তাহলে তোমাকেও মেরে ফেলবো। তোর ঘাড় মটকে দেবো।”

আবার তিনি মাথা নাড়াতে লাগলো।

ওঝা জোরে-জোরে মন্ত্র পড়া শুরু করলো। দুহাতে ধুনুচি তুলে সীমার মায়ের মুখের সামনে ঘোরাতে লাগলেন। এর পর ঝোলা থেকে এক মুঠো সরষে বের করে কাকীর উপর ছুড়ে মারলেন এবং বললেন,”তুই একে ছাড়বি কী না বল?”

কাকী বললেন,”না। আমি এক যাবো না। আমার বৌদিকে আমি নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবো। আমি একা বৌদি কে ছেড়ে যাবো না।”

সীমার মায়ের গালে একটা থাপ্পর কষিয়ে ওঝা বললেন,”বল তুই যে মহিলাকে ছেড়ে যাবি কি না? তাড়াতাড়ি বল।”

“না, না। আমি যাবি না। বৌদির সঙ্গে থাকবো। আমি আমার বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। বৌদিকে ছেড়ে যাবো না।”এই কথা গুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে কাকী হো হো করে হেসে উঠলেন।

আবার একটা গালে থাপ্পড় কষিয়ে প্রচন্ড রেগে গিয়ে ওঝা বললেন,”তুই কেন, ভূতের বাপও ছেড়ে যাবে।”

ভূতেভর এর নামে এক মানসিক রুগীকে সীমার মাকে এই ভাবে মারতে দেখা আমি ধমকের সুরে পুটু ওঝাকে বললাম,”আপনি আবার যদি কাকীর গায়ে হাত তুলেছেন। কাকীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার চেষ্টা করেন, তাহলে খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিলাম।”

কথা শুনেই পাসে দাড়িয়ে থাকা ঠাকুমা চিল্লিয়ে আমাকে বললেন,”তোকে আগেই বলেছি, তুই পুটু বাবাজির ঝাড়ফুঁকের কাজে বাধা দিবি না। তুই ওঝার পাস থেকে উঠবি কি না বল। নাহলে তোকেও দুটো থাপ্পড় কাসিয়ে দেবো।”

আমি বললাম,"এই ওঝা ঝাড়ফুঁকের নামে কাকীকে যদি আবার মারধর কার। গায়ে হাত তোলে তাহলে পেঁদিয়ে ওঝার সব ভূত তাড়িয়ে দেব। আমি এখনি পুলিশকে ডেকে আনবো।"

উপস্থিত লোকেদের উদ্দেশে বললাম,"ভূতে ভরের মতন এই মানসিক রুগী কাকীকে চিকিৎসার নামে ঝাড়ফুঁক করা হচ্ছে। রোগীকে মারধর করা হচ্ছে। এটা কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে লেখা আছে যে রুগীকে চিকিৎসার করতে গিয়ে মারধর করতে হবে? ভূতে ভরের মত মানসিক রোগগ্রস্ত রুগীকে মানসিক চাপ থেকে দূরে রাখতে হয়। তাকে শান্ত পরিবেশে রাখতে হবে। কিন্তু এখানে তো সবকিছু উল্টো দেখছি। ভূতে ভরের মত মানসিক রোগের চিকিৎসার নাম ঝাড়ফুঁক এবং রুগীকে চর থাপ্পড়, মারধর করা হচ্ছে। এভাবে তো মানসিক রুগী আরও বেশি করে অসুস্থ্য হয়ে পড়বে। হয়তো বা পাগলও হয়ে যাবে।"

আমাকে শান্ত করে ওঝা বললেন,"দেখা সন্তোষ। তোমার কাকীর উপর এক ভয়ংকর ভূতে ভর করেছে। এনার শরীর থেকে যদি মঞ্জিরার ভূতকে না তাড়াতে পারি। তাহলে এই ভূত সীমার মাকে মেরে ফেলবে। এর পর তোমার বাড়ির লোকেদের ক্ষতি করবে। তোমাকেও ভূত ছাড়বে না। তাই আমার কাজে বাধা দিও না।"

এদিকে হটাৎ সীমার মা বলে উঠলেন,"আমি কোথাও? আমি এখানে কি করে এলাম? তোমরা এখানে ঝগড়া করছো কেন? বাড়িতে এত লোক কেন এসেছে?"

কাকীর ভূতে ভর কেটে গেছে।

এই দেখে পুট্টু ওঝা আমাকে বললেন,"দেখলে তো? তোমার জন্য ভূত পালিয়ে গেলো।"

এই শুনে আমি হাসবো না কাদবো। ওঝাকে জিজ্ঞেস করলাম,"ভূত তো পালাল। এবার কি করবেন?"

“মঞ্জিরার ভূত পালাই নি। সে আশেপাশে কোথাও আছে। সুযোগ পেলে সে আবার সীমার মায়ের কাকীর উপর ভর করবে। এবার এই মঞ্জিরার ভূতকে আর ছাড়া হবে না। এবার এলে লাঠি দিয়ে এমন পেদাবো। বাপ-বাপ বলে ছেড়ে পালাবে।"এই বলে ওঝা উঠে দাঁড়ালেন।

সীমার মা নিজের ঘরে চলে গেলেন। কিন্তু ঘরের উঠোনে তামাশা দেখতে আসা লোকেদের ভীড় আগের মত ঠাঁই দাড়িয়ে। আবার যদি ভূত ফিরে আসে। ওঝা তাকে কি করে শায়েস্তা করে। সেটা নিয়ে লোকের কথা বলাবলি শুরু করে দিলো।

ঠাকুরের কাছে শুনেছি, পুট্টু পেশায় ইলেকট্রিশিয়ান। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ওয়ারিং করে। ইলেকট্রিকাল সমস্যায় হলে সেটা ঠিক করে দেয়। এই কাজের সঙ্গে ভূত তাড়ায়।ঝাড়ফুঁক করেন। সোজা কথায় পুট্টু নিজের বাবার মত ওঝাগিরি করেন। কিন্তু নিজে থেকে করার কাছে পয়সা নেন না। লোকেরা নিজের ইচ্ছায় যা দেয়, সেটাতে খুশি।

হ্যাঁ। যেটা বলছিলাম।

পুট্টুর বাবাও বড়ো মাপের ওঝা-তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁকে দেখলেই ভূত বাপ-বাপ বলে পালাতো। উনি নিজের বাড়িতে ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র করার জন্য একটা আশ্রম খুলে রেখেছিলেন।

ঠাকুমার কাছে শুনেছি,"পুট্টুর তান্ত্রিক বাবার মৃত্যুর পরেও অনেক মানুষ ওনার বাড়িতে এবং আশ্রমে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় নিয়ে আসতো। কিন্তু ছেলে পুট্টু ঝাড়ফুঁক করতে। তানমন্ত্র করতে জানত না। তাই লোকেরা নিরুপায় হয়ে। নিরাশ হয়ে বাবার আশ্রম থেকে ফিরে যেতেন।

এমন অবস্থায় একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটলো।

এক অমাবস্যার রাতে পুট্টুর স্বপ্নে তাঁর তান্ত্রিক বাবা দেখা দিলেন।

তিনি এসে পুট্টুকে বললেন,"বেটা। এবার থেকে তুই আমার আশ্রমে বসবি। তুই ওঝা হবি। আমার মতন ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্রতন্ত্র করবি।তোকে আমি ওঝা ও গিরির গুপ্ত মন্ত্র শেখাবো। তন্ত্র সাধনার গুপ্ত বিদ্যায় দীক্ষিত করবো।"

"বেটা ওঠ। দেখ আমি এসেছি।"ঘুমের মধ্যে পুট্টু স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

"মনে হচ্ছে বাবা আমাকে ডাকছেন?"এই ভেবে পুট্টুর ঘুম ভেঙে গেলো। ঘরের মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

হটাৎ পুট্টুর মনে পড়লো,"এক মাস হয়ে গেছে বাবার মৃত্যুর। তাহলে আমি কার কথা শুনতে পেলাম? তাহলে কি আমি স্বপ্ন দেখছিলাম?"

এই ভেবে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই পুট্টু আবার স্পষ্ট শুনতে পেলেন,"বেটা শুয়ে পড়লি নাকি? দেখ আমি এসেছি, তোর বাবা"

ধড়ফর করে বিছানা থেকে উঠে বসলো পুট্টু।

"ভূতের ঝাড়ফুঁক করতে করতে তো বাবা মারা গেছিলেন। তাহলে কি বাবাও মারা যাবার পর ভূত হয়ে ফিরে এসেছেন? বাবা ভূত হয়ে গেলো নাকি? এখানে কেন এসেছে? বাবার ভূত আমার ঘাড় মটকাতে এসেছে। নানা আমি ভূতের হাতে মরতে চাই না।"

এই ভেবে পুট্টু ভয়ে বিছানার উপর বসে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেলো।

"আরে ভয় পাচ্ছিস কেন বেটা? আমি তোর বাপ। বাবা হয়ে কেউ কি নিজের সন্তানকে ক্ষতি করে?"অন্ধকারে আবার কে যেন বললো।

এই শুনে পুট্টু জিজ্ঞেস করল,"না না। তুমি আমার বাবা হতে পারো না। আমি নিজের হতে আমার বাবার মৃত্যুর তাঁর শবের রানী রাসমণি ঘাটে মুখাগ্নি করেছি। হিন্দু শাস্ত্র মতে বাবার আত্মার শান্তির জন্য শ্রাদ্ধ করেছি। আত্মীয়-পরিজনকে বাপের শ্রাদ্ধের মাছ-ভাত খাইয়েছি। বাবার আত্মার মুক্তি পেয়েছে। তাহলে কে তুমি? তুমি আমার বাবা হতে পারো না।"

কথা শেষ হবার আগেই পুট্টুর গালে কে যেন একটা থাপ্পর মারলো।

গালে হাত বোলাতে-বোলাতে পুট্টু বললো,"বাবাগো বাবা। এই কোন ভূত বাড়িতে এলোরে? বাবাকে কত বার বারণ করেছিলাম বাড়িতে ভূতের ঝাড়ফুঁক করো না। আমায় ভূত নাম শুনলেই হাত পা কাঁপতে শুরু করে দেয়। আজ এই মাঝ রাতে কোন ভূত আমার বাবা আমাকে প্যাঁদাতে এসেছে।"

আবার অন্ধকার থেকে আওয়াজ এলো,"আরে বেটা। এতো ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি তার বাপরে।"

অদৃশ্যহাত পুট্টুর মাথায় স্পর্শ করলো। অন্ধকার থেকে শব্দ ভেসে এলো,"শরীরের মৃত্যু হয়। আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মা অমর।"

এই শুনে পুট্টুর সাহস বাড়লো। জিজ্ঞেস করলো,"বলো বাবা। আপনি এখানে কেনো ফিরে এসেছেন?"

ঘন অন্ধকারে কানের কাছে এসে বাবা বললে,"বেটা পুট্টু। আমার দেহ ত্যাগের পার আমার আশ্রমের ওঝার স্থান শূন্য পড়ে আছে। অনেক মানুষ সমস্যা আমার আশ্রমে আসছেন। কিন্তু তাঁরা আমার দর্শন না পেয়ে। আমার

আশীর্বাদ না পেয়ে নিরাশ ও খালি হাতে ফিরে যাচ্ছে। এইসব দেখে আমার আত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠছে। তাই আজ তোর কাছে চলে এলাম।"

বাবার বেদনার কথা শুনে পুট্টুর চোঁখে জল। মরেও বাবার আত্মা শান্তি পাইনি।

পুট্টু জিজ্ঞেস করলেন,"বলুন বাবা। আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?"

বদ্ধ ঘরে আওয়াজ এলো,"তুই আমার আশ্রমে বসবি। তুই আমার ওঝার স্থানে বসবি। তুই তান্ত্রিক-ওঝা হবি। তুকতাক -ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র করে লোকেদের সমস্যা দূর করবি। তুই পুট্টু ওঝা তান্ত্রিক জনকল্যাণ কাজ করবি।"

পুট্টু মাথা নাড়িয়ে বললেন,"নানা। আমার দ্বারা এই সব ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র হবে না। আমার ঝাড়ফুঁক, ভূত-প্রেত থেকে ভয় লাগে। ভূতের নাম শুনলেই আমার হাত পা কাঁপতে শুরু করে। এই অবস্থাতে আমার দ্বারা ভুতুড়ে ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র করা তো দূরের কথা। তোমার আশ্রমেও ঢুকতে গা ছমছম করে। সব সময় হয় ওখানে প্রেত্মামতা ঘুরঘুর করছে। নানা বাবা। আমি ওঝাগিরি করতে পারবো না।"

পুট্টুর একনাগাড়ে বকবক শুনে বাবা তাঁর গালে সপাটে থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে বললেন,"আমার নাম শুনলেই ভূত বাপ-বাপ বলে পালায়। আর আমার আমার মহান পুত্র পুট্টুর ভূতের নাম শুনলেই হাতপা কাঁপতে লাগে। একটি ভীতুর ডিম তৈরি হয়েছিস। অপদার্থ কোথাকার। তোর মতো গাধা তান্ত্রিক বাবার বদনাম করে ছাড়বি। তুই কি আমাদের গুষ্টির মান-সম্মান ডুবিয়ে দিবি? আমার আদেশ, তোকেই ওঝাগিরি করতে হবে।"

বাবার থাপ্পড় খাবার পর মনে হলো পুট্টুর জ্ঞান চক্ষু খুললো। বললেন,"বাবা আমি তো ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র কিছুই জানি না। তাহলে আমি কি করে ওঝাগিরি করবো?"

অন্ধকার ঘরে গভীর গলায় শব্দ ভেসে উঠলো,"আমি শেখাব ওঝা-তান্ত্রিকের তন্ত্রমন্ত্র। তোকে শেখাবো ওঝাগিরির গুপ্ত রহস্য। এর জন্য তোকে বেশি কিছু করতে হবে না। সকালে স্নান করে আমার আশ্রমে আমার আসনে বসা শুরু কর। দেখবি তুই আমার মতন ঝাড়ফুঁক করতে পারছিস ...."

হটাৎ দরজায় জোরে-জোরে ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ শুনে পুট্টুর ঘুম ভেঙে গেলো। বিছানা থেকে নেমে দরজা খুললেন।

দেখলেন, তাঁর মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

মা জিজ্ঞেস করলেন,"কতক্ষন ধরে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি। শুনতে পেলি না। তুই ঘরে মধ্যে কার সঙ্গে কথা বলছিলি?"

হাই তুলে পুট্টু বললেন,"না তো। আমি তো শুয়ে ছিলাম। আমি আবার কার সঙ্গে কথা বললো?"

মা বললেন,"আমি তো শুনতে পেয়েছি, তুই বলছিলি, ওঝাগিরি করবো না।"

মায়ের কথা শুনেই পুট্টুর হটাৎ মনে পড়ে গেলো রাতের ঘটনা,"তাহলে কি সত্যি রাতে বাবা আমার কাছে এসেছিলেন? আমাকে ওঝা গিরির তন্ত্রমন্ত্র শেখাতে চাইছিলেন তিনি! ওনার সঙ্গে কথা বলেছি। সেটা কি মায়ের কানেও গেছে।"

অন্য দিনের মত আজও পুট্টুর বাড়িতে লোকেদের ভীড়। রাতের ঘটনা এখনও স্পষ্ট মনে আছে পুট্টুর। বাবার তাঁকে আদেশ দিয়েছেন,"তোকে ওঝা হতে হবে। তোকে ওঝাগিরি করতে হবে। লোকের সমস্যা দূর করবি। ঝাড়ফুঁক ও তন্ত্রমন্ত্র করে লোক-কল্যান কাজ করবি।"

তাড়াতাড়ি স্নান করে। বাবার আশ্রমে প্রবেশ করলেন পুট্টু। বাবার আসনে গিয়ে বসলেন। আসনেই বসতেই পুট্টুর মাথায় স্পর্শ করে কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বললে,"বেটা তুই ওঝা হবি। তুই আমার মতন তান্ত্রিক-ওঝা হয়ে যাবি।"

এই শুনে পুট্টুর মনের সাহস বেড়ে গেলো। ভাবলেন,"তাহলে সত্যি রাতে বাবাই আমার কাছে এসেছিলাম। তিনি এখনো আমার পাশেই আছেন।"

আবার কানের কাছে আদেশ শুনতে পেলেন,"যা ব্যাটা। আশ্রমের বাইরে অনেক লোক তোর আশির্বাদ নেবার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। ওদেরকে সমস্যা থেকে মুক্ত কর।"

পুট্টু বাবার আসন থেকে উঠে বাইরে বেড়িয়ে এলেন। পুট্টুকে দেখেই ভিড় করে দাড়িয়ে থাকা লোকেরা একসঙ্গে বলে উঠলো,"জয় বাবা, জয়। জয় পুট্টু বাবার জয়।"

এই পর একে-একে মহিলা ও পুরুষরা পুট্টু বাবার পায়ে প্রণাম করলেন। বাবা পুট্টু প্রত্যেকের সমস্যা শুনলেন। বাবাজি কাউকে বা ঝাড়ফুঁক করলেন। কাউকে বা জলপড়া, তেলপড়া, তাবিজ, মাদুলি বা ছাইভস্য দিলেন।

ইলেকট্রিশিয়ান পুট্টু এক রাতের মধ্যেই পুট্টু বাবাজি হয়ে গেলেন। বাবাজির সঙ্গে পুট্টুকে কেউ-কেউ ওঝাঁজি বা তান্ত্রিক বাবাও বলে ডাকতে লাগলেন। পুট্টু ওঝা সকাল - বিকেল বাবার আশ্রমে লোকেদের ঝাড়ফুঁক করতে লাগলেন। কখনো কোনো মহিলার উপরে ভর করা ভূতকে তাড়াতে তাঁকে চড়-থাপ্পড় থেকে শুরু করে লাঠিপেটা, ঝাঁটাপেটাও চলতো।

আজ সকালে পুট্টু ওঝা আমার বাড়িতে এসেছেন সীমার মাকে ভূতেভর থেকে মুক্ত করতে। ভূতে ভরের ঝাড়ফুঁক করতে। মঞ্জিরার ভূতকে জব্দ করতে।

আজ সকালে যখন হঠাৎ শুনতে পেলাম যে পুট্টু ওঝা সীমার মাকে মঞ্জিরার ভূতের হাত থেকে বাঁচাতে আসছেন। তখন ভেবেছিলাম,"পুট্টু ওঝাকে জব্দ এটাই সুবর্ণ সুযোগ করার।"

ভূতের ঝাড়ফুঁক করার নামে পুট্টু সীমার মাকে দু-দুটো থাপ্পড় মেরেছে। এই জন্য নাকি মঞ্জিরার ভূত তাঁকে ছেড়ে আশে-পাশেই লুকিয়ে আছে, সুযোগ পেলে আবার তাঁর বৌদিকে ধরবে। কিন্তু ভূত সত্যি আসবে কি না? সেটা অন্য প্রশ্ন। এখন বাড়িতে ভূতে ভর দেখতে আসা লোকেদের মেলা। সবার সামনেই পুট্টু ওঝাকে কিছু যুক্তিবাদী প্রশ্ন করা যাক।

আমি ওঝাকে জিজ্ঞেস করলাম,"আমার কিছু প্রশ্ন আছে।"

ভূত দেখার মতো চমকে উঠে পুট্টু বাবা পাল্টা প্রশ্ন করলেন,"প্রশ্ন আবার কিসের? নিজের চোখেই তো দেখলে। কিভাবে মঞ্জিরার ভূত সীমার মায়ের ঘাড়ে চেপে ধরেছিল। কিন্তু আমার ঝাড়ফুঁকের ভয়ে ভূত পালিয়ে গেলো।"

হেসে বললাম,"ভূতে ভর দেখার পরেই তো আমার মনে কিছু প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে। আপনি কি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন?"

আমার কথা শুনে হা করে পুট্টু বাবাজি আমার দিকে এমন করে তাকালেন, মনে হলো মঞ্জিরার ভূত আমার ঘাড়ে চেপেছে। মনে হচ্ছে পুট্টু ওঝা আমার সম্পর্কে আগে থেকেই অনেক কিছু শুনে রেখেছেন। যদি আমার সঙ্গে যুক্তিতর্ক করতে যান, তাহলে বাবার সব বুজরুকি ফাঁস হয়ে যাবে।

কিন্তু এটাও প্রশ্ন, আমি যখন প্রথমেই পুট্টুকে ভূতের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন,"নিজের চোখে দেখ ভূতে সত্যি ভর করে কি না। আমি কি করে ঝাড়ফুঁক করি। ঝাড়ফুঁকে কি করে ভূত জব্দ হয়। তারপর যদি কোনও প্রশ্ন থাকে আমাকে বলো। আমি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেবো।"

কিন্তু আমার ধমকের কারণে সীমার মায়ের ভর কেটে যায়। এবং বলে ছিলাম,"ভূতে ভরের মতন মানসিক রুগী কাকীকে চিকিৎসার নামে ঝাড়ফুঁক করা হচ্ছে। রোগীকে মারধর করা হচ্ছে। এটা কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে লেখা আছে যে রুগীকে চিকিৎসার করতে গিয়ে মারধর করতে হবে? ভূতে ভরের মত মানসিক রোগগ্রস্ত রুগীকে মানসিক চাপ থেকে দূরে রাখতে হয়।"

আমার এই কথা ওঝা বাবাজি ভুলে যায়নি। এখন যদি বাড়িতে এসে পুট্টু ওঝা আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চলে যান। তাহলে ওঝার উপর থেকে অন্ধভক্তদের বিশ্বাস হারাতে পারে। এই ভেবে পুট্টু বললেন,"ঠিক আছে। তুমি যা জানাতে চাও তাড়াতাড়ি বলো। আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে।"

মনে-মনে বললাম,"ওঝা হয়তো কোনও ভাবে আমার উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারছে। তাই তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালানোর অজুহাত খুঁজছে।"

এই মাঝে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ঠাকুমা কড়া ভাবে বললেন,"তুই আবার ওঝাজীকে কি জিজ্ঞেস করবি? যা এখান থেকে। বাবাজীর আরও কাজ আছে।"

আমি বললাম,"ধূর। তুমি একটু মুখ বন্ধ করতো দেখি। বাবাজীকে দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করবো।"

ওঝা বললেন,"বলো, তুমি কি জানতে চাও?"

বাড়ির উঠানে দুটো ছেয়ার আনা হলো। আমরা দুজনে মুখোমুখি বসলাম। আমাদের মধ্যে কিকি কথাবার্তা হবে, তা শোনার জন্য ভূতে ভর দেখতে আসা লোকেরা গোল করে দাঁড়ালো।

আমি ওঝা কে জিজ্ঞেস করলাম,"এই যে সীমার মাকে ভূতে ভর করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই ভূত কি করে জন্ম নেয়?"

পুট্টু ওঝা হেঁসে বললেন,"আরে। তুমি এটাও জানো না? কোনও মানুষ মারা গেলে তাঁর আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মা অমর। আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মাকে আগুনে ভস্মীভূত করা যায় না। অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না। জলে ভেজানো যায় না। আত্মা নিরাকার।"

"কিন্তু যখন কোনো মানুষের অকাল মৃত্যু হয়। তখন তাঁর আত্মা মুক্তি পায় না। সেই আত্মা ভূত হয়ে ঘুড়ে বেড়ায়। যেমন মঞ্জিরা। সেই মেয়েটি আত্মহত্যা করলো। তখন তার আত্মা মুক্তি পেলো না। অপঘাতে মৃত্যুর জন্য মঞ্জিরার আত্মা ভূত হয়ে গেলো। এবং সেই অতৃপ্ত আত্মা তাঁর প্রিয়জনের কাছে ফিরে আসে। কখনও সেই অতৃপ্ত আত্মা অর্থাৎ ভূত নিজের খুব কাছের মানুষের ক্ষতি করতে চায়। যেমন সীমার মাকে মঞ্জিরার অতৃপ্ত আত্মা ধরেছে। মঞ্জিরার আত্মা ওনার উপর ভর করেছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম,"আত্মা যদি নিরাকার হয়? তাহলে সেই আত্মা আবার কি করে ভূত রূপ ধারণ করে?"

"মনে হচ্ছে তুমি আমার কথা বুঝবে পারলে না।"ওঝা বললেন।

আমি বললাম,"গীতাতে লেখা আছে, আত্মা পরমাত্মার অংশ। মানুষের মৃত্যুর মুহূর্তেই সেই আত্মা আবার পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, যে আত্মা মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যায়, সেই আত্মা আবার ভূত কি করে হয়?"

"দেখো সন্তোষ। আমি তোমর সঙ্গে বেশি কথা বলতে চাই না।"পুটু বললেন।

আমি হেসে বললাম,"আজ বিজ্ঞান এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে আত্মা অমর নয়। আত্মাও মরণশীল। কোনও মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শরীরে সাথে তাঁর আত্মারও মৃত্যু হয়ে যায়। সোজা কথায় আপনি যদি আত্মহত্যা করেন, তাহলে আপনার আত্মা তাৎক্ষনাৎ মারা যাবে। আপনি আত্মা ভূত হবে না।"

আরও বললাম,"আত্মার অর্থ হলো চিন্তা, চেতনা বা মন। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল হলো চিন্তা, চৈতন্য বা আত্মা। আমাদের শরীরের মৃত্যুর সঙ্গে মস্তিষ্কে ক্রিয়া-বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ মন, চিন্তা বা আত্মার মৃত্যু হয়। এরপর কারও মৃত্যুর পর তাঁর মৃত আত্মার ভূত হয়ে যাবার কোনোও প্রশ্নই ওঠে না।"

আমার কথা শুনে ওঝা আমার দিকে হা করে তাকিয়ে রইলেন। পাশে দাড়িয়ে থাকা আমার দাদু ফকির বললেন, "বাপরে বাপ। এই প্রথম শুনলাম মানুষ মারা গেলে তাঁর আত্মাও মরে যায়। ভূত হও না।"

দাদু জিজ্ঞেস করলে,"তুমি বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে অনেক বইপত্র পড়েছো। একটা কথা বলো দেখি, পুনর্জন্ম কী?"

আমি বললাম,"হিন্দু ধর্ম পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুসলিম ও খ্রিস্ট ধর্মে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না। এখন সব ধর্মের মানুষের মৃত্যু হয়। তাহলে আমি কোন ধর্মের বিশ্বাসকে সত্যি বা মিথ্যে বলবো? আমি যখন বিজ্ঞানের জ্ঞানের ভিত্তিতে বলছি মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মার মৃত্যু হয়ে যায়। তখন পুনর্জন্মের কোনও প্রশ্নই জন্ম নিতে পারে না। পুনর্জন্ম একটা গল্পকথা।"

আমার কথা শুনে দাদু দাঁত বের করে হো হো করে হাসতে লাগলেন।

আমার পুটু ওঝা বললেন,"তাহলে তুমি বলতে চাইছো ভূত নেই? ভূত বলে কিছু হয় না? নিজের চোখেই তো দেখলে মঞ্জিরার ভূত সীমার মাকে ভর করছিল।"

"নানা। মঞ্জিরা কেন, কোনও মানুষই মরলে। আত্মহত্যা করলে, তাঁর আত্মাও মারা যায়। মৃত আত্মা ভূত হতেই পারে না। তাই দাবির সঙ্গে বলছি, সীমার মাকে মঞ্জিরা নামক ভূতে ভর করেনি। ভূতে ভর একটা মানসিক রোগ।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই পুটু জিজ্ঞেস করলেন,"ভূতে ভর আবার কবে থেকে মানসিক রোগ হয়ে গেলো?"

বললাম,"গ্রামেগঞ্জে আজও অনেক মানুষ ভূতে ভরে বিশ্বস করে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ভূতে ভর একটি মানসিক রোগ। সীমার মাকে দেখে মনে হচ্ছিল, ওনাকে বুঝি মঞ্জিরার ভূত ধরেছে। আসলে ওনাকে কোনও ভূতে ধরেনি বা ভর করেনি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ভূতে ভর তিন ধরনের মনের রোগ-হিস্টিরিয়া, স্কিটসোফ্রেনিয়াঃ এবং ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ।"

"সীমার মা শিক্ষার আলো দেখেননি। তিনি ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তিনি এটাও বিশ্বাস কারনে কেউ যদি আত্মহত্যা করে তাহলে সে ভূত হয়ে যায়। সেই ভূত তাঁর প্রিয়জনেই উপর ভর করে। এছাড়া, ওনার মানসিক সহনশীলতায় কম এবং আবেগপ্রবণ।"

"তিনি আগে যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, সেখানে মঞ্জিরা নামক কলেজে ছাত্রীর সঙ্গে বন্ধুর মতো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু হটাৎ মঞ্জিরা কোনও কারনে আত্মাহত্যা করলো। এবং তাকে দড়িতে ঝুলন্ত অবস্থাতে দেখে প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছিলাম। এই ঘটান সীমার মায়ের মানে আঘাত করে। তিনি সব সময় মঞ্জিরার কথাই এক নাগাড়ে ভাবতে থাকতেন। ওনার মনে একটা ভয় লেগে থাকতো এই বুঝি মঞ্জিরা ভূত হয়ে ফিরে আসবে। ওনার উপর ভূত ভার করবে। এই সমস্ত চিন্তার ফলে তিনি তাঁর স্বাভাবিক মানসিকতা অবস্থা হারিয়ে ফেলেন। এক সময় তিন শুনতে পান মঞ্জিরার কথা। নুপুরের ঝুমঝুম শব্দ। শেষে নিজের মানসিক সত্তা হারিয়ে ফেলেন সীমার মা। এবং ভূতে ভরের মতো হিস্টিরিয়া রোগের শিকার হয়ে পড়েন। এই ধরনের মানসিক রোগের মনোচিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণ চিকিৎসা সম্ভব।"

এদিক পুট্টু ওঝা ছেঁয়ার থেকে ওঠার জন্য উসখুস করছেন। আমি বললাম,"ওঝাজী আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করবো না। আমার একটা সোজা প্রশ্নের উত্তর দেবেন?"

ওঝা বলল,"আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। যা বলার, তাড়াতাড়ি বোলো।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম,"আপনি ওঝাগিরী করেন। ভূত তাড়ান। ঝাড়ফুঁক করে ভূতে ভরগ্রস্থ রুগীর চিকিৎসা করেন। ঠাকুরমার কাছে শুনেছি আপনার কাছে আপনার কাছে নাকি ওঝাগিরি বা ঝাড়ফুঁক করার জন্য কোনও লাইসেন্স আছে?"

এই শুনে পুট্টু ওঝা হেঁসে বললেন,"ওঝাগিরি বা ঝাড়ফুঁক করার জন্য লাইসেন্স! সেটা আবার কি? না। আমার কাছে কোনো লাইসেন্স নিয়ে। কিন্তু ভক্তদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য বলে থাকতে পারি।"

আমি বললাম,"ডাক্তার হতে গেলে তাঁকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স (মেডিকেল) পরীক্ষা দিতে হয়। তারপর তাঁকে মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্রের বইপত্র পড়তে হয়। মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করার পর প্রাক্টিসেও করতে হয়। মেডিকেল কাউন্সিল থেকে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নিতে হয়। এতো কিছুর পার সেই ডাক্তারবাবু কোনও মানুষের কোনও ধরনের রোগের চিকিৎসা করতে পারেন। আপনি ভূতে ভরের ঝাড়ফুঁক করে মানসিক রুগীর চিকিৎসা করছেন। কিন্তু এরজন্য আপনার কাছে কোনও ধরনের সার্টিফিকেট নেই?"

আমার কথা শুনে পুট্টু বললেন,"বাপের জন্মে এই তোমার মুখে প্রথম শুনলাম, ওঝাগিরি করতে মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগে। আমাকে কেউ বলেনি ঝাড়ফুঁক করার জন্য লাইসেন্স লাগে। আমি বলছি শুনে রাখো, ওঝাগির করতে কোনও সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স লাগে না। আমার বাবাও যখন ভূতে ভরের ঝাড়ফুঁক করতেন, তখন তাঁর কাছে কোনও ধরনের লাইসেন্স ছিল না। সমাজের লোকেরাই তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি করার সার্টিফিকেট দিয়েছে।"

আমি বললাম,"সীমার মায়ের ঝাড়ফুঁক করার জন্য ধুনুচিতে ধূপধুনো ও লঙ্কা পুড়িয়ে সেটা ওনার মুখের সামনে কেন ধরেছিলেন? কেন সরিষা দানা ওনার গায়ে ছুঁড়ে-ছুড়ে মারছিলেন?"

ওঝা রেগে বললো,"তোমাকে এত কিছু বলা যাবে না।"

তাহলে শুনুন আমি বলছি,"দ্য ড্রাগ এন্ড কসমেটিক অ্যাক্ট, ১৯৪০ অনুসারে কেউ যদি তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, জলপড়া, তেলপড়া, নুনপড়া, লঙ্কা, সরিষা, ছাইভস্ম ইত্যাদি দিয়ে কোনও রোগের চিকিৎসা করে। তাহলে এই ধূপধুনো, লংকা, সরিষা ইত্যাদি ওষুধ রূপে বিবেচিত হবে। ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়া রুগীকে ওষুধ দেওয়া অপরাধ।

এবং রোগীর ক্ষতি হলে আপনার মতন ভূতের ওঝা আইনত অপরাধ করছেন। এরজন্যে ওঝার জেল ও জরিমানা দুটোই হতে পারে।"

আরো শুনুন,"এরপরেও যদি ভূতে ভরের মতন কোন মানসিক রোগের ঝাড়ফুঁক করলে রোগ কমে না। ঝাড়ফুঁকের ফলে মানসিক রোগ আরও বেড়ে যায়। অথবা ঝাড়ফুঁকের নামে মানসিক রুগীকে মারধর করলে তাঁর যদি মৃত্যু হয়। তাহলে সেই ওঝা বা তান্ত্রিকের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।"

ওঝা বললেন,"না না। আমি এত কিছু জানি না। অতো বুঝিনা। লোকে আমার কাছে আছে আসে। তাদের অনুরোধেই আমি শুধু একটু আধটুকু ঝাড়ফুঁক- তাড়ফুঁক করি

ওঝার কথা মাঝে থামিয়ে দিয়ে বললাম,"দ্য ড্রাগস এন্ড ম্যাজিক রেমিডিস অবজেকশনাবল এডভার্টাইজমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৪ এই অনুসারে কেউ যদি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের না করে এবং পুলিশ কোনও ভাবে ভাবে জানতে পারে আপনি আমার বাড়িতে ভূতে ভরের ঝাড়ফুঁক করছেন, তাহলে আপনার ওঝাগিরির জন্য পুলিশ ওয়ারেন্ট ছাড়াই আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে।"

পুলিশের কথা শুনেই পুট্টু ওঝা ভূত দেখার মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞেস করলাম,"দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? বসুন, বসুন। আমি না ডাকলে পুলিশ বাড়িতে আসবে না।"

"দেখো আমারকে পুলিশের ভয়টয় দেখিও না।"পুট্টু বললেন।

আমি বললাম,"এই যে আপনি বলছেন ভূত আছে। মঞ্জিরার ভূত সীমার মায়ের উপর ভর করছে। এই ভূতকে আপনি কি সবার সামনে জ্যান্ত মানুষের মতন দাড় করিয়ে দেখতে পারবেন? যাতে সবাই ভূতের চাক্ষুস দর্শন করতে পারি?"

"তোমার সঙ্গে বেশি কথা বললে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমি চললাম।"এই বলে ওঝা আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আমি প্রবীর ঘোষ এর লেখা বই"অলৌকিক নয়, লৌকিক"পড়েছি। বইতে"ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র তরফ থেকে চ্যালেঞ্জ লেখা আছে, ভূত দেখতে পারলে ২০ লাখ টাকা দেওয়া হবে। আপনি কি চ্যালেঞ্জ নেবেন? মঞ্জিরার জলজ্যান্ত ভূত সবাইকে দেখতে পারবেন?"

পুট্টু ওঝা বললেন,"না। আমি কোনও চ্যালেঞ্জ নিতে রাজি না। আমি ভূত দেখতে পারবো না।"

হেসে বললাম,"এই তো আপনি বলেছেন, সীমার মায়ের উপর মঞ্জিরার ভূতে ভর করছে। ঝাড়ফুঁক করার জন্য ভূত ওনাকে ছেড়ে দিয়ে আসেপাশেই লুকিয়ে আছে। তাহলে ভূতকে মন্ত্রতন্ত্র করে বেঁধে আনুন দেখি।"

"আমার অনেক কাজ আছে। আমি যাই।"এই বললে পুট্টু ওঝা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

মনে হচ্ছে পুট্টু বাবাজি বুঝতে পারছেন আর কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে তর্ক যুদ্ধ করলে ওনার ওঝাগিরর সব বুজরুকি ফাঁস হয়ে যাবে। তার থেকে ভালো মানে-মানে এখান থেকে কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা মজা করে হাসতে শুরু করেছে,"সন্তোষের সামনে পুট্টু বাবাজি কিভাবে জব্দ হয়েছে।"

তাই ওঝা হাতজোড় করে বললেন,"সন্তোষ আমার অনেক কাজ আছে। তোমার যদি আরো কিছু জিজ্ঞাসা থাকে, তাহলে আমার আশ্রমে সময় করে এসো। আমি তোমাকে জ্যান্ত ভূত দেখিয়ে দেবো।"

আমি বললাম,"দেখুন। ভূত বলে কিছু নেই। মঞ্জিরা আত্মহত্যা করার পর তাঁর আত্মা ভূত হয়ে যাই নি। আমি চ্যালেঞ্জ করে স্পষ্ট ভাষায় সব্বাইকে বলতে চাইছি, সীমার মায়ের উপর কোন ভূতে ভর করেনি। ভূতে ভর

একটা মানসিক রোগ। তিনি একজন মানসিক রোগী। মঞ্জিরা নামক কাল্পনিক ভূতে বিশ্বাস করায় জন্য ওনার এই মনোরোগ হয়েছে। মনোরোগ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করলে তিনি পুরুপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমি ওনাকে মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবো। এরপর এই পুট্টু ওঝা যদি আবার সীমার মাকে ভূতে ভরের নাম ঝাড়ফুঁক করেছেন। অথবা তাঁর উপর অত্যাচার করেছেন। তাহলে এমন প্যাদাবো, ওঝার বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো। এরপর আমি থানায় ফোন করে পুলিশ ডাকবো। এবং আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ওঝার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ করে অ্যারেস্ট করিয়ে দেবো।"

পুট্টু ওঝা আমার কথাতে রেগে গিয়ে বললেন,"ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। আমি যদি আগে জানতাম এই বাড়িতে ভূতেভর তাড়াতে এসে সন্তোষ গোলমাল করবে, তাহলে আমি এখানে আসতাম না। তোমার ঠাকুরমা ডেকেছিল বলেই এই বাড়িতে এসেছি।"

এই বলে পুট্টু ওঝা বারান্দা থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তায় হাঁটা লাগলেন।এই দেখে সব্বাই হো হো করে হেসে উঠালাম। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দাদু বললেন,"সন্তোষ তুমি ভালই জব্দ করেছো পুট্টু ওঝা কে। ও আর আমাদের বাড়িতে ভুল করেও আসবে না। ওঝা যেভাবে পালালো, মনে হলো মঞ্জিরার ভূত পুট্টু ওঝার ঘাড়ে ভর করার জন্য ধাওয়া করেছে।"

আমি বললাম,"ভূত তাড়াতে এসে মহা ফাঁদে পড়ল ওঝা"

আমার কথা শুনে আবার সব্বাই একসাথে হোহো করে হেসে উঠলো। দূরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সীমার মাও হাঁসি চেপে রাখতে পারলেন না।

চিনে নিন এই ভন্ডদের

ভবিষ্যত দাবি করা জ্যোতিষীদের একজনও আম্ফান ঝড় থেকে করোনা নিয়ে কোনো ভবিষ্যতবাণী করেনি। এটা ভন্ড, প্রতার। জ্যোতিষশাস্ত্র একটি অপ-বিজ্ঞান। আবারও প্রমনিত হলো 'যে যত বড় জ্যোতিষী সে তত বড় প্রতারক।

ভূতের গুজবকে যুক্তিবাদীদের চ্যালেঞ্জ

সন্তোষ শর্মা

আপনি কি ভুতে বিশ্বাস করেন? কোনও দিন ভূত দেখেছেন? এই প্রশ্নগুলো শুনেই হয়তো অনেকে খ্যাক -খ্যাক করে হেঁসে উঠবেন। কিন্তু এই মানুষগুলোই আবার ভূতের গুজব ছড়াতে দু'কান কাটা। পরিণাম, কোথায় যদি কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে তাহলে তার পেছেন বৈজ্ঞানিক কারণ তদন্ত করার পরিবর্তে গুজব ছাড়তে ব্যাস হয়ে পড়েন। এমন অবস্থায় দায়িত্ববাড়ে যুক্তিবাদীদের।

হটাৎ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরে একটি কলেজে ভূতের গুজব দিন -দুপুরে ছাড়িয়ে পরে। দিনের আলোতেও নাকি কেউ কেউ ভূত দেখছেন! সত্যিই অবাক করার কান্ড -কারখানা। কাল্পনিক ভূতের গুজব ছড়িয়ে যাঁরা বাঁদরামি করছেন, তাদের জব্দ করার একটি মাত্র উপায়'চ্যালেঞ্জ'। অশোকনগর কলেজের ভূতের গুজব বন্ধ করতে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র তরফ থেকে ৫০ লক্ষ্য টাকার চ্যালেঞ্জ জানান হয়। শেষ পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জের মুখে ভূতের গুজবের মৃত্যু হয়। তাই পাঠকের কাছে এই বার্তা দিতে চাই, যদি কোথাও ভূতের গুজব ছড়ায় তাহলে যুক্তিবাদী সমিতি'র চ্যালেঞ্জের কথা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরুন। কথা দিচ্ছি ভূতের গুজবের মৃত্য হবেই।

অশোকনাগার কলেজ ভূত নিয়ে খবর কলকাতা থেকে প্রকাশিত নিউজ পোর্টালে'The Bengal Herald'- এ আমার একটি লেখা পাবলিশ করা হয়। এর পর অন্য একটি নিউজ পোর্টাল'Nayi Awaz'- এ আমার বক্তব্য এবং প্রবীর ঘোষের চ্যালেঞ্জ বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত করা হয়েছে।

সোমবার ২৭ জুলাই ২০২০

অশোকনগর কলেজের ভূত রহস্য। ৫০ লক্ষের চ্যালেঞ্জ ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি র

সন্তোষ শর্মা ● The Bengal Herald

ভূত নিয়ে তর্কের শেষ নেই। ভূত নেই, তবুও তেনারা ঘুরে ফিরে আসে। কখনও গল্পগাঁথায়, কখনও সিনেমা-সিরিয়ালে তো কখনও আবার অন্ধবিশ্বাসীদের আলোচনায়। আমজনতা অন্ধবিশ্বাসকেই বেশি বিশ্বাস করেন। তাই তো লজিক কম, ম্যাজিক বেশি চলে। অর্থাৎ যুক্তির থেকে লোকবিশ্বাস বেশি গ্রহণযোগ্য। তাই তাঁরা ভুতুড়ে গুজবের পেছনে যুক্তিযুক্ত কারণ অনুসন্ধান করার পরিবর্তে গুজবকে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হন। আর আমজনতা (যাঁদের ভেতরে উচ্চশিক্ষিত অনেকে) যুক্তি-বুদ্ধিকে সব বাক্সবন্দী করে গুজবে বেশি আস্থা রাখেন। ভৌতিক গুজব ছড়িয়ে পড়লে কিন্তু দায়িত্ব বাড়ে যুক্তিবাদীদের।

গত কয়েকদিন ধরে এমনই একটি ভৌতিক গুজবের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পরে। ঘটনাটা উত্তর ২৪ পরগণা'র অশোকনগর-এর জে.এন.পি. কলেজের। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবী রাত ক্রমশ গভীর হলে না-কি হোস্টেল থেকে একজন মহিলার আর্তনাদ ভেসে আসছে। সঙ্গে গোঙানির আওয়াজ। দিনের বেলায় সেখানে গেলেও না-কি গায়ে কাঁটা দিচ্ছে অনেকের। মিডিয়ার মাধ্যমে খবরটা এখন আমজনতার হেঁসেল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে এই কোরোনা আবহেও।

ভূত,-প্রেতের এই অন্ধবিশ্বাসের পথে বাঁধ সেধেছেন মুক্তমনা, যুক্তিবাদীরা। তাঁদের স্পষ্ট দাবী, এইসব ভূত-প্রেত সব গপ্পো এবং মানুষের মনের ভ্রম। অলীক কল্পনা এগুলো,যার বাস্তবে কোনও প্রমাণই নেই। কারণ বিজ্ঞান কোনও আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকারই করেনা। বিজ্ঞানের দরবারে কোনও কিছু তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সেটা বিজ্ঞানের পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত এই তিন সহজ-সরল ধাপে উপনিত হয়। কোনও ঘটনা দেখে যদি মনে হয় সন্দেহজনক কিছু রয়েছে তাই বলা হয় হাইপোথিসিস। আত্মা নামক বিষয়টা এখনও পর্যন্ত হাইপোথিসিসে পর্যন্ত পা রাখতে পারেনি, বাকি তিন ধাপ তো দুরের কথা। এখনও পর্যন্ত এমন কিছু ঘটনা ঘটেনি যা ইঙ্গিত করে অলৌকিক কিংবা আত্মার অস্তিত্বকে। আত্মার কোনও কার্যকলাপ এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করতেই পারেনি। তাই আত্মা, অলৌকিক ইত্যাদি সবটাই শুধুমাত্র মনোজগতের কল্পনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

অশোকনগর'এর ঘটনায় পেশায় ম্যাজিশিয়ান অভিষেক দে'-এর স্পষ্ট কথা, ' আমরা ম্যাজিক দেখানোর আগে একটা ম্যাজিকাল হিপনোটাইজ পাবিবেশ তৈরি করি। ঠিক একই ভাবে কিছু কিছু মানুষ কোনও অসৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ভূতের গুজব ছড়াতে থাকে। এরপর শুধু মাত্র কানে শোনা কথা শুনেই আম জনগণ সেই গুজবকে আরও বেশি বেশি করে ছড়িয়ে দিতে থাকে। পরিণাম, ওই সুযোগসন্ধানী লোকেদের ভুতুড়ে গুজব ছড়ানোর পেছনের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়।

এদিকে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী মানুষের দাবী, ওই কলেজে রাতের অন্ধকারে নির্ঘাৎ হানা দিচ্ছে কোনো জ্যান্ত ভূত। হয়তো রাতের অন্ধকারে সেখানে কোনও অসামাজিক কাজকর্মকে আড়াল করতেই ভূতের গল্প ফাঁদা হয়েছে। প্রকৃত সত্যানুসন্ধানে এই রহস্য ফাঁস হবে। অনেকেই আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে প্রেতচক্র বা প্ল্যানচেট এর উদাহরণ টেনে আনেন। সম্প্রতি অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত'-এর আত্মার সাথে কথা বলেছেন বলে দাবী করায় স্টিভ হাফ'এর কয়েকটা ভিডিও ভাইরাল ইতিমধ্যে। অথচ আত্মার অস্তিত্বই যেখানে নেই, সেখানে প্ল্যানচেটে আত্মাকে ডেকে আনাটা অন্ধবিশ্বাসীদের খাওয়ানোর জন্য আদর্শ এবং বিড়াট মাপের ধাপ্পা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সভাপতি এবং বিশিষ্ট লেখক, প্রবীর ঘোষ এর খোলা চ্যালেঞ্জ, কোনো ব্যাক্তি বিনা কৌশলে কিংবা প্রতারণা ছাড়া যদি প্ল্যানচেটে আত্মাকে আনা অথবা ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হন, তাহলে প্রবীরবাবু সেই ব্যাক্তিকে দেবেন ভারতীয় মুদ্রায় ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার। গভীর দুঃখের সাথে জানাই, আজ পর্যন্ত কেউই প্রবীরবাবু'র এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস দেখান-নি। যারাই চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন তাঁদেরই বুজরুকি ফাঁস হয়েছে।

তাই আশকনগর'এর সাধারণ মানুষের কাছে একটি অনুরোধ আপনারা যদি প্রমাণ করে দেন ওই কলেজ ভূত আছে তাহলে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। যুক্তিবাদীদের দাবি, ভূত কলেজে নেই। কোথাও যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা আছে মানুষের মনের কোণে। সেখানে বিজ্ঞান এবং যুক্তির আলো পৌঁছেলেই ভূত শেষ হয়ে যাবে। তাই কলেজে ভূত না খুঁজে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনার মনের কোণে ভূত কোথা থেকে বাসা বেঁধেছে।

আসলে ভূত থাকে আমাদের মনের অন্ধকার জগতে। সেখানে জ্ঞানের আলো জ্বলালেই তেনারা ভ্যানিশ।

বরুন স্মরণে

শুভায়ূ রুডান

বরুন বিশ্বাস, স্মৃতির ভিরে কিছুটা আবছা হয়েছো,
হৃদয়ে খোদাই করা নামের ওপর বহুদিনের জমে থাকা ধূলো,
জমে থাকা দাগ, চোখে পরলো আজ, বহুদিন পর,
মনে পড়লো আবার তোমার কথা,
মনে পড়লো অনেক জমানো রাগ, অভিমান, অভিযোগ।
প্রাণপণে সরালাম সে ধূলো, তোমার হাসিমুখটা উঁকি দিলো যেন,
না সরাসরি চেনা হয়নি তোমাকে,
খবরের পাতায় অথবা চলমান নিউজেই আমাদের পরিচয়,
তাও তোমার কন্ঠ কে চিরতরে বন্ধ করার পর।
তোমার প্রতিবাদী দিনগুলোতে তোমাকে চেনা হয়নি,
কে জানে হয়তো চেনানো হয়নি।
তারপর ইছামতি দিয়ে কত জল বয়ে গেছে,
তোমাকে নিয়ে সিনেমা হয়েছে, কোথাও তোমার মুর্তি হয়েছে,
রাজনৈতিক কত পরিবর্তন হয়েছে,
শুধু বিচারটা বাদ দিয়ে সব কিছুই হয়েছে,
আর বন্ধ হয়নি সে সব কিছুই, যেগুলি তুমি বন্ধ করতে চাইতে।
বন্ধ হয়নি কারন তোমার দেখানো রাস্তায় জীবিতরা যেতে চায়নি,
বন্ধ হয়নি কারন প্রতিবাদ করার থেকে না করার পুরস্কার অনেক দামি,
বন্ধ হয়নি কারন তোমার পরিনতিটা সবার জানা,
বন্ধ হয়নি কারন জলে থেকে কুমিরের সাথে লড়াই করা মানা।
রাজনীতির সেকালে যা যা হতো, একালেও সব তেমনি আছে,
তবে বরুনদের সংখ্যাটা অনেক কমেছে।
শাস্তি যাদের সেকালে হয়নি,
একালেও তারা বহাল তবিয়তে,
সেকালেও আমরা যেমন ভুলতাম,
একালেও তেমনি সবটাই ভুলি।
ভুলি বলেই, তোমার নামের ওপর ধুলো জমে,
আবছা হয় তোমার মুখ,
প্রতিবাদ গুলো একা হয়ে যায়
আবছা হতে হতে অদৃশ্য হয় তোমার মুখ।।

সাম্যবাদী

-রাখি হোমস

পুঁজির শাসনে রাজার আসনে -
কে তুমি ধনী আসিন,
জেনে রাখো তবে শ্রমিকেরা সবে -
আবার হবে তো স্বাধীন।
রক্তশ্রম নিচ্ছো নিংড়ে -
ফুলছে তোমার পুঁজি,
শ্রমিক রক্তে খেলে হোলি আজ -
আনন্দ পাও যে খুঁজি।
দিনে দিনে দিন তুই প্রতিদিন -
প্রাপ্যের করিস চুরি,
শোষণ শাসনে হয়ে একাকার -
মেলা ভার তোর জুড়ি।
নারীকে ভেবে নরকের দ্বার -
মানবতার করিস অপমান,
জেনে রাখ তবে নারীরা সবে -
কাড়বে দেখিস তোদের প্রাণ।
বেকার বাহিনী উঠবেই জেগে -
নব সাম্যের গানে,
মুখরিত হবে রাজপথে সবে -
প্রতিবাদ মিছিল স্লোগানে।
ফসলের দাম না পাওয়া চাষী -
না মরে আর তিলে তিলে,
এসোনা গড়ি নয়া প্রতিরোধ -
রাজপথ ভরুক মিছিলে।
শ্রমিকের মনে আসছে ফাগুনে -
ধরাতে আসছি আগুন,
বধির জগৎ উঠবে কেঁপে -
মন দিয়ে তবে শুন।

ধর্ম আফিমে মদের বোতলে -
মানুষে রেখেছো বন্দি,
বিদ্রোহ আগুনে খুলবো সে দ্বার -
খাটবেনা কোন ফন্দি।
তিল তিল করে তুলছি গড়ে -
সব হারাদের ওই দল,
শৃঙ্খলাটাই যেন শক্তি মোদের -
ফোটাবই মোরা নব শতদল।
নতুন দিন আনবার তরে -
যুদ্ধেরই করি আয়োজন,
যৌবন তুমি নিশ্চুপ কেন?
তোমাকেই আজ প্রয়োজন।
ভাঙি মন্দির, ভাঙি মসজিদ -
গীর্জায় লাগাই আগুন,
মুক্তি মন্ত্রে শপথ নিয়ে -
মানব ধর্মে আনবো ফাগুন।
আল্লাহকে আজ পাঠিয়ে কবরে -
ফেরাউনের করি খবর,
রামের চিতায় জ্বালিয়ে আগুন -
রাবনে করেছি অমর।
তুলবোই ঝড় সমাজ বুকেতে -
জেনে রাখ ধনী তুমি,
পৃথিবীটা আবার হবে তো এক -
মানুষ বাসযোগ্য ভূমি।
যতদিন মানুষ বুঝবে নাকো -
পুঁজিবাদেই তব বরবাদি,
ততদিন যেন থাকবো তবে -
আমি সাম্যবাদী।

Long live revolution.

‘স্বাধীন’এবং’স্বাধীনতা'

রাজা দেবরায়

'স্বাধীন’মানে স্ব-অধীন অর্থাৎ যে শুধুমাত্র নিজের অধীন। এছাড়াও’স্বাধীন’মানে অপরের আজ্ঞাবহ নয়, অবাধ, স্বচ্ছন্দ, অনন্যপর, স্ববশ, স্বনির্ভর বা অন্য কারো ওপর নির্ভরশীল নয়। আভিধানিক অর্থে তাই অনেকেই’স্বাধীন'! কিন্তু আদৌ কি আমরা’স্বাধীন'?

আমরা কি নিজেদের নিজের অধীনে রাখতে পারি বা পারছি? আমাদের মানসিক গঠন কি সেভাবে তৈরী হয়েছে যে আমরা নিজেদের নিজের অধীনে রাখতে পারবো? আমাদের ভাবনার যে ভীত বা’বেস’যদি বলি সেটা কি আদৌ শক্ত হয়েছে?

আমরা কী চিন্তা করবো বা কিভাবে চিন্তা করবো সেটাই তো আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুঝতে পারিনা। তাহলে তার মানে কি আমরা চিন্তা করিনা বা করতে পারিনা? অবশ্যই চিন্তা করি বা করতে পারি। কিন্তু সেই চিন্তা করার বা চিন্তা করতে পারার ক্রেডিট যায় অথবা যাবে রাষ্ট্র, পারিপার্শ্বিক সামাজিক দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত খবর ও বিজ্ঞাপনের দিকে! তাদের সমষ্টিগত ভাবনাটাকেই নিজের ভাবনা বলে চালাতে চেষ্টা করি এবং না বুঝেই তাতে বেশ আত্মগরিমায় ভুগি। অর্থাৎ সহজভাবে আসল কথাটা বললে, সেরকমভাবে মুক্ত চিন্তা করার অভ্যাস বা পরিকাঠামো এখনো গড়ে ওঠেনি আমাদের মননে, চিন্তনে। ফলে নিজের ভাবনার অধীনে থাকাটাও কেমন যেন দাসত্বের বা পরাধীনতার যন্ত্রণাকেই সূচিত করে, যদিও আমরা খুব একটা বুঝতে পারিনা সেটা! আর বুঝতে পারিনা বলেই আমরা মননে, চিন্তনে এখনো’পরাধীন’হয়ে আছি যা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার!

আরেকটু ব্যাখ্যা করলে এভাবেও বলা যায় যে নিজের অধীনে থাকা সার্বিকভাবে খুবই কঠিন। কাম, ক্রোধ, লোভ, লালসা অতিক্রম করে সঠিক অবস্থানে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করা দুরূহ ব্যাপার। ফলে সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখাটাই যেখানে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেখানে নিজের’স্বাধীন’মত বা পথ ব্যক্ত করতে পারাটা তো কঠিন হবেই।

তাই আমাদের’স্বাধীন’কথাটাই বুঝতে অসুবিধে হয় বা হচ্ছে।

আর স্বাভাবিকভাবেই,’স্বাধীনতা’কথাটা বুঝতে আরেকটু অসুবিধে হবে।’স্বাধীনতা’শব্দটি ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতীয় জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বজন কাঙ্ক্ষিত একটি শব্দ।’স্বাধীনতা’হতে হবে সার্বিক।

সহজভাবে বললে, যে দেশ তার জনগণকে যত বেশি সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার প্রদান করে, সে দেশ তত বেশি উন্নত, সুন্দর এবং জনকল্যাণকামী সভ্য দেশ। আবার যে দেশের জনগণ তাদের নাগরিক এবং সামাজিক দায়িত্ব যত বেশি সুষ্ঠু এবং যথাযথভাবে পালন করে সে অনুযায়ী তাদেরকে সমাজের আদর্শ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়। এভাবে সুষ্ঠু সামাজিক ব্যবস্থা, উন্নত সুশীল নাগরিক জীবনের জন্য সমাজ এবং সমাজের প্রত্যেকের পারস্পরিক সহযোগিতা-সহমর্মিতা অথবা পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রত্যেক নাগরিকের একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আদর্শ নাগরিক এবং সমাজ গঠনের জন্য বর্তমান সার্বিক পরিকাঠামো কি সন্তোষজনক? যেখানে আমাদের ভাবনার কাঠামোতেই সংশয় প্রকাশ বিদ্যমান, সেখানে’স্বাধীন’এবং’স্বাধীনতা'র মানে বোঝাতে গেলে

মূলত অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। আর ভাবনাচর্চার ভিত্তি গড়ার জন্য প্রি-প্রাইমারি এবং প্রাইমারি স্তরের সিলেবাসে বা পড়াশোনায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করতে হবে। রেশনিং ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে আরো শক্তিশালী করতে হবে এবং সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের জোগান রেশনিংয়ের মাধ্যমে সুষম বন্টন করতে হবে। প্রতিটি পরিবারের জন্য ঘর বরাদ্দ মৌলিক অধিকারের মধ্যে রাখতে হবে। কৃষিকাজকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খুব বেশি শক্তিশালী করতে হবে। প্রতিটি পরিবারের অন্ততপক্ষে একজন সদস্যের কাজ করার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

তবেই তো আমাদের দেশ সার্বিক দিক দিয়ে সুশিক্ষিত এবং সুনাগরিক তৈরি করতে পারবে।'স্বাধীন'এবং'স্বাধীনতা'র প্রকৃত অর্থও তখন বোঝা এবং বোঝানো অধিকতর সহজ হবে এবং আমাদের দেশও তখন প্রকৃত অর্থে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।।

ঈশ্বরের জন্ম যে মানুষের মনের ভয় থেকেই হয়,তা আবারও প্রমাণ করল দিকে দিকে করোনা পূজার নামে ঘটেযাওয়া বিভিন্ন ঘটনা।

তাই তো আমরা বলি,- **'ঈশ্বর সর্বকালের সেরা গুজব'**

তাজা রক্তের দাগ

জামাল আনসারী

ছত্তিসগড়ের গহন অরণ্যে ডুব দিয়ে,
চোখ বন্ধ করলেই তুমি শুনতে পাবে
সুকমায়,--অরণ্যবাসী আদিবাসী যুবতির
বুকফাটা ক্রন্দনের তীব্র আর্তনাদ।
চোখের সামনে ভেসে ওঠে পৈশাচিক ধর্ষণের উল্লাস!
বাতাসে লেগে আছে ঘাম ঝরানো তাজা রক্তের সেই দাগ।
ভূমিপুত্র, আদিবাসীদের নায্য অধিকার?
সে তো বহু যুগ আগের কথা বন্ধু!
সেই অধিকার,এখন দুর্নীতিবাজ নেতাদের বুটের নীচে।
বন্ধু, তুমি কি ডুব দিতে চাও সেই গহন অরণ্যে?
তবে এক্ষুনি চলে এসো,------
একবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে,
দেখে যাও-- আমার সেই দণ্ডকারণ্য।

এখানে ভারী বুটের শব্দ,আর বারুদের গন্ধে ঘুম ভাঙে।
বন্দুকের গুলির শব্দে একে একে মুছে যায়,
অগুনতি নিরপরাধ পবিত্র সিঁথির সিঁদুর।
মিথ্যে ইতিহাসে চাপা পড়ে,মরচে ধরে
আদিবাসীদের সেই সব অলিখিত ইতিহাস।
"সালওয়া জুড়ুম”আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সাঁড়াশি চাপে
খেতে খাওয়া মানুষের জীবন বড়ই নিরুপায়.....
খুন,ধর্ষণ, আর অবাধ লুটপাটের বিচরনভূমি,
বসন্তহীন দণ্ডকারণ্য, যেন নিস্তব্ধ শ্মশানঘাট।

স্বাধীনতা, তুমি আসবে বলে..
-সৌমেশ পাল

"স্বাধীনতা”শব্দটি খুব জনপ্রিয় একটি শব্দ, একই সঙ্গে শব্দটি শ্রুতিমধুরও। শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক আনন্দের পূর্বাভাস, এক মুক্তির আনন্দ। পরনির্ভরতা থেকে মুক্তি, আত্মনির্ভরতা উপার্জন। পরবন্ধন থেকে মুক্তি, আত্মবন্ধনে থাকা। স্বাধীনতা মানে নিজের থেকেও মুক্তি নয়, নিজের অধীন হয়ে পড়া। একটা সীমাবদ্ধতা স্বাধীনতারও আছে, নিজের কাছেই এই সীমাবদ্ধতা। স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারীতা নয়, মাত্রাতিরিক্ত স্বেচ্ছাচার ভালো নয়। এর ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা আসে। কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, একটি জাতির স্বাধীনতা, একটি ভূখন্ড বা দেশের স্বাধীনতা ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। যখন কোন জাতি গোষ্ঠী নিজেদের স্বতন্ত্রতা হারিয়ে ফেলে, অন্য কোন গোষ্ঠীর কারণে; তখন সেই জাতি হয় নির্যাতিত। তাকে যে নির্যাতন করে সেই জাতির আচরণ হয় প্রভুর মতো। বাইবেলে রাজা শলোমন বলেছেন,”একজন অন্যজনের উপর অমঙ্গল করার জন্য কর্তৃত্ব করে।”এই অমানবিক অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির নাম -- স্বাধীনতা।

পাশাপাশি বহিরাগত কোন জাতি যখন কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূখন্ড দখল করে, তখন ওই ভূখন্ডের মানুষজন তারা তাদের প্রাপ্য বিষয়বস্তু থেকে বঞ্চিত হয়। সেই বঞ্চিত, নিপীড়িত জাতি কোন দৃঢ় নেতৃত্বদানকারী নেতার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধভাবে অবিচারের বিরুদ্ধে, শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। শুরু হয় সংগ্রাম, তারা ধরে নেন এই সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। তারা এক নতুন দেশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এমন এক দেশ তৈরি হবে, যেখানে সবাই স্বাধীন হবে, যেখানে শাসকের রক্তচক্ষু থাকবে না, যেখানে শোষণ থাকবে না, তাদের উপর যখন তখন নেমে আসবে না অত্যাচারী শাসকের খড়্গকৃপান। তৈরি হবে স্বরাজ, অর্থাৎ নিজেদের রাজ্য। স্বরাজ অর্জনের পথ হলো সংগ্রাম, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

কিন্তু বহিরাগত জাতিকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেই স্বাধীনতা অর্জন করা যায় কি? বহিরাগত শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে দেশের কয়েকজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিয়েই দেশের সকল মানুষ কি স্বাধীনতা লাভ করে? নাকি সেখানেও নেমে আসতে পারে নির্যাতন, শাসক যেখানে বদল হলেও শোষণের মাত্রার কোনো বদল হয় না। পৃথিবীর কয়েকটি জায়গার বা ভূখন্ডের ইতিহাস কি দেখিয়েছে এ ব্যাপারে! দেখা গিয়েছে, স্বাধীন দেশে(কাগজেকলমে স্বাধীন) বাস করেও সকল মানুষ স্বাধীন নাও হতে পারেন। বহিরাগত শাসক চলে গেছে এবং দেশীয় শাসক শাসকের ভূমিকায় স্বমুর্তি ধরেছে। সেখানে খর্ব হয়েছে মানুষের বাক স্বাধীনতা, বিভক্ত হয়েছে শ্রেণীভিত্তিক সমাজে, যেখানে কেউ উচ্চশ্রেণী এবং কেউ নিম্নশ্রেণী, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপক দুর্নীতি, অল্পকয়েকজন মানুষ হয়ে উঠেছেন অগাধ সম্পত্তির মালিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে বহুগুন, শাসকের বিরুদ্ধে কথা বললেই নেমে এসেছে নিপীড়ন।

তখন সেই পূর্বে সংগ্রামকারী জনতা হয় আশাহত। আক্ষেপ করেন, এই দেশ দেখার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়নি। বাস্তব অবস্থা দেখিয়ে দিল -- রাজা যায়, রাজা আসে। শোষণ চলছে, চলবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এবং সমাজবিজ্ঞানে ”কল্যানব্রতী রাষ্ট্র” বা Welfare State বলে একটি বিষয় আছে। এই কল্যানব্রতী রাষ্ট্রের ধারণায় বলা হয়, একটি আদর্শ রাষ্ট্র এমনভাবে সরকারদ্বারা পরিচালিত হবে যেখানে প্রতিটি নাগরিকের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কল্যানমূলক ব্যবস্থা থাকবে। যেখানে থাকবে সকলের জন্য সমান সুযোগ, সম্পদের সমহারে বন্টন এবং সব নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের কিছু দায়িত্ব থাকবে।

আধুনিক কল্যানব্রতী রাষ্ট্রব্যবস্থা কে সমাজতত্ত্ববিদ টি এইচ মার্শাল বলেছেন, এটি কল্যানব্রত, গনতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের এক স্বাতন্ত্রসূচক মিশ্রন। কল্যানব্রতী রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কিছু কর্মকান্ড রয়েছে। এই রাষ্ট্রের মানুষজন একটি উন্নততর জীবনযাপন করবে। মূলত শিশুদের উপর দৃষ্টিপাত করে এই ব্যবস্থা, প্রতিটি শিশুর অভিভাবক যেন তাদের খাদ্য, পোশাক সহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।

নিয়ন্ত্রনাত্বক কার্যপ্রনালীর মধ্যে আছে, আইন, শান্তস্থাপন, অসামাজিক বিষয়ের নির্মুলীয়করন ইত্যাদি। এই রাষ্ট্রের কিছু প্রোটেকটিভ দিক আছে, সেখানেও আছে আইনকে ব্যবহার করা, অন্তর্বর্তী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসা, বানিজ্য, বাজার এইসব কিছুই এই কার্যপ্রনালীর মধ্যে পড়ে।

আবার কল্যানমূলক কার্যের মধ্যে আছে-- ছড়িয়ে পড়া ব্যাধী কে নির্মুলের ব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, জাতীয় আয়ের বন্টন সুপরিকল্পিতভাবে, যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য কাজের সুযোগ করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

যেখানে মানুষের অধিকার খর্ব হয়, শিক্ষা- স্বাস্থসহ বিভিন্ন পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে, ব্যবসাবানিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন সেই রাষ্ট্র নিজের কল্যানব্রতী অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি এটাই বুঝতে হয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে আমরা লক্ষ্য করছি ভয়াবহ প্রতিযোগীতা, পরীক্ষায় কত বেশি নম্বর পাওয়া যায় সেই প্রতিযোগীতা। যেখানে জ্ঞান অর্জনের থেকেও যেভাবেই হোক, স্কোর অর্জন অগ্রাধিকার পায়, সেখানে নিঃসন্দেহে শিক্ষার মান কমে যায়। তবে এই প্রতিযোগীতার ফলজনক মান হ্রাস আজ থেকেই যে শুরু হয়েছে, তা নয়। এর সূচনা হয়েছে দেশ স্বাধীন হবার আগেই। এটি সেইসময় বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই”শিক্ষার হেরফের”প্রবন্ধে বলেছিলেন--”শিক্ষার সঙ্গে স্বাধীন পাঠ না মিশলে ছেলে মানুষ হতে পারে না, যৌবনেও সে বালক থেকে যায়।”ভীষণ আক্ষেপ করে তিনি বলেছিলেন,”ছাত্ররা এখন সংগ্রহ করে, কিন্তু নির্মাণ করে না।”

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যুগের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকা মানুষ। শিক্ষার অবক্ষয় তার চোখ এড়িয়ে যায়নি। আজ স্বাধীন দেশে শিক্ষাব্যবস্থা দেখলে তিনি কি বলতেন! দেশকে নিয়ে অনেক লেখা তিনি লিখেছেন। বাল্য বয়সেই দেশের জন্য অনেক ভেবেছেন তিনি। তাই যেসময়ে ঈশ্বর গুপ্তের মতো তৎকালীন বড় মাপের কবি মহারানী ভিক্টোরিয়ার জয়গান গেয়ে কবিতা লিখেছেন, সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ গর্জে উঠে লিখেছেন--”তোমারে শুধাই হিমালয় গিরি,/ ভারতে আজি কি সুখের দিন?/তবে এইসব দাসের দাসেরা, কীসের হরষে গাইছে গান/ ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা,/ যে গায় সে গাক, আমরা গাব না/ আমরা গাব না হরষে গান/ এসো গো আমরা যে ক'জন আছি/ আমরা ধরিব আরেক তান"।

১৮৭৪ সালে এটি লেখা, কবির বয়স তখন ১৩ বছর।

শিক্ষা হলো আলো। শিক্ষা মানুষের চিন্তাভাবনা কে পরিপক্কতা দান করে। শিক্ষার সমার্থক শব্দ হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি”বিদ্যা”শব্দটি। সংস্কৃত”বিদ্”ধাতু থেকে বিদ্যা শব্দটি এসেছে, এর অর্থ হলো”কিছু জানা বা জ্ঞান অর্জন করা"। শিক্ষাবিদ জন ডিউই বলেছেন, জীবনে উন্নতির প্রক্রিয়া হলো শিক্ষা। একটি জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথ। শিক্ষা চিনিয়ে দেয় কোনটি ভুল, কোনটি ঠিক, যদি প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষার্থী। মুক্তচিন্তা হওয়া উচিত শিক্ষার অঙ্গ। যুক্তভিত্তিক চিন্তা কুসংস্কার চিনিয়ে দেয়, চতুর্দিকে ঘটে যাওয়া ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। কুসংস্কার হলো অন্ধতা যেখানে যুক্তিবিদ্যার অভাব থাকে। শাসকের অস্ত্র হিসেবে কুসংস্কারের রমরমা বাজার হয়। বিশাল সংখ্যক জনতা সেই ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের উপর ঘটে যাওয়া নির্যাতনের কারণ বুঝতে পারে না, ফলে শাসকের অন্যায়ের প্রতি তাদের কোন অভিযোগ থাকে না। তখন স্বাধীন দেশে থেকেও কেন পরাধীনতার মতো অত্যাচার, শোষণ চলে, সেটা বোঝার ক্ষমতা থাকে না।

উপনিষদ বলে”সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে”অর্থাৎ শিক্ষা মানুষকে সংস্কার মুক্ত করে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে শিক্ষা শিক্ষার্থীর সামর্থ অনুযায়ী দেহ মনের সার্বিক বিকাশ ঘটায়।

মানুষের মধ্যেকার সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রবাহকে ধরে রাখার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন।

আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে মণীষী রুশো খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আছেন। রাষ্ট্রনীতি, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা সবক্ষেত্রেই রুশো পরিবর্তন আনার চেস্টা করেন। নেপোলিয়ান ও স্বীকার করেছিলেন, রুশোর আবির্ভাব না ঘটলে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হত না। রুশোর চিন্তাধারা শিক্ষানীতিকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে রুশোর জীবনদর্শন ও সমাজদর্শন হলো”প্রকৃতিবাদ”বা Naturalism। রুশো বলেছিলেন,”মানুষ স্বাধীন ভাবেই জন্মায় কিন্তু মানুষের সমাজ পরবর্তীকালে তাকে আবদ্ধ করে দেয়(Man is born free, and everywhere he is on chains.)। স্বাধীন মানুষ হচ্ছে প্রাকৃতিক মানুষ যে নিজের স্বাভাবিক নিয়মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তার Emile গ্রন্থে তিনি বলেছেন, প্রকৃতির মধ্য থেকে যা কিছু আসে, সেগুলো সবই ভালো; কিন্তু মানুষের হাতে এলেই সেইগুলির অবক্ষয় হয়(Everything is good as it leaves the hands of nature; everything degenerates in the hands of the man.)। প্রথাগত শিক্ষার যে আদ্ধাত্মিক, বৃত্তিমূলক লক্ষগুলি ছিল বা আছে, তার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন রুশো। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়র মধ্য দিয়ে যে উপলব্ধি বা জ্ঞান অর্জিত হয়, তিনিই সেইদিকেরই পক্ষপাতী ছিলেন।

দার্শনিক চিন্তাধারায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাববাদী, উপনিষদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন সর্বত্র পরিব্যপ্ত ব্রহ্ম শক্তিতে। তার শিক্ষাদর্শন এই জীবনদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রয়োগের সময় প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। তিনি বলেছেন,”তাকেই বলি শ্রেষ্ঠশিক্ষা, যা কেবল তথ্যপরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।”তার মতে শিক্ষাকে কেবলমাত্র জ্ঞানার্জনে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না, বিশ্বচেতনাবোধকেও শিক্ষার উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলতে হবে, যুক্তিবাদীরা ভাববাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী নন।

গনতন্ত্র হলো এক আদর্শ, এতেও আছে শিক্ষা-- গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, দার্শনিক রাধাকৃষ্ণাণ গণতন্ত্রকে জীবনযাপনের ধারা মনে করতেন।

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ থাকবে। বিভিন্ন জনের পেশাগত ভেদাভেদ থাকলেও সবাই সমাজের অংশ। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্বতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হবে। কাউকে বড় করে বা ছোট করে দেখা হয় না। এখানে প্রত্যেকের থাকবে সমান অধিকার। থাকবে, সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি। স্বাধীনতা আছে রুচি, অভ্যাস, আগ্রহ অনুযায়ী কাজ করার।
তত্বগতভাবে তো অনেক কিছুই বলা যায়, কিন্তু বাস্তবে তত্ত্বের প্রয়োগ কতটা হয় বা হওয়া সম্ভব, সেটাই দেখার। উন্নততর জীবন কি এসেছে! গণতান্ত্রিক দেশের মূলনীতিগুলি অনুযায়ী এসেছে কি সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা! স্বাধীনতা, সেই সুন্দর শব্দ, বাস্তবে তার প্রয়োগ এলো নাকি এলো না! যদি এসে থাকে তাহলে তার সুযোগসুবিধা গুলো নিতে থাকি। যদি না এসে থাকে, তাহলে অপেক্ষা করি। সকল মানুষ স্বাধীন হোক সেই দিনে।

বিজ্ঞানঃ তুমি কি পথ হারাইয়াছো

-মানস কুমার রায়

15ই আগস্ট ২০২০, ভারত তথা বাংলার দীর্ঘ ৭৩ বছরের স্বাধীনোত্তর প্রেক্ষাপটে কোন জায়গায় অবস্থান করছে, তার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা যাক প্রথমেই। কতকগুলি অতি সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। কোভিড-১৯ রুখতে কপালে করলার গুঁড়ো মাখতে মাখতে, থালা বাজাতে-বাজাতে, পাপড় ভাজা খেতে খেতে, অকাল দীপাবলি করে করোনাকে পাশবালিশ করে বড্ড ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। আলেকজান্ডার বহু পূর্বেই বলেছিলেন - সত্য সেলুকাস! বড়ই বিচিত্র এই দেশ। সত্যিই বিচিত্র দেশ আমাদের প্রিয় এই ভারত। আজ আমরা মঙ্গলে যান পাঠাচ্ছি, আবার করোনার হাত থেকে বাঁচতে কপালে করলার গুঁড়ো মাখছি। এতটা বৈপরীত্যের সন্ধানে নেমে সন্দেহ জাগে বিজ্ঞান কি শুধুমাত্র পাঠ্য হয়ে রয়ে গেল? আমাদের প্রাত্যাহিক ব্যবহারিক জীবনে এর কোনো প্রভাব কি পড়লো না? বিজ্ঞান কি এক পাও এগোতে পারল না? সম্প্রতি ঘটা করে নতুন শিক্ষানীতি চালু করা হলো। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসারে সেরকম কোনো রুপালি রেখার দেখা নেই এতে। যদিও এই মুহূর্তে শিক্ষানীতির পরিবর্তে স্বাস্থ্যনীতির প্রণয়ন করাটা অত্যন্ত জরুরি ছিল। যাইহোক, কোনো বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বরং দেখা যাক গন্ডগোল টা ঠিক কোথায়। তাহলে গোড়াতেই গন্ডগোল হয়ে আছে। যাই কারণ থাকুক না কেন

একবার ফ্ল্যাশব্যাক করে দেখা যাক। কি ছিল আর কি হইয়াছে। স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা সীমিত করে সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই শুরু করা যাক। বৈজ্ঞানিক তৎপরতার দিক থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না।তবে বিজ্ঞান চর্চা যে একদমই হতো না সে কথাও কিন্তু বলা যাবে না। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশের অনেকটা জায়গা নিয়ে বাংলা সেই বুদ্ধের আমল থেকে নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী, জনাদ্দল বিশ্ববিদ্যালয়, বহু সংঘ, টোল, মাদ্রাসা ইত্যাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কে কেন্দ্র করে বিজ্ঞান চর্চার একটা বাতাবরণ ছিল। পর্তুগীজদের সঙ্গে ধর্ম প্রচারের জন্য জেসুইট মিশনারিরা এসেছিল। এদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞানীও ছিলেন। তারা অবশ্য কোম্পানির আমলে ভৌগোলিক সমীক্ষা ও জরিপের কাজ করেছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বাংলার সার্ভে দপ্তর, সামরিক দপ্তর, বেঙ্গল আর্টিলারির কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ভারতের নানা জায়গায় অক্ষাংশ ও দেশান্তর মাপেন। এরপর কোর্ট হিলিয়ামের তখনকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির পদ কলকাতায় এলেন উইলিয়াম জোন্স। জোন্স সাহেব ভারতীয়দের আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম, সাহিত্য-ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য মৌলিক গবেষণার জন্য তার এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ভারতের বিজ্ঞান চর্চায় এই সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য।যে লন্ডনের’রয়েল সোসাইটি’এবং প্যারিসের’একাডেমি দে সিয়াস’এর সঙ্গে সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। এশিয়াটিক সোসাইটির কিছুটা দূরে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পাশে জাদুঘরটিও প্রবর্তক এশিয়াটিক সোসাইটি। পরে যা এশিয়ার বৃহত্তম মিউজিয়াম এর স্বীকৃতি লাভ করেছে। এসবই হল কলকাতার বিজ্ঞান চর্চায় বিদেশি বিজ্ঞানীদের কথা। তৎকালীন দেশীয় নেতৃত্বের, যারা দূর থেকে কোম্পানির বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে ও এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যদের এই সব কর্মকাণ্ড দেখে ছিলেন তারা বুঝতে পারলেন দেশের লোকের জন্য এরকম বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা শুরু করতে হলে ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা দরকার। কোম্পানি যখন দেশীয় প্রথায় আমাদের শিক্ষাদানের জন্য মাদ্রাসা, সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করছে, তখন দেশীয় চিন্তাবিদরা ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজ তৈরি করেন। মেডিকেল কলেজ তৈরি হলে এ্যানাটমী সার্জারি, মেডিসিন এর সঙ্গে বোটানি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স এর মত বিজ্ঞানের বিষয়গুলোও চালু করেন। পরে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরি হলে অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি শিক্ষা আরো সহজলভ্য হয়। কিন্তু উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা গার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই বাধা দূর করেন হিন্দু কলেজের ছাত্র ও কলকাতা মেডিকেল কলেজের ২য় এম. ডি. ড. মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি প্রথম ১৮৬৯ সালে’ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স’স্থাপন করেন। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় দেশের মাটিতে প্রথম বিজ্ঞানের বীজ পোঁতা হলো। তাকে বেসরকারিভাবে এই উদ্যোগ নিতে হয়েছিল এই কারণে যে, সে সময় তখনো ভালোভাবে বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ঠাঁই করে নিতে পারেনি বলে। পরে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর সময় অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। বিদ্যাসাগর মশাইও এ সময় যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি ওই সময় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ভুল ধরে বিকল্প পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব দেন। আজ আমরা যে ইউনিট

টেস্ট, সামেটিভ টেস্ট ইত্যাদি চালু করেছি, এসবই সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়ে তার ভাবনায় স্থান পেয়েছিল বলে। কারণ শিক্ষাব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক করে তোলাই তার লক্ষ্য ছিল। ব্রিটিশ সরকার যেহেতু কোনদিনই বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কে ভালো চোখে দেখেনি সে জন্য খুব কষ্ট করে এগুলির ব্যবস্থা করেন। ১৯০৪ সালে বিশ্ব বিদ্যালয় স্তরে পঠন-পাঠনের নতুন নিয়ম জারি করেন। তাতে পোস্ট গ্রাজুয়েট স্তরে ৪ সাইন্স এর দুটি আলাদা বিভাগ তৈরি হয়। পরে স্যার আশুতোষ এর সঙ্গে দুই বিশিষ্ট আইনজীবী স্যার তারকনাথ পালিত রাম বিহারী ঘোষ যোগ দেন। এরা উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বেশকিছু অর্থ দেন। তবে তারা শর্ত দেন যে, অধ্যাপক পদে শুধুমাত্র ভারতীয়দেরই নিয়োগ করতে হবে। সরকার রাজি না হলেও এদের অদম্য জেদ এ রাজাবাজার বালিগঞ্জ অঞ্চলে তারকনাথ পালিত জমিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ তৈরি হয়। কেমিস্ট্রির অধ্যাপক হন প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, প্রফুল্ল মিত্র, জ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর ফিজিক্সের অধ্যাপক হন ভেঙ্কট রমন, দেবেন্দ্রমোহন বসু, শিশির মিত্র, অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেদিন বলেছিলেন - কেমিস্ট্রির গবেষণার যে বীজ আজ কথা হলো তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। জগদীশচন্দ্র বসু রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়ে বিজ্ঞানের গৌরব বাড়িতে ছিলেন। চন্দ্রশেখর, ভেঙ্কট রমন, মেঘনাথ সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শিশির মিত্র, এস. কৃষ্ণন পরে পরে আরও শ্রীবৃদ্ধি করেন তথা বিজ্ঞান চর্চায় বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেন। ১৯৩০ সালে ফিজিক্সে রোমান্সের নোবেল পাওয়ার পর বাংলা বিজ্ঞান চর্চার শিখরে ওঠে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ওই সাফল্যের গ্রাফ বেশ কিছুটা নিম্নগামী হয় সরলরৈখিক ভাবে চলেছে। কিন্তু আমজনতার দরবারে বিজ্ঞান এখনো ঠিকঠাক কেন পৌঁছতে পারল না তা গবেষণার বিষয়। একজন নিরক্ষর পথশিশু মোবাইল গেমে যতটা পারদর্শী, তথাকথিত বর্তমান ছাত্র ছাত্রীরা অনলাইন ক্লাসে ততটাই অপারগ। অথচ ভারতে বিভিন্ন কোম্পানির কল্যাণে খাবার আটার থেকেও ইন্টারনেট ডাটা অনেক বেশি সস্তা। এতকিছুর পরেও আজও একজন সাধারন মানুষ বিজ্ঞান কি জিনিস তা বোঝেন না। এটা খায় না মাথায় মাখে। একই অঙ্গে কত রূপ। বিভিন্ন চ্যানেল করণা প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন চিকিৎসক, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মানুষকে সচেতন ও তার পাঠিয়েছেন অপরদিকে অন্যান্য চ্যানেলে বিভিন্ন বাবাজি, মাতাজি, শাস্ত্রীজিরা কুষ্টিবিচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। সাধারণ মানুষ আজ সত্যিই বিভ্রান্ত। কোন তথ্যটা ঠিক তা অনেক শিক্ষিত মানুষও বুঝতে পারবেন না। আমরা দেখেছি সরকারি স্তরে বা রাজনৈতিক স্তরেও এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের আখের গোছাবার খেলা চলে সুকৌশলে। আর সাধারন মানুষ শিক্ষিত হয়েও বিজ্ঞানের কাছ থেকে ক্রমশ কক্ষচ্যুত হতে থাকেন। দেখে শুনে কষ্ট হয়। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ে মোমবাতি মিছিল বের করেন না। দিশাহীন মানুষগুলোকে আলোকবর্তিকা দেখানোর জন্য কেউ নেই এই মুহূর্তে। নেই কোনো ঘন্টাখানেক সঙ্গে...... জাতীয় কেউ। কারণ বিজ্ঞান সচেতনতার থেকেও টিআরপি বাড়ানোর জন্য অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রতিনিয়ত অপেক্ষা করে আছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে বহু বিশিষ্ট মানুষের জন্মদিন বা প্রয়াণ দিবসে সংবাদপত্রের

পাতায় শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়া হয় ঘটা করে। কিন্তু বিজ্ঞান সাধকদের দেওয়া হয় না। একমাত্র ডা. বিধানচন্দ্র রায় ছাড়া আমি অন্তত কোন বিজ্ঞানীর প্রতি এরকম কিছু দেখিনি। বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন যে যার নিজের মতো করে অবশ্য কাজ করে চলেছেন এত কিছু প্রতিবন্ধকতা মধ্যে দিয়েও। তার জন্য তাদের অবশ্যই সাধুবাদ জানাই। তবুও সামগ্রিকভাবে কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। ফিডব্যাক টা ঠিকঠাক আসছে না। সেজন্য আমার মনে হয় এখন সমস্ত বিজ্ঞান সংগঠন গুলোর একমঞ্চে থেকে যৌথভাবে কাজ করা দরকার। মতপার্থক্য থাকলেও আমাদের সকলেরই তো লক্ষ্য একই তাহলে অসুবিধা কোথায়? আর আমাদের বিজ্ঞান আন্দোলনের অগ্রজ পূর্বসূরীরা তো আর প্রতিবছর জন্মান না। বেশ কয়েক দশক বা শতাব্দি লেগে যায়। আসুন না ততদিন পর্যন্ত আমরাই এই জোয়াল টেনে নিয়ে এগিয়ে যাবার কাজটা করি। অন্তত মানুষকে প্রতিনিয়ত অসচেতনতার কাজটুকুও তো আমরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে করতে পারি। যখন কোন স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারবাবু অথবা যারা এই সংকটময় মুহূর্তে গানপয়েন্টে দাঁড়িয়ে রক্ষা করে চলেছেন তাদের প্রতি কোন বিমাতৃসুলভ আচরণ না করে এই সহানুভূতি, সহমর্মিতা দেখাতে পারি না আমরা! অর্থনীতি বিপর্যস্ত, হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন, সরকার দিশেহারা, লকডাউন-আনলকডাউনের কুমিরডাঙ্গা খেলা চলছে, সাধারণ মানুষ কি করবে? কার শরণাপন্ন হবে? এখানেই বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য। পথ হারা বিজ্ঞানকে সুপথে চালিত করার এটাই মাহেন্দ্রক্ষন। অতএব আসুন সকলে মিলে বিজ্ঞান আন্দোলনকে জোরদার করে তুলি। আসুন প্রমাণ করে দিয়েছে বিজ্ঞান পথ হারায়নি। বিজ্ঞান বিজ্ঞানের পথেই আছে। তবে চলার গতি টা একটু শ্লথ হয়ে গেছে। আবার রাস্তা ভালো পেলে গতি বাড়বে। বিজ্ঞান কখনো থেমে থাকতে পারে না বা পথভ্রষ্ট হতে পারে না। অতএব চরৈবেতি।

“বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস"

- কুহেলী বিশ্বাস

মাথা খারাপ যুবকটিকে নিয়ে কি করা যায় প্রতিবেশীরা বুঝতে পারছিলেন না। ইনি একজন অধ্যাপক এবং বৈজ্ঞানিক এ কথা যদিও সবার জানা ছিল। তবুও তাঁর বাড়ির ছোট গবেষণাগারে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন এটাও সবাই জানতেন। কিন্তু জীবজন্তুর হাড়গোড় ছাদে জড়ো করার মধ্যে কি বৈজ্ঞানিক রহস্য থাকতে পারে এটা কারো মাথায় আসছে না।এমনিতেই গবেষণাগার থেকে মাঝে মাঝে নানা রকম দুর্গন্ধ,তারপর এই পচা মাংসের গন্ধ সবার কাছেই অসহ্য হয়ে উঠল।

ছাদ থেকে হাড় তুলে নিয়ে কাকেরা আশে পাশের বাড়িতে ছড়াতে লাগলো। এই উপদ্রব আর সহ্য করতে না পেরে সবাই যুবকটিকে বললেন,"এই হাড়গোড় যদি না সরাও, তবে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেদের ডেকে ওগুলো পরিষ্কার করানো হবে।"যুবকটি পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। ওই সময় তাঁর এক বন্ধু এসে তাঁকে বাঁচালেন। লোকালয় থেকে দূরে ওই বন্ধুর একটি খালি জমি ছিল। তিনি সেখানে আর গুলো রাখতে বললেন। পরে যুবকটি যখন দেখলেন রোদে হাড় গুলো ভালোভাবে শুকিয়ে গেছে তখন একদিন সন্ধ্যায় তিনি আগুন জ্বালিয়ে হাড়গুলো পোড়াতে বসলেন। সবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ছুটে এল। অতি কষ্টে তিনি পুলিশকে বুঝালেন যে, তিনি কোন খুন করে লাশ পড়াচ্ছেন না।তিনি যে হাড়গুলি পোড়াচ্ছেন সেগুলো মানুষের হাড় নয়।

পরদিন সকালে এই হাড় পোড়া ছাই গবেষণাগারে নিয়ে গিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিড দিলেন।এইভাবে তৈরি সুপার ফসফেট অফ লাইম,সোডার সঙ্গে মিশিয়ে তিনি ফসফেট অফ সোডার দ্রব তৈরি করে একটি বড় গামলায় ঢেলে ফোটাতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে গামলার মধ্যে দলা দলা ফসফেট অফ সোডার স্ফটিক দেখা গেল। তখন যুবকটি একটি দলা মুখে দিয়ে চিবিয়ে খুব খুশি হলেন।

কারণ এইভাবে তিনি পশুর হাড়গোড় যা সাধারণত ফেলে দেওয়া হয় তা থেকে এমন একটি ওষুধ তৈরি করেছেন যা থেকে স্নায়ুতন্ত্রের বলবর্ধক ওষুধ তৈরি করা হয়।

যুবকটির এই বল বর্ধক ওষুধ বিদেশ থেকে আমদানি করা ওষুধের চেয়ে অনেক সস্তা। প্রথমদিকে ওষুধের দোকানদাররা এই দেশী ওষুধ রাখতে না চাইলেও অল্পদিনের মধ্যেই এই ওষুধটি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এইরকম ভাবে খুব ছোট আকারে"বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস"-এর সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীকালে এই কোম্পানী দেশের বৃহত্তম রাসায়নিক উৎপাদকদের অন্যতম হয়ে দাঁড়ায়।

এই মাথা খারাপ যুবকটির নাম ছিল প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট, বাংলাদেশের খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরিশচন্দ্র রায় ছিলেন জমিদার।

নয় বছর বয়স পর্যন্ত তার পড়াশোনা গ্রামের স্কুলে হয়।১৮৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট এ ভর্তি হন।কিন্তু সেই সময় সেখানে কোন বিজ্ঞানের ক্লাস বা ল্যাবরেটরী না থাকায় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ণের ক্লাস করতে যেতেন।বি,এ পড়াকালীন তিনি গিলক্রিস্ট বৃত্তি পান। স্নাতক পাঠ সম্পন্ন করে তিনি লন্ডনে পাড়ি দেন এবং এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হন।সেখান থেকে তিনি বি,এস,সি ডিগ্রি লাভ করেন এবং ২৭ বছর বয়সে পর্যায় সারণীর উপর মৌলিক গবেষণার জন্য ডি,এস,সি ডিগ্রী লাভ করেন।১৮৮৮ সালে তিনি ওই বিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তাঁর থিসিসটি ওই বছর সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়।

১৮৮৯ সালেকলকাতা ফিরে এসে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।১৮৯৬ সালে যৌগ সালফিউরিক নাইট্রাইট (লাফিং গ্যাস) আবিষ্কার করে বিশ্বে আলোড়ন তুলে দেন। ১৯১৬ সালে তিনি

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সাইন্স-এ যোগদান করেন। তিনি তার সমস্ত বেতন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে দান করেন। রসায়নের বিভিন্ন বিষয় ১০৭ টি পেপার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় লিখেছিলেন।

তিনি অনুভব করেছিলেন, ভারতবর্ষকে অর্থনীতিতে মজবুত করতে হলে দরকার দেশীয় শিল্পের। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য তিনি লেখেন,"এ হিস্টোরি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট টাইমস্ অফ দি সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরি"। বইটির প্রথম খন্ড ১৯০২ সালে এবং দ্বিতীয় খন্ড ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও 932 সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনী"লাইফ এন্ড এক্সপিরিয়েন্স অফ এ বেঙ্গলি কেমিস্ট"---যা আজও আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়।

শুধু শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞান নয় দেশের যে কোন বিপদের দিনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তিনি। হাজার ১৯৩২ সালে উত্তরবঙ্গের বন্যার সময়"বেঙ্গল রিলিফ কমিটি"গঠন করে ২৫ লক্ষ টাকা এবং বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করেন।তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল এবং নিজের তৈরি ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটিকে নিয়মিত অর্থ দান করতেন।

রসায়নে সর্বোচ্চ নাগার্জুন পুরস্কার এবং প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা সর্বোচ্চ আশুতোষ মুখার্জী পুরস্কার তার অনুদান থেকে তৈরি হয়। তিনি ১৯১৭ সালে নাইটহুড পুরস্কার পান এবং ১৯২০ সালে ইন্ডিয়ান সাইন্স কংগ্রেস এর সভাপতি নির্বাচিত হন। খদ্দর পরিহিত,অত্যন্ত সরল সাদাসিধে এই সন্ন্যাসী বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের আদর্শ,ত্যাগ,সাধনা ও দেশপ্রেম ভারতবাসীর মনে সঞ্চারিত হোক।

ছুঁচিবাই

ডঃ গৌরাঙ্গ সিনহা

করোনা মহামারীতে কাটে আতঙ্কের প্রহরগুলো,
এই দুই হাজার কুড়ি সাল অনেক শেখালো।
শুধু উদরপূর্তি করলেই সুরক্ষিত নয় জীবন,
সুস্থ শান্তির জীবন পেতে মানো যা বলে বিজ্ঞান।
আজ থেকে বছর তিরিশ আগে,
আমার ঠাকুমা চলতেন ভীষণ কড়াকড়ি করে,
হাত-পা ভালো না ধুয়ে ঢোকা যাবে না অন্দরে।
যেখানে যেমন খুশি যাবে না বসা,
সবাইকে থাকতে হবে শুচি মেনে চলা।
পরিছন্ন রাখতে বাড়ীর সবাই হতো হয়রান,
পরে সবাই বিরক্ত হয়ে বলতো তাকে ছুঁচিবাই।
এখন মনে হয় ঠাকুমার সংস্কার ছিলো ঠিক,
বিজ্ঞানের সাথে দেখো সংস্কারের কাকতালীয় মিল।
পূজার জন্য শুধু শুচি নয়,
শুচি থাকতে হবে সবসময়।
করোনা রুখতে যদি মানো পরিছন্নতাই দাওয়াই,
যে যা বলে বলুক, প্রয়োজনে হবো ছুঁচিবাই।

মহামারী ও কুসংস্কার : প্রসঙ্গ করোনা

-ধ্রুবজ্যোতি সরকার

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মহামারী নতুন কিছু নয়। আদিম কাল থেকেই সেইসব মহামারীর সঙ্গে জড়িত থেকেছে মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, কখনো বা মিশে গেছে মৌলবাদ। সেসময় মহামারীর কারণ ব্যাখ্যা করতে যেমন নিজেদের মন গড়া বিশ্বাস ও যুক্তিহীন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতো তেমনই মহামারী থেকে রক্ষা পেতেও তারা নির্ভর করতো অন্ধবিশ্বাসে। 1860 সালে লুই পাস্তুর ও অন্যান্য রোগতত্ত্ববিদদের গবেষণায় জীবাণু তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারপর থেকেই নানান সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ভৌগলিক কুসংস্কার ও বাধা অতিক্রম করে বিভিন্ন রোগের জন্য দায়ী জীবাণু সনাক্তকরণ ও আধুনিক চিকিৎসার প্রসার শুরু হয়।

আদিকাল কাল থেকেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, যুক্তি, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যনীতিমালার বাইরে সাধারণ মানুষের জীবনে মহামারী নিয়ে প্রথাগত বিশ্বাস, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ইত্যাদি শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করে আসছে। মানুষ বিশ্বাস করতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ, ব্যাধী, মহামারী এসবই হলো পাপের ফল, দৈব শক্তির প্রতিশোধ। কেউ কেউ আবার তাদের শত্রুদের দায়ী করতো, কেউ বা"দূষিত বায়ু"কে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন শতাব্দি জুড়েই প্লেগ বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল। বিভিন্ন সময়ের প্লেগ মহামারীর মধ্যে কখনো বিউবোনিক, কখনো নিউমোনিক, কখনো সেপটিসেমিক রূপ ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে। গ্রীক ইতিহাসবিদ থুসিডাইসের রচনা থেকে খ্রি.পূ. 430 এর এথেন্সের ভয়াবহ প্লেগের কথা জানা যায়। কারণ হিসেবে দায়ী করা হয় যুদ্ধের পূর্বে সমুদ্র দেব পডেসন ও দেবী হেরাকে নৈবদ্য নিবেদন না করা। আবার 541 খ্রিস্টাব্দের ছড়ানো প্লেগের কারণ হিসেবে দায়ী করা হয় সম্রাট জাস্টিনিয়ান এর যুদ্ধকালীন চার্চ দখল করাকে। তাকে প্লেগের স্রষ্টা হিসেবে"পিশাচ সম্রাট"রূপে আখ্যায়িত করা আছে"সিক্রেট হিস্ট্রি"গ্রন্থে। তবে প্লেগের সব থেকে ভয়াবহ রূপটি ছিল 1347 সালের প্লেগ, যা ইতিহাসে"ব্ল্যাক ডেথ"হিসেবে পরিচিত। এই সময় আড়াই থেকে সাড়ে তিন কোটি মানুষ মারা যায় যা ছিল ইউরোপের তৎকালীন জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ। 1348 সালে ফ্রান্সের রাজা সপ্তম ফিলিপের নির্দেশে ইনিভার্সিটি অফ প্যারিসের মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞরা মহামারীর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে 1345 সালের 20 মার্চ এর চন্দ্র গ্রহণ ও তিনটি গ্রহের বিশেষ অবস্থান। মধ্যযুগে এই মহামারী নিয়ে ব্যাপক মৌলবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে পড়ে। কারণ হিসেবে বলির পাঠা করা হয় সমাজের দুর্বল ও প্রান্তীয় শ্রেণীর মানুষদের। শুরু হলো তথাকথিত শয়তানের প্রতিনিধিদের খুঁজে বের করা ও তাদের হত্যা করা। গড়ে ওঠে অসংখ্য"উইচ হান্টার"এর দল। শুরু হল অবিশ্বাসীদের ওপর যে কোনো অছিলায় যথেচ্ছ অত্যাচার ও মানুষ খুন করা। ক্যাথলিক চার্চ ভেবে নেয় যে রোগ ছড়ানো ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও তারা জলের কুয়োতে বিষ প্রয়োগ

করে রোগ ছড়াচ্ছে। তারপর প্রথমে ট্যুলোন শহরে 40 জন ও পরবর্তীতে কর্কাসন্নে, বাজেল ইত্যাদি শহর মিলিয়ে প্রায় 2000 ইহুদিকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয় (1349 খ্রি:)। বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে ইহুদীদের পোড়া মাংসের গন্ধে। এছাড়া মধ্যযুগে প্লেগের কারণ হিসেবে যারা পুরনো ওষুধের চর্চা করতো তাদের দায়ী করে"ডাইনি"অপবাদ দেওয়া হয়। 2006 সালে ইতিহাসবিদ ব্রায়ান লেভাক হিসেব করে দেখিয়েছেন প্রায় 90,000 মানুষকে ডাইনি অপবাদে শাস্তি দেয়া হয় এবং যার অন্যতম মূল আঘাত নেমে এসেছিল নারীদের ওপরে।

আবার সে সময় রাশিয়ায় কলেরার প্রাদুর্ভাব হলে অনেক পুলিশ ও সরকারি কর্মচারী দের হত্যা করা হয়, কারণ ধারণা করা হয় এই রোগ উচ্চ শ্রেণীর ছড়ানো রোগ।

মহামারীর ইতিহাসে আরেকটি কুখ্যাত রোগ হলো কুষ্ঠ রোগ বা লেপ্রসি। সেসময় কুসংস্কার বসত লেপার (leper) শব্দটি এতটাই কলঙ্কময় হয়ে ওঠে যে তা সামাজিকভাবে পতিতদের সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুশাস্ত্র"মনুর সংহিতা"তে কুষ্ঠ রোগীদের"পাপী"বলে গণ্য করে একঘরে করার বিধান ছিল। এমনকি 1891 সালের লেপ্রসি কমিশনের রিপোর্ট কুষ্ঠকে"ছোয়াচের পরিমাণ এতই নগন্য যে এটাকে উপেক্ষা করা যায়"বলে চিহ্নিত করলেও বিশেষ লাভ হয়নি।

কলেরার ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটনা দেখা যায়। 1817 সালে যশোরে কলেরা ছড়িয়ে পড়লে সাধু ও জ্যোতিষ গণ দেখালেন যে সে মাসে পাঁচটা শনিবার। তাই"শনির দশা"কে কারণ হিসেবে যেমন দেখা হলো, তেমনি পাঁচ সংখ্যার জন্য মহামারিকে শিবের ধ্বংসাত্মক কান্ড হিসেবেও ধর্মীয় অপব্যাখ্যা করা হলো। আবার পাশাপাশি একদল কালো জাদুকরের নামও ছড়িয়ে পড়ে। সেসময় ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস বসত দলে দলে মানুষ তীর্থযাত্রা ও তীর্থস্নান এর মাধ্যমে শনির দশা ও পাপ কাটাতে শুরু করেছিল।

এমনকি বিংশ শতকের শুরুতে কলকাতায় প্লেগ যখন মহামারীর আকার নিয়েছিল তখন সমাজ বিধান দিয়েছিল মানুষ মন্দিরে, ব্রাহ্ম উপাসনালয়ে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করুক। তারা হরিনাম সংকীর্তন কেও বেছে নিয়েছিল। আবার ঔপনিবেশিক সরকার সেসময় জীবাণুর বাহক ইঁদুরকে মারার বিধান দিলে অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তিরা ইঁদুরকে গণেশের বাহন বলে ইঁদুর মেরে প্লেগ নিবারণ করার চেয়ে গণেশকে সন্তুষ্ট রাখা বেশি প্রয়োজন মনে করেছিল। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বসন্ত মহামারীর সময় কল্পিত"শীতলা"দেবীর দলে দলে পুজোর ইতিহাসও আছে।

এ তো গেল মহামারীর ইতিহাস। সে সময় মানুষ ব্যাপক ভাবে বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসেনি। কিন্তু আজ আমরা প্রবেশ করেছি বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির যুগে। আমাদের হাতে হাতে পৌঁছেছে স্মার্টফোন। বিজ্ঞানের কল্যাণে আধুনিক হয়েছে জীবনযাত্রা। কিন্তু আমরা কি পেরেছি   মধ্যযুগীয় চিন্তা ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে বিজ্ঞানমনস্ক হতে? চিন্তার জগতে কি পরিবর্তন হয়েছে? দুঃখের বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞানের অভুদপূর্ব উন্নতি সত্বেও আজ একবিংশ শতকে এসেও এদেশে বিজ্ঞানমস্কতার প্রসার ঘটেনি। সাম্প্রতিক নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে এই কুসংস্কার কতটা দৃঢ়মূল তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতীতেও বিভিন্ন মহামারীকে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কোভিড-19 মহামারীও তার ব্যতিক্রম নয়। যেমন বাইবেলের উক্তি তুলে ধরে অনেক খ্রিস্টিয় অনুসারী বলেছেন, এমন একটি সময় আসবে যখন একটি রোগে অনেক মানুষ মারা যাবেন। ইসলাম ধর্মের অনেক অনুসারী অপব্যাখ্যা করে হাদিসে বর্ণিত একটি

অসুখের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, পৃথিবী শেষ হওয়ার আগে একটি রোগ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। আবার অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা মনে করেন, মুসলিম ছাড়া অন্য ধর্মের মানুষের দিন শেষ হতে চলেছে। আবার ভারতে হিন্দু মহাসভার সভাপতি স্বামী চক্রপানী এই ভাইরাসকে রাগী দেবতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার মতে করোনা কোনো ভাইরাস নয় নিরীহ প্রাণীকে রক্ষা করার অবতার মাত্র। চীনের প্রেসিডেন্টের করোনা এর মুর্তি বানিয়ে ক্ষমা চাওয়াও দরকার বলে মনে করেন চক্রপাণী।

মধ্যপ্রাচ্যে কোভিড 19 মহামারীকে ঘিরে দেখা গেছে জাতিগত বিদ্বেষ। সৌদি আরবের মতে এই ভাইরাস কাতার তাদের মিশন 2030 নস্যাৎ করার জন্য প্রয়োগ করেছে। ইহুদী পণ্ডিতরা তাবিজ ব্যবহার করতে বিধান দিয়েছেন। অনেক গোঁড়া ধার্মিক এটাকে মনে করেন ঈশ্বরের আগমন বার্তা।

পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে আমরা দেখেছি লক ডাউনের মধ্যেও ধর্মগুরুরা মানুষকে নামাজ পড়তে প্ররোচিত করেছে। মহামারীর ঔষধ হিসেবে নামাজ পড়তে অনুরোধ করে বিভিন্ন পোস্টার বা লিফলেট বিলি করা হয়েছে। ওয়াজ মাহফিল এর নামে যে বিজ্ঞান বিরোধী প্রচারণা চলে সেখানে"মুসলমানের করোনা হয় না"বা"নামাজ পড়তে গিয়ে মৃত্যু হলেও বেহেস্তে (স্বর্গ) যাওয়া যায়"এধরনের অযৌক্তিক প্রচার চালানো হয়েছে। এভাবে যেখানে কোমলমতি মানুষকে ধর্মের নামে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে উস্কানী মূলক প্রচার চলে, ধর্মীয় মৌলবাদ সেখানে মানবতাকেও হার মানায়।

আমাদের দেশও ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রচার করেছেন এ ভাইরাসের আগমন তারা আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে ভাইরাসের গায়ে লেগেছে ধর্মের ছোয়া। এদেশে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে গো মূত্রের ব্যবহার অনেক পুরোনো। এবার তাতেও নতুন জোয়ার এসেছে। সঙ্গে গোবরের ব্যবহারও হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে"গোমূত্র পার্টি"আবার অনেক জায়গায় বোতলে ভরে গোমূত্র বিক্রির ঘটনাও নজরে এসেছে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা কে তোয়াক্কা না করে বহু মানুষজন কবিরাজ, তান্ত্রিকদের জাদুটোনা, ঝাড়ফুঁক, শরীর বন্ধ করা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়েছে।

কোভিড 19 মহামার চলাকালীন ভারতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে যুক্তরাজ্যের এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির পিএইচডি স্কলার এবং অস্ট্রিয়ার কনরাড লরেঞ্জ ইনস্টিটিউটের ফেলো অমিতাংশ আচার্য লিখেছেন, কোভিড-১৯ এর পাশাপাশি জেগে উঠেছে ভারতের সুপ্ত কুসংস্কারগুলো। ভবন মালিকেরা তাদের বাড়িতে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। লোকজন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলার সময় ব্যবহার করছে বর্ণভেদ আর অস্পৃশ্যতার ভাষা। উত্তরপূর্ব ভারতের নাগরিকদের সহ্য করতে হচ্ছে বর্ণবাদী মন্তব্য ও বহিষ্কারের হুমকি।

প্রথম দিকে আমরা দেখেছিলাম"মহাদেব শিব এসেছেন"তাই করোনা তাড়াতে"শিল নোড়া পূজো"এর হিড়িক পড়েছিল। আমরা দেখেছি করোনাকে অসুর বলে চিহ্নিত করে"করনাসুর"তাড়াতে অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ঘটনাও। এদেশে আবার স্বপ্নাদেশ বেশ বড়সর জায়গা দখল করে রেখেছে। এই স্বপ্নদেশের নামে করোনা নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডও অনেক। ওড়িশার কটকের নরসিংহপুর থানা এলাকায় হয়ে গেছে নরবলি। আবার কখনো বা সংবাদ মাধ্যমে নজরে এসেছে কিশোরীর স্বইচ্ছায় জিহ্বা কেটে ভগবানকে উৎসর্গ করার মত ঘটনা। করোনা নিয়ে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের একটি জোরালো উদাহরণ হলো পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অসমের বিভিন্ন জায়গায় করা"করোনা মাতা"র পূজো। দলে দলে মহিলারা তাতে সামিল হয়েছেন, আবার অভিনব এই পূজো দেখতে

অনেকে ভিড় জমিয়েছে, হারিয়ে গেছে স্বাস্থ্যবিধি। আবার অনেকর সুস্থতা কামনা করে নানা স্থানে আমরা ডেকেছি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মত ঘটনাও।

সমাজের বেশিরভাগ মানুষই বিজ্ঞান শিক্ষার বাইরে অবস্থান করেন, যুক্তির সাথে তাদের বেশীরভাগের পরিচয় ঘটেনি। সেই চরম অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে ধর্ম প্রতিষ্ঠানের কারবারিরা কোমলমতি মানুষদের ভুল পথে চালনা করেন। আতঙ্কে দিশেহারা কুসংস্কারাছন্ন মানুষ তাদের ফাঁদে পা দিচ্ছেন। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর পরামর্শকে উপেক্ষা করেই অনেক মানুষজন রুষ্ট ইস্ট দেবতা বা আল্লাহকে তুষ্ট করতে সাস্থ্যবিধির তোয়াক্কা না করেই পূজো, যজ্ঞ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সামিল হচ্ছেন। তারা ভুলে যান, যে কল্পিত ঈশ্বরের কাছে তারা মুক্তির প্রার্থনা করে, সেই ঈশ্বরই মহামারীর জন্যও দায়ী বলে তারাই আবার মনে করে।

এবার আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে একটু ফেরা যাক। কোভিড 19 মহামারী চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে দেশের জনগণের থালা বাসন বাজানো কিম্বা রাত ন'টার সময় ঘরের সব আলো নিভিয়ে বাইরে নয় মিনিট ধরে মোমবাতি বা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন কুসংস্কারের চরমতম নিদর্শন। দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন গুলি প্রধানমন্ত্রীর এই রকম আচরণের বিরোধিতা করেছে। আমাদের দেশের স্বয়ং জনপ্রতিনিধিরা অনেকে একের পর এক উদ্ভট সব দাবী করে গেছেন। কখনো গুমুত্র কখনো গঙ্গাজল নিয়ে গবেষণার দাবী জানিয়েছেন, কখনো বিশেষ পাঁপড় খেলে আবার কখনো হনুমান চল্লিশা পরলে করোনা হয় না বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। আমরা দেখেছি এই মহামারী পরিস্থিতিতেও শুধুমাত্র ব্যবসায়িক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে করোনার ওষুধ পর্যন্ত বাজারজাত করার চেষ্টা করেছে এক সংস্থা। আমাদের দেশের শিক্ষিত- অশিক্ষিত, উচ্চবিত্ত - নিম্নবিত্ত প্রায় সব লোকেরই মাঝে আছে অন্ধবিশ্বাস। এর জন্য দায়ী অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান এর ওপর অবিচল নিষ্ঠা আর শিক্ষিত ও ক্ষমতাবানদের অপরিসীম দায়িত্বজ্ঞান হীনতা। মহামারী চলাকালীন বহু শিক্ষিত মানুষদের আমরা দেখেছি বিভিন্ন করোনা পূজো সহ নানান অবৈজ্ঞানিক আচরণ কে মানসিক শান্তির উৎস হিসেবে ভেবে সমর্থন করতে। লেখিকা তসলিমা নাসরিন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন,”এই পূজার! (করোনা মাতার) খবর পেয়ে আমি মোটেও অবাক হইনি কারণ, এর থেকেও আরও ভয়ংকর কুসংস্কার আমি দেখেছি। এই পূজা তো অশিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত নিরীহ মহিলারা করছে। আমরা কি লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকদের করোনা থেকে বাঁচতে গোমূত্র পান করতে দেখিনি, সারা গায়ে গোবর লেপে বসে থাকতে দেখিনি? আমরা বড় বড় তারকা, বড় বড় রাজনীতিক, বড় বড় ধনকুবেরদের কি মানুষ ঠকানোর’ব্যবসায়ী’গুরুদের পায়ে মাথা ঠেকাতে দেখিন!আমরা কি রকেট ছাড়ার আগে নারকেল ফাটাতে কিংবা মন্দিরে মিনিয়েচার রকেট নিয়ে বিজ্ঞানীদের পুজোয় বসতে দেখিনি? পূজা-আর্চা নিয়ে থাকা কিছু মহিলা, যারা বিজ্ঞান মনস্ক হওয়ার কোনরকম সুযোগ পায়নি জীবনে, তারা করোনা পূজার করেছে, বিজ্ঞান-পড়া ভদ্রলোকদের কুসংস্কারের তুলনায় এ তো কিছুই নয়।''

আবার সামাজিক ভাবে মহামারীর পেছনে অনেক সময় ভৌগলিক স্থানের তকমাও এটে দেওয়া হয়। যেমন আমরা দেখেছি ট্রাম্প প্রশাসন কোভিড 19 কে বারবার”চাইনিজ ভাইরাস”বলে আসছেন, আবার কেউ কেউ বলেছেন”কুং ফ্লু"। এসব নামকরণ কুসংস্কারকে আরও বদ্ধমূল করে তোলে। গবেষক আলেকজান্দ্রে হোয়াইট 2018 সালে ঔপনিবেশিক ব্যাখ্যার বিষয়টিকে”মহামারীর প্রাচ্য নীতি”বলে অভিহিত করেছেন। যেমন, এশিয়াটিক কলেরা (1826), এশিয়াটিক প্লেগ (1846), এশিয়াটিক ফ্লু (1956), রিফট ভ্যালি ফিভার (1900 শতাব্দী),

মিডলইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম (2012) ইত্যাদি। পরে WHO থেকে নিরপেক্ষ নামকরণের নীতি গৃহীত হয়। আবার অনেকসময় রোগ ব্যাধির পেছনে লিঙ্গের তকমাও এটে দেওয়া হয়। যেমন AIDS রোগের নাম দেওয়া হয় GRID - Gay Related Immuno Deficiency অর্থাৎ সমকাম সম্পর্কিত প্রতিরোধ ঘাটতি। অল্পদিনের জন্য হলেও আশির দশকে আমেরিকান টেলিভিশন চ্যানেলের ধর্মবক্তারা এইডসকে গে প্লেগ নামে অভিহিত করতেন, যেটিকে বলা হতো যৌন অনাচারের জন্য দৈব শাস্তি।

সামাজিক কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা ও ধর্মান্ধতার পদ্ধতি দিয়ে কোনোকালেই কোনো মহামারীর নিবারণ সম্ভব হয়নি।”সামাজিক শ্রেণীভেদ, কু-সংস্কার, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, এসব নিয়ে অণুজীবদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তাই কুসংস্কারে বঙ্কিম চোখ দিয়ে নয় মাইক্রোস্কোপের পরিষ্কার লেন্সের ভেতর দিয়েই দেখতে হবে অণুজীবদের চরিত্র। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়। এই মাইক্রোস্কোপ কাদের হাতে? মাইক্রোস্কোপ কেবল অণুজীব আবিষ্কারের যন্ত্র নয়,এটি বৈষম্য আর কু-সংস্কারের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে যদি সেটি থাকে সাম্রাজ্যবাদের হাতে।” স্বাধীনতার 72 বছর পরও দেশের জনগণের সিংহ ভাগ প্রকৃত বিজ্ঞানের শিক্ষা চেতনা থেকে বঞ্চিত, সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেখানে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস। আর যে সমাজে বৈষম্য কাজ করে চরম মাত্রায়, ধর্মীয় বিশ্বাস যেখানে অন্ধত্বের সামিল, সেখানে গুজব, লোকবিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্করাচ্ছন্ন আচার প্রথা কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় নেয়। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় গোড়ামি, অপবিজ্ঞান ইত্যাদি মিলেমিশে করোনা মহামারীর যে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছে তা থেকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে হবে। জীবাণুরা যে কোনো নির্দিষ্ট জাত কিংবা স্থানের খোঁজ করে না- তাদের দরকার একটা উষ্ণ, আর্দ্র ও জীবিত মানবদেহ, এই সত্যটা বোঝাতে এবং মহামারীর কারণ, উৎপত্তি, সংক্রমণ, প্রতিরোধ, সুচিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের সঠিক দিক নির্দেশনা করতে সামিল হতে হবে সকল বিজ্ঞান অনুরাগী মানুষদের।

নভেল করোনা ভাইরাস

-ডঃ রমলা মুখার্জী

করোনা ভাইরাসের অনেক প্রজাতি থাকলেও মাত্র সাতটা প্রজাতি রোগ ছড়ায়। নভেল বা নতুন করোনা ভাইরাস যার নাম WHO দিয়েছে SARS COV2 বা সিভিয়ার একিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম করোনা-২। এই কভ-২ মানুষের শরীরে কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাস ডিসিজ বা রোগ ছড়ায়। ভাইরাসটার আরেক নাম 2019 এন সি ও ভি (2019-NCOV)। এর সংক্রমণের হার প্রচণ্ড বেশি। সারা পৃথিবীর প্রচুর দেশ এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। ২০১৯র ডিসেম্বর মাসে চীনদেশের ইউহান প্রদেশে সর্বপ্রথম এই রোগটি হয়। এই রোগে বয়স্ক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম ব্যক্তিরাই মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। বার বার মিউটেশন অর্থাৎ জিনের সজ্জা বদল করতে পারে বলে এই ভাইরাস সহজেই পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিয়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে দিচ্ছে। COVID-19 এর কোন প্রতিষেধক টীকা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। করোনা ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য হল এর প্রোটিন ক্যাপসুলের একটা কাঁটাযুক্ত আবরণী থাকে দেখতে মুকুটের মত তাই নাম করোনা বা মুকুট। এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশির সময় যে অতি সূক্ষ্ম জল ফোঁটা বা ড্রপলেট তৈরী হয় তার মাধ্যমে এই ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে। ঐ রুগীর কাছাকাছি কোন ব্যক্তি যদি নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ঐ সূক্ষ্ম জল-ফোঁটা গ্রহণ করে তবে রোগী সংক্রমিত হবে। শুধু তাই নয় যে সমস্ত জায়গা ঐ আক্রান্ত ব্যক্তি ছুঁয়েছে সেই স্থানে যদি অন্য ব্যক্তি হাত দিয়ে সেই হাত চোখে, মুখে, নাকে ছোঁয় তো অপর ব্যক্তিরও রোগটি হয় আর এভাবেই দ্রুত রোগটি ছড়িয়ে পড়ছে।

আমরা জানি ভাইরাস মানেই জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী একটি বস্তু। পোষকের দেহে এটি সজীব হয় এবং বংশবৃদ্ধি করে পোষকের দেহের উপাদান নিয়েই। যেমনি করোনা ভাইরাস নতুন ব্যক্তির দেহে আসে সে বংশবৃদ্ধি শুরু করে। করোনার প্রোটিন কাঁটাতে যে রিসেপটর বা গ্রাহক থাকে সেগুলি অনুকূল গ্রাহক পেলে খাপে খাপে একদম বসে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই এর ক্যাপসুল ও প্রোটিনের আবরণীটা গলে যায় আর ভাইরাসের RNAটা সংক্রমিত ব্যক্তির শরীরে ঢুকে পড়ে ও প্রথমে DNAতে রূপান্তরিত হয়ে অসংখ্য প্রতিলিপি গঠন করে প্রচুর নতুন করোনা ভাইরাস উৎপাদন করে। সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিকে করোনা পজিটিভ বলা হয়। নতুন ভাইরাস কোষগুলি শ্বাসনালীর মিউকাস ও সিলিয়েটেড কোষ নষ্ট করে নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টি করে প্রথম পর্যায়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শরীরের অন্য রোগ প্রতিরোধ কোষগুলি ঐ নিউমোনিয়া প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এলেও তারা বিপুল সংখ্যক ভাইরাসের জন্য দিশেহারা হয়ে শরীরের সব কোষগুলিকেই ধ্বংস করতে শুরু করে। তৃতীয় পর্যায়ে ফুসফুস নষ্ট হতে শুরু করে, বায়ুথলিগুলি পাতলা হয়ে যায়। ফুসফুসে কোষরস বা জল জমতে শুরু করে এবং শ্বাসকার্যের অভাবে রুগীর মৃত্যু হয়। কারুর ক্ষেত্রে দিন দুয়েকের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়, কারোর ক্ষেত্রে হপ্তাদুয়েক। এই সময়কে বলে ইনকিউবিশন পিরিয়ড। নভেল করোনা ভাইরাসের পিরিয়ড পাঁচদিনের মত। এইসময় সংক্রমিত

কেউ না জেনেই আরও অনেককে সংক্রমিত করতে পারে। এই ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করতে হলে আমাদের অবশ্যই নিজেদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বাড়িয়ে দিতে হবে যাতে একজনের ভাইরাস আর একজনের কাছে পৌঁছতে না পারে। যতদিন না পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে ততদিন এই দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

WHO নভেল করোনা ভাইরাসের এই বিপুল সংক্রমণের পরিস্থিতিকে প্যান্ডেমিক বা অতিমারী ঘোষণা করেছে। ভারতেও বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। তাই আসুন আমরা কিছু সতর্কতা সবাই অবলম্বন করিঃ-

১। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাবান জল দিয়ে ভালভাবে হাত ধুতে হবে।

২। ৭০% অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করে হাত পরিষ্কার করতে হবে।

৩। নাকে, মুখে, চোখে হাত দেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে।

৪। সর্দি-কাশি, জ্বর হয়েছে এমন ব্যক্তির থেকে অন্তত একমিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

৫। রুমাল বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করতে হবে।

৬। রুমাল না থাকলে কনুই বা কাঁধের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে হাঁচতে বা কাশতে হবে।

৭। ব্যবহৃত টিস্যু পেপার ঢাকনা দেওয়া ডাস্টবিনে ফেলতে হবে।

৮। সুসিদ্ধ খাবার খেতে হবে।

৯। ভিড় থেকে দূরে থাকতে হবে, সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে।

১০। খুব অসুস্থ বোধ না করলে বাইরে যাওয়া একদম বন্ধ করতে হবে।

১১। অসুস্থ বোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

উপরিউক্ত স্বাস্থ্যবিধিগুলি মেনে চলার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর জল পান ও সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণও বিশেষ প্রয়োজন। সংক্রমণের হার কমাতে জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সাথে সাথে করোনায় আক্রান্ত মৃত ব্যক্তিদের যথাযথ সৎকার সংক্রমণের হার নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সবাই মিলে আসুন করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করি নির্দেশমত স্বাস্থ্যবিধি মেনে। একদিন আঁধার কাটবে-সূর্য উঠবে এই আশায় পথ চেয়ে আছি সবাই।

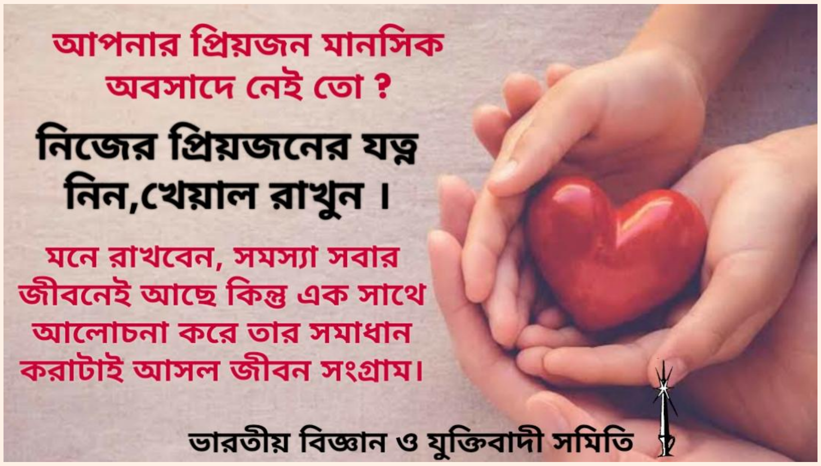

যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে করোনা মহামারী ও ঘূর্ণিঝড় আম্ফান

-সন্তোষ শর্মা

বুধবার ২০ মে ২০২০

সকল থেকেই ঝোড়ো হাওয়া বইছে। দুপুরের পর ঝড়ের বেগ আরও বাড়তে থাকে। কিন্তু বিকেল হবার আগেই প্রায় ৪ টে থেকেই ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ঝড়ের গতি ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার হয়ে যায়। সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি। হঠাৎ চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই দুর্যোগ থেকে বাঁচতে সব্বাই নিজের নিজের ঘরে বন্ধ হয়ে আছে।

আমিও এক নিজের ঘরে চৌকির উপর বসে আছি। আম্ফান ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের রূপ ধারন করে চলেছে। ঘূর্ণিঝড় প্রচন্ডভাবে আছড়ে পড়তে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে এক একটি গাছ-পালা, বাড়ি - ঘর, বাড়ির টিনের বা টালির ছাদ, বিদ্যুতের খুঁটি, বাড়ির ছাদের জলের ট্যাংক সবকিছুই গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে দেবে। তাহলে কি এই আম্ফান সুন্দর পৃথিবীকে ধংস করে দেবার জন্য শেষ ঘণ্টা বাজাতে এসেছে....।

হঠাৎ বাজ পরার মতো প্রচণ্ড আওয়াজ করে বাড়ির পাশে লাগোয়া ৩৫ বছর পুরনো একটি বিশাল আম গাছ প্রায় অর্ধেক অংশ ভেঙে পড়লো আমার বাড়ির উপর। মুহুর্তের মধ্যে গাছের ডাল পাতা টালির ছাদ ভেঙে ঘরের দুদিক দিয়ে ঝুলে পারলো। কাঁচের মত টালিগুলি ভেঙে- ভেঙে পড়লো। পুরো ঘরে বৃষ্টির জল ভাসতে লাগলো। ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাতে রাখা স্মার্ট ফোনের ব্যাক ফ্লাস লাইট জ্বালিয়ে চৌকি থেকে লাফ মেরে নিজে নামলাম। দরজার কাছে গিয়ে দেখি আমি গাছের একটি ডাল ভেঙে আটকে আছে। দরজা আটকে আছে। দুহাত দিয়ে ওই ডাল ধরে টান মেরে ভেঙে দিলাম। এর পর দরজা খুলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। চারিদিকে আম্ফান ভয়ঙ্কর তাণ্ডব চালাচ্ছে। পায়ে ব্যাথা অনুভব করলাম। দেখি ডান পায়ের আঙ্গুল কেটে গেছে। গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। কোনও মতন পাশে বাবার ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। ঘরে ঢুকেই বাবাকে সব ঘটনা বললাম।

দুঃস্বপ্নের মতো এই ঘটনার অনিদ্রায় রাত কাটলো। আর একটু হলে ঘরেই সমাধি হয়ে যেতাম। আজ এই ঘটনার কথা আপনাদের শোনাতে পারতাম না।

বৃহস্পতিবার ২১ মে ২০২০

ভোরের আলো ফোটার আগেই আম্ফান ঝড় থেমে গেছে। তবুও হাওয়ার গতি কমেনি। যেদিকে চোখ যায় দেখি আম্ফানের শুধুই ধ্বংস স্তুপ। আমার জাফারপুর গ্রামের আশপাশের লোকজন আমার বাড়িতে ভিড় করে এসেছে।

রাতের ঘটনার কথা শুনে অনেক বলতে লাগলেন,"সন্তোষ তোমার কপাল ভালো। না হলে কাল রাতেই সব শেষ হয়ে যেতো।"

কেউ বা বললেন,"ভগবানের অসীম কৃপা। ঠাকুর তোমায় রক্ষা করেছে। পারলে বাড়িতে রক্ষা কালির পূজা দাও।"

একজন বললেন, " কাল রাতে তোমার উপর শনির মৃত্যু দশা ছিলো। মৃত্যুর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছো। এখনো বিপদ সংকেত আছে। পারলে কোনও ভালো জ্যোতিষীর কাছে যাও। শনির দশা কাটাতে গ্রহ- রত্ন ধারণ করুন।"

ভিড় করে আসা লোকেদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা এটা ভালো মতন জানেন,"আমি যুক্তিবাদী। নাস্তিক। ভূত, ভগবান, ঠাকুর, শনির দশা, জ্যোতিষী শাস্ত্রে ইত্যাদিতে বিশ্বাস করি না।"

আমার বাড়ি থেকে কিছু দূরে পঞ্চাননতলা। সেখানে শিব মন্দির। প্রায় সারা বছর দূর-দুরন্ত থেকে অনেক মানুষ শিবের কাছে পূজা ও প্রার্থনা করতে আসেন। আজ মন্দিরের পাশে এক বিশাল বট-আশাথ্য গাছ গোড়া থেকে উপড়ে পড়েছে। এই গাছ প্রায় ২০০ বছরের। শিব ঠাকুর এই বট গাছকে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের হাত থেকে রক্ষা করতে পড়লো না।

এখন থেকে কিছু দূরে কালীতলা। এখনে প্রতি বছর চৈত্র মাসে চোদ্দো বা পনেরো হাত উঁচু বিশাল এক কালি মায়ের মূর্তি তৈরি করা হয়। প্রায় ১০ দিন ঘটা করে মূর্তির পূজা ও মেলার আয়োজন করা হয়। এবার করোনা ভাইরাসের মহামারী থেকে বাঁচতে মেলা এনেক আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাল রাতে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের হাত থেকে এই বিশাল মূর্তিও রক্ষা পায়নি। ঘূর্ণিঝড় মুখ থুবরে পড়েছে বিশাল কলির মূর্তি। এই দেখে মনের কোণে প্রশ্ন,"যে মা কালী প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারী থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। মুখ থুবড়ে পড়ল। সেই মূর্তি তার ভক্তদের কি ভাবে সুরক্ষিত রাখতে পারে ?"

হাজার লক্ষ বছর আগে মানুষ বন-জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় থাকতো। সেই সময় ঘূর্ণিঝড়, ভারী বৃষ্টি, খরা বন্যা, ভূমিকম্প, দূর্বিক্ষ, রোগ, মহামারী ইত্যাদি দেখে মানুষ প্রচণ্ড ভয় পেতো। তাঁরা ভাবতো,"এই ঘূর্ণিঝড় বা মহামারীর ইত্যাদির পেছনে কোনও অলৌকিক, দেব-দেবী, ঠাকুর, ভগবানের হাত থাকতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী থেকে নিজের এবং পরিবারকে সুরক্ষিত করতে মানুষ সংঘবদ্ধ হলো। ঝড়, বৃষ্টি, রোগ ইত্যাদি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা শুরু করলো। কেউবা প্রকৃতি, সূর্য-চন্দ্রকে পূজা করতে লাগলো। কেউবা নিজের কল্পনায় বিভিন্ন ধরনের মূর্তি তৈরি করে পূজা করতে লাগলেন। সোজা কথায় মানুষের মনের কোণে লুকিয়ে থাকা ভয়-ভীতি থেকে ঈশ্বরের জন্ম হলো। ক্রমশ তৈরি হতে লাগলো মন্দির, মসজিদ, গির্জার মতন ধর্মীয় স্থান ও উপাসনালয়। পুরোহিত, পাদ্রী, মৌলবী -এর মতন লোকেরা মানুষের হাতে তৈরি ঈশ্বরের দালাল হলে গেলেন। আমার এক শ্রেণীর মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের দূত বা অবতার ঘোষনা করতে লাগলেন। তাঁরা দেবতা রূপে পূজিত হতে লাগলো। অন্য দিকে, এক প্রকারের ভন্ড -প্রতাকর কিছু লোকেরা নিজেকে ভবিষ্যত দ্রষ্টা বলে জহির করা শুরু করলো। সাধারন মানুষ নিজেকে ভূত, ভগবান, ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে জীবন কাটাতে লাগলেন।

কিন্তু এরই মধ্যে হতে গোনা কিছু মানুষ নতুন করে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করলেন। ভাবতে লাগলেন,”সত্যিই কি এই ঝড় -বৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ, মহামারী ইত্যাদির পেছনে কোনও অলৌকিক, দেব -দেবী বা ঈশ্বরের হাত আছে ?”

চিন্তার সঙ্গে শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী মানুষকে ক্রমশ বোঝাতে সক্ষম হয়েছে ,”প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী ইত্যাদির পেছনে কোনও অলৌকিক, ঈশ্বরের হাত নেই। ঈশ্বর বা অলৌকিক ঘটনা বলে বাস্তবে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে বিজ্ঞান ও যুক্তিযুক্ত কারণ আছে।

শুক্রবার ২২ মে ২০২০

অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হতে বিজ্ঞান আজ সাল ২০২০-এ পা রেখেছে। হাতে বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত স্মার্ট ফোন। ইন্টারনেট সংযুক্ত এই স্মার্ট ফোনের গুগুলে সার্চ করলে মুহুর্তের মধ্যে প্রতিদিন পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার খবর আমরা দেখতে পাই। কিন্তু দু'দিনে আগে যে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় আম্ফান এসে বিদ্যুৎ পরিসেবা, ইন্টারনেট, ফোন, কেবল টিভি -এর মতন আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। আমরা বুঝতে পারছি,”প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে মানুষকে আরও অনেক পথ হাঁটতে হবে। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আজও প্রকৃতির সামনে একেজো হয়ে যাচ্ছে। তাই বিজ্ঞানকে আরও বেশি বেশি করে উন্নতি করতে হবে। আরও বেশি করে বিজ্ঞানের উন্নতি সাধবে মানুষকে মনোযোগী ও সচেষ্ট হতে হবে। প্রকৃতির দুর্যোগের সময় বিদ্যুতের ও টিভি কেবল-এর তার ছিড়ে পড়ে। বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ে। এর ফলে দুর্যোগ প্রভাবিত এলাকা বিদ্যুৎহিন হয়ে পড়ে। সন্ধ্যার পর এলাকা অন্ধকারে ডুবে যায়। এই দুরবস্থা থেকে মোকাবিলা করতে মাটির নিচ দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট যোগাযোগ আরও অটুট রাখতে হবে যাতে দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো সম্ভব হয়।

শনিবার ২৩ মে ২০২০

প্রায় তিন দিন পর ইন্টারনেট ও ফোন চালু হলো। কিন্তু এখনো অনেক এলাকা বিদ্যুৎহীন। স্মার্ট ফোন কোনও মতন চার্জ করে অন করলাম। সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ঘূর্ণিঝড় অম্ফানের ভয়ঙ্কর তাণ্ডবের টুকরো টুকরো ছবি ভেসে উঠছে। কোথাও বা গাছপালা, ঘরবাড়ি মাটিতে গুড়িয়ে গেছে। কোথায় বা নদী বাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম জলের তলায় চলে গেছে। এর আগেও এই বাংলার বুকে আইলা, ফনী-এর মতন ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছিল। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু এই বার আম্ফাণ সব থেকে বেশি ক্ষতি করেছে।

ফেসবুকে দু -একটি পোস্ট চোখে পড়ে,”ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র তরফ থেকে একটি পোস্ট করে। তাতে লেখা আছে,”চিনে নিন এই ভন্ডদের ভবিষৎ বলতে পারে, দাবি করা জ্যোতিষীদের, একজন এই আম্ফান ঝড়ের আগাম পূর্বাভাস দেয়নি। এরা করোনা ভাইরাস নিয়েও কোনও ভবিষৎবাণী করেনি। এরা ভন্ড, এরা প্রতারক। জ্যোতিষ শাস্ত্র কোনও বিজ্ঞান নয়। যে যত বড় জ্যোতিষী সে ততো বড় প্রতারক।”

অন্য একটি পোস্ট চোখে পড়ে,”গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন,’এই ধরনীতে এমন সময় আসবে যখন মানুষ নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা শুরু করছে, তখন বুঝবেন কোনও ঈশ্বর নেই।”
সত্যি এই পোস্টগুলি ১০০ শতাংশ যুক্তিযুক্ত।

আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ের কয়েক মাস আগে করোনা ভাইরাসের মহামারী থেকে দেশের আমুষকে বাঁচাতে সরকার সতর্ক পদক্ষেপ নিয়ে লকডাউন ঘোষনা করে। সরকার জনগণকে এই বার্তা দিয়েছে,”করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে ঘরে থাকুন। খুব প্রয়োজন না হলে বাইরে বেরোবেন না। মুখে মাস্ক ঢেকে রাখুন। বারে-বারে সাবান ইত্যাদি দিয়ে হাত পরিষ্কার করুন। কোনও স্থানে ভিড় করবেন না। একে অপরের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলুন ইত্যাদি।”
সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হলো, করোনা ভাইরাসের হাতে থেকে লোকেরা বাড়ির ঢোকার আগেই ঈশ্বরের উপাসনা স্থান মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদির দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। এই ঘটনা এটি স্পষ্ট করে দিলো, কাল্পনিক ঈশ্বরের করোনা ভাইরাস বা কোনও ধরনের রোগ থেকে তাঁর অন্ধ ভক্তদের বাঁচানোর একটুকুও ক্ষমতা নেই। শুধু মাত্র বিজ্ঞানের আবিষ্কারই এই মহামারী থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে। এর পরের কিছু মুসলিম লোকজনকে মসজিদে নামাজ আদা করার জন্য ভিড় করছিলেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের চেষ্টায় মসজিদে নামাজ পড়া বন্ধ করা গেছে। হয়ত এখনও অনেক অন্ধবিশ্বাসী মানুষ এটা বুঝতে পারছেন না,”

যে কোনো ঈশ্বর, আল্লাহ, গড বা ভগবানের করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা নেই। ঈশ্বর সর্ব কালের সেরা গুজব। একমাত্র আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান রোগ থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে।”
এর মধে একটি পোস্ট বারে বারে চোখে পড়ছে,”একজন বৈজ্ঞানিক মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখে কিছু অনুসন্ধান করছেন। ওনার পেছনে ঈশ্বরের দালাল পুরোহিত, পাদ্রী, মৌলবী একযোগে অপেক্ষা করছেন। ধর্মের নামে, ঈশ্বরের নামে জন -সাধারণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া এই সব দালালরা ভালোমতন বুঝতে পারছেন,”ঈশ্বরের কোনও কিছুই করার ক্ষমতা নেই। ঈশ্বর একটি কল্পনা মাত্রা। সর্ব কালের সেরা গুজব। নিজেকে রক্ষা মানুষকেই করতে হবে। কারন ঈশ্বরের প্রয়াজন শেষ হয়ে এসেছে। নিজের প্রয়াজানে তৈরি করা ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে আসছে। তাই করোনা ভাইরাসের মহামারী শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।”
এতো কিছুর পরেও মূর্খ মানুষকে দেখা গেলো,”করোনা ভাইরাসের মহামারী থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পূজা আচ্ছা করতে। কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা আবার এমন বোকা -বোকা দাবি করেছেন, গোমূত্র খেলে নাকি করোনা ভাইরাস নষ্ট হয়ে যায়।”

করোনা ভাইরাস থেকে মানুষকে বাঁচাতে এখনও কোনও ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি। বৈজ্ঞানিকরা দিনরাত পরিশ্রম করছেন। আজও ক্যান্সার, এইডস-এর মতন রোগের আসুধ আবিষ্কার সম্ভব নয়নি। করোনা ভাইরাস আমাদের মাঝেই থেকে যাবে। এর থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে। কারণ শুধু মাত্র করোনা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করতে দীর্ঘদিন লকডাউন চলতে পারে না আমাদের মতন গরীব দেশ। গরীব মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য রোজগারের পথ বন্ধ করলে, অনেক মানুষ অনহারে মারা যাবে। তাই সরকারকে এই মারন রোগ থেকে দেশের মানুষের জন্য বিকল্প উপায় বের করতে হবে। সরকারকে সঠিক সময়ে চিকিৎসার ব্যাবস্থা করতে হবে। এর জন্য কোনও এই মহামারী নিয়ে শাসক এবং বিরোধী দলগুলোকে রাজনৈতিকভাবে এক ছাতার নিচে নেমে মানুষের প্রাণ বাঁচাতে উদ্যোগী হতে হবে। মহামারী নিয়ে নিজেদের মধ্যে দাড়ি টানাটানির রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

অন্য দিকে, জ্যোতিষীরা যারা দাবি করে আসছে যে তাঁরা নাকি শুধু মানুষই নয়, এই পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি ঘটনার আগাম ভবিষ্যতবাণী করতে পারেন। কিন্তু এমন একজন জ্যোতিষীকে দেখা গেলো না, যিনি নাকি এই ভবিষ্যতবাণী করেছেন,"এই বছর করোনা ভাইরাসের মহামারী দেখা দেবে। এই রোগে অসংখ্য মানুষ মারা যাবে। মহামারিকে রুখতে লকডাউন করা হবে।"অথবা কোনও জ্যোতিষী এটাও ভবিষ্যতবাণী করলেন না,"ঘূর্ণিঝড় আম্ফান এই বাংলার বুকে ভয়ঙ্কর তাণ্ডব চালাবে।"

না। জ্যোতিষী কেন, কেউ এই সব ঘটনার আগাম ভবিষ্যতবাণী করতে পারে না।

কিন্তু আবার এই প্রতারক জ্যোতিষীদের খপ্পরে পরে অনেক প্রতারিত হচ্ছেন। কেউবা জ্যোতিষীর কথায় ভয় পেয়ে আত্মহত্যাও করতে বাধ্য হন। এমনি একটি ঘটনা গত ২০ মে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে খবরের কিছু অংশ তুলে ধরছি।

"করোনা হতে পারে, জ্যোতিষীর নিদানে
শিলিগুড়িতে আত্মহত্যা ইঞ্জিনিয়ারের?

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের এক ইঞ্জিনিয়ারের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাঁর নাম শুভ্র নন্দী (৪১)। শহরের সংহতি মোড় এলাকায় তাঁর বাড়ি। তাঁর আত্মীয় ও স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, করোনায় আক্রান্ত হতে পারেন বলে ওই ইঞ্জিনিয়ারকে জানান এক জ্যোতিষী। ওই জ্যোতিষীর বিধান শোনার পর থেকেই ইঞ্জিনিয়ার মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। খুব সম্ভবত এ জন্যই তিনি গলয়া দড়ি দিয়ে

আত্মঘাতী হয়েছেন। পুলিস অবশ্য জানিয়েছে, ওই ঘটনা নিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার সমস্ত দিক গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ...।"

এই ঘটনা থেকে আপনিও স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, জ্যোতিষী কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে না। উল্টো আপনার সমস্যা ও চিন্তাকে বাড়িয়ে তুলবে। এখন আমি যদি আমার বাড়িতে ছাদে আম গাছ ভেঙে পড়ার ঘটনার পর যদি শনির দশা কাটাতে কোনও জ্যোতিষীর কাছে ছুটতাম। জ্যোতিষীর কথায় আমিও হয়তো ওই ইঞ্জিনিয়ার -এর মতন মানসিক দুঃচিন্তায় ডুবে যেতাম। কিন্তু এটা কোনও দিনও সম্ভব নয়। কারণ আমি এক যুক্তিবাদী। আমরা যুক্তিবাদীরা জ্যোতিষ শাস্ত্র এ বিশ্বাস করি না। গ্রহ- রত্ন, তাবিজ, কবজ, শনির দশা ইত্যাদিতে বিশ্বাস রাখি না। তাই আমার বাড়িতে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরেও আমি মানসিক ভাবে সুস্থ আছি। আমরা যুক্তিবাদীরা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলী,"যে যতো বড় জ্যোতিষী সে ততো বড় প্রতারক।"

রবিবার ২৪ মে ২০২০

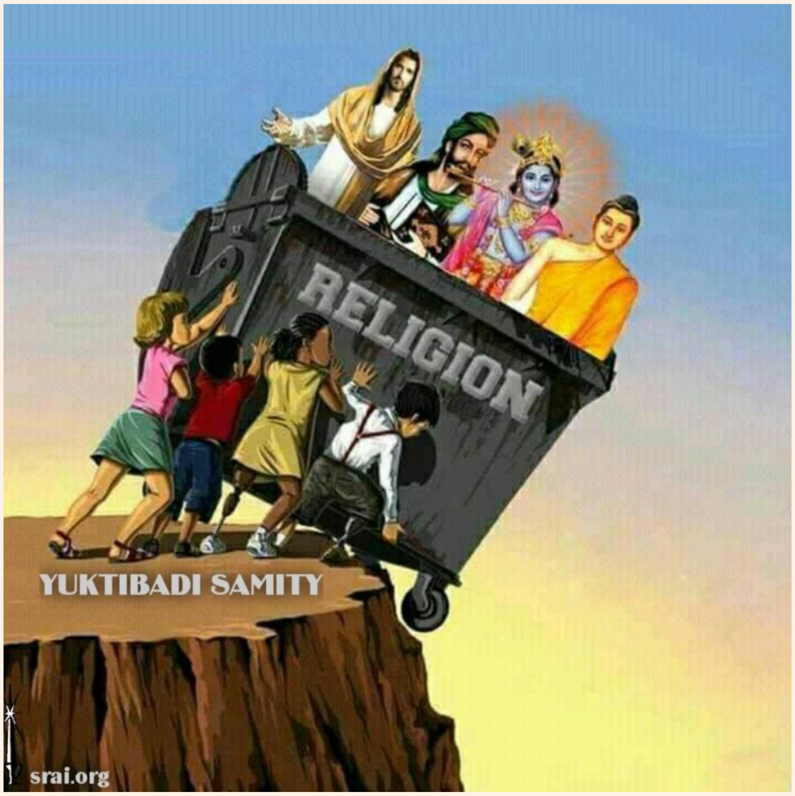

আবহাওয়া দফতর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কয়েকদিন আগেই সতর্ক করেছিল,"২০ মে ঘূর্ণিঝড় অ্যাম্ফাণ ওড়িশা এবং বাংলার সমুদ্র নিকটবর্তী জেলাগুলিতে আছড়ে পড়বে। তাই আগাম সতর্কতার জন্য অনেক মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবুও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে অনেক মানুষ মারা যায়। শুধু সর্তক করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। এই কারনে প্রাকৃতিক এই দুর্যোগের ফলে আজও অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ পরিসেবা স্বাভাবিক হয়েনি। জলের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। তাই মানুষেরা সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, এটা স্বাভাবিক। কারন আমরা যখন ভোট দিয়ে সরকার তৈরি করতে প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকি তখন এই এই মহামারী ও দুর্যোগের সময় জনগণকে সুরক্ষার দাইত্ব সরকারের উপর বর্তায়। কিন্তু যখন সরকার নিজের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয় তখন জনগণের ধার্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে।

আমরা যখন আগাম বুঝতে পারছি, অমুক তারিখে, তমুক এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আছরে পড়তে পারে, তখন আমাদের আরও বেশি সজাগ থাকতে হবে। সরকারকে তার জন সাধারণের সুরক্ষার আগাম ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী দিগুলোতেও আরও ঘূর্ণিঝড় আসতে পারে। এর হাত থেকে রক্ষা করতে সরকারের আর্থিক সহায়তা নিয়ে মজবুত বাড়ি তৈরি করতে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে

দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই গুলির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আরও বেশি উন্নতি করতে বিজ্ঞান গবেষণায় সরকারি বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহিত করে তাদের শুধু চাকরি করার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান কে উন্নতি সাধনে কাজে নিয়োজিত করতে হবে।

এই পৃথিবীতে আগামী দিনও আরও নতুন মহামারী, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি আসবে। এর থেকে মানুষকে বাঁচাতে এখন থেকেই সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে। সবশেষ যে কাল্পনিক ঈশ্বরের নামে বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে, ঈশ্বরের দালালকে পূণ্য লাভের উদ্দেশ্যে যে অর্থ ও শ্রম নষ্ট করেছেন, যেটা থেকে এবার দূরে আসার সময় চলে এসেছে। সত্যিকারের পূণ্য অর্জন করতে চান তাহলে মহামারী বা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণে রূপে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদির মতন ধর্মীয় স্থানে টাকা নয়ছয় না করে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের জন্য অর্থ দান করুন। ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে জ থেকে নিজের যুক্তি মনস্ক মানুষ হয়ে উঠুন। তবেই আমরা এই সুন্দর ধরনীতে মাথা উচু করে সুস্থ ও সুন্দর ভাবে বাঁচতে পারবো।

দুবরাজপুর গ্রামে ডাইনি হত্যাকান্ডের নেপথ্যে জানগুরুর ষড়যন্ত্র

=সন্তোষ শর্মা

বুধবার ১৭ অক্টোবর ২০১২

দেবী পক্ষের সূচনা হয়ে গেছে । দুদিন পর মহাসপ্তমী । বাড়ির কাছে মৃৎশিল্পী গন্ধীপালের দোকানে দুর্গা প্রতিমা নিতে আসা লোকেদের ভিড় । ঢাক , ঢোল , কাঁসার , ঘন্টা বাজিয়ে গাড়ি ও ভ্যানে করে বিভিন্ন আকৃতির প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছি । এমন সময় ' ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সভাপতি প্রবীর ঘোষ আমাকে ফোন করে বললেন , " সন্তোষ শর্মা তুমি তো পেশায় সাংবাদিক । কলকাতায় হিন্দি দৈনিক বিশ্বমিত্র পত্রিকায় সাংবাদিকতা করো। আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির জন্য এখনি একটি গুরুতবপূর্ণ খবর সংগ্রহ করে দিলে ভালো হতো ।

আমি বললাম , "আমি সাংবাদিক হলেও যুক্তিবাদী আন্দোলনের এক জন সহযোদ্ধা । বলুন কোন খবর সংগ্রহ করতে হবে ? "

ঘোষ বাবু বললেন , "নৃশংস হত্যার ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুরের দুবরাজপুর গ্রামে ঘটেছে । তিন জন মহিলাকে হত্যা করে তাঁদের লাশ কংসাবতীর চরে পুঁতে দেওয়া হয় । পুলিশ এই লাশগুলিকে নদী চর থেকে বের করছে । তুমি সাংবাদিক হিসবে পুলিশ থেকে এই খবর সংগ্রহ করে দাও এই হত্যার পেছনে ডাইনি অপবাদ আছে কি না ? যদি ডাইনি অপবাদে এই বর্বর হত্যার ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে সেটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় । আমরা যুক্তিবাদীরের এই হত্যার ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে তাঁদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়ান জন্য আন্দোলন শুরু করবো ।"

"ঠিক আছে । আমি এখনই ঘটনার কথা জানার চেষ্টা করছি । এই বলে আমি দাশপুর থানায় ফোন করলাম । খবর পেলাম , " ডাইনি অপবাদে মা ও মেয়ে সহ তিনজনকে খুন করা হয় "

কি আশ্চার্য ! হিন্দু ধর্মে মহিলাকে দেবী রূপে পূজা করা হয় । কিন্তু আজ দেবীপক্ষের মধ্যেই মা ও মেয়ে সহ তিন মহিলাকে পিটিয়ে খুন করা হল । খুন করার আগে তাঁদের নগ্ন করা হয়েছিল প্রকাশ্যে । তাঁদের হত্যা করার পর দেহগুলি নদীর চরে পুঁতে দেওয়া হয় । শারদ উৎসবের আজ মহাচাতুর্থীতে পশ্চিমবঙ্গ নৃশংস ডাইনি হত্যার কলঙ্কিত হয়ে গেল । এই বর্বর ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকমার দাশপুর থানার দুবরাজপুর গ্রামের ।

এই নৃশংস ডাইনি হত্যার বিস্তারিত খবর সংগ্রহ আমার পত্রিকার জন্যও সংগ্রহ করলাম। এবং প্রবীর বাবুকেও খবরটি দিলাম ।

ডাইনি অপবাদে এই নৃশংস হত্যার ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানবে যুক্তিবাদী সমিতি'র ঘাটাল শাখা । এই শাখার সম্পদক দেবব্রতের সঙ্গে আমার পত্রিকা অফিস থেকে ফোনে যোগাযোগ করলাম । সে জানাল , " গড়বেতার আনন্দপুরের বাসিন্দা এক জানগুরুরই দুবরাজপু গ্রামের একই পরিবারে মা ও মেয়ে সহ তিন মহিলাকে ডাইনি অপবাদ দেয় । জানগুরুর কথায়, " ওই তিন মহিলা । তাঁরা ' ডাইনি বিদ্যা'র সাহায্যে গ্রামের লোকজনকে অসুস্থ করছে । গ্রামে রোগ ও মহামারী ছড়াচ্ছে । তাই গ্রামের মানুষকে বাঁচাতে এই তিন ডাইনিকে মেরে ফেলে"

এদিকে ডাইনি অপবাদে একই পরিবারের তিন মহিলাকে হত্যা করার ঘটনার পর গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । পুলিশ ধরপাকড় শুরু করেছে । এরই মধ্যে ৭জনকে পুলিশ আটক করেছে । বাকিদের ধরতে পুলিশের তল্লাশি চালায় ।

'২৪ ঘন্টা , নিউজ টাইম' -এ যুক্তিবাদীদের বক্তব্য প্রচার করা হয় ।

প্রায় এক বছর হল বাংলায় শাসকদলের পরিবর্তন হয়েছে । কিন্তু দুঃখের কথা, এই বঙ্গে ডাইনি অপবাদে নিরীহ মহুলাদের উপর আমানবিয়া অত্যাচার , সমাজ থেকে বহিষ্কার , হত্যার মতন ঘটনা আজ সমাজের বুকে কলঙ্ক হয়ে আছে । মানুষের মন থেকে ডাইনির মতন অন্ধবিশ্বাস কবে দূর হবে ?

বৃস্পতিবার ১৮ অক্টোবর ২০১২

কলকাতা থেকে প্রকাশিত বেশিরভাগ নিউজ পেপারে দুবরাজপুর গ্রামে 'ডাইনি অপবাদে তিন মহলার হত্যা'র খবর প্রথম পৃষ্ঠায় দিনের সব থেকে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ খবর রূপে প্রকাশ করা হয়েছে ।"দৈনিক বিশ্বমিত্র, প্রভাত বার্তা, সন্মার্গ, আনন্দবাজার পত্রিকা , এই সময়, একদিন ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর নিউজ পেপারে ' ডাইনি অপবাদে খুন, গ্রেপ্তার সাত' খবর ছাপা হয়েছে ।

পাঠকের সুবিধার্থে 'এই সময়' খবরে কাগজে লিড নিউজ

এই সময়

বর্বরতায় ক্ষতবিক্ষত বাংলা

ডাইনি অপবাদে খুন
মা-মেয়ে সহ ৩ জন

রূপে প্রকাশিত খবর তুলে ধরেছি ।

"বর্বর্তায় ক্ষতবিক্ষত বাংলা"

ডাইনি অপবাদে খুন মা - মেয়ে সহ ৩

এই সময় , ঝাড়গ্রাম : দেবীপক্ষের মধ্যেই মা ও মেয়ে - সহ তিন মহিলাকে ডাইনি অপবাদে পিটিয়ে খুন করা হল । ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের দুবরাজপুর গ্রামে। খুন করার আগে তাঁদের নগ্ন করা হয়েছিল প্রকাশ্যে । বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে খুনের পর দেহগুলি কংসাবতি চরে পুঁতে রাখা হয় । বুধবার গ্রামে পৌঁছে পুলিশ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করেছে । এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । পুলিশ যাওয়ার খবর পেয়ে দুবরাজপুর গ্রাম এখন পুরুষশূন্য ।

মৃত্যু তিন জনের মধ্যে ফুলমণি সিং (৬০) ও সোমবারি সিং (৪০) সম্পর্কে মা - মেয়ে। তাঁরা দুবরাজপুরের বাসিন্দা । অন্য জনের নাম ও সোমবারি সিং (৫০) । তিনি পাশেই হরিরাজপুরে থাকতেন । তিনি সম্পর্কে অপর সোমবারির ননদ । তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এলাকায় ইদানিং যে ভাবে রোগ ছড়াচ্ছে তার জন্য ওঁরাই দায়ি । তাঁদের উপর ডাইনি ভর করেছে ।

মঙ্গলবার রাতে দুবরাজপুরে সালিশি সভা বসিয়ে ওই তিন জনকেই ডেকে পাঠানো হয় । সভাটি বসে স্থানীয় মাতব্বর বাবলু সিংয়ের বাড়িতে । সেখান থেকে তাঁদের পাশের স্কুলের মাঠে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে মারধর করে শুরু হয় । ফুলমণি সিংয়ের নাতি ভরসা ওরফে বোধু সিং পুলিশকে জানিয়েছে , মাতব্বররা তাঁর মা - দিদিকে ও পিসিকে সবার সামনে নগ্ন করে তাঁদের শ্লীতাহানি করেন । শেষে লাঠি দিয়ে পেটানো শুরু হয় । সেই আঘাত সহ্য করতে না - পেরে ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয় । উপস্থিত জনতা তখন মৃতদেহ তিনটি নিয়ে কংসাবতীর চরে মাটিতে পুঁতে দেয় । ভরসা সিং তখন ভয়ে পালিয়ে গেয়েছিলন ।

থানায় কেউ অভিযোগ না জানলেও , পুলিশ খবর পেয়ে বুধবার সেখানে পৌঁছায় । মৃতদেয়গুলি মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করে । মৃতদেহগুলি ময়না - তদন্তের পাশাপাশি গ্রামে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ । পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরী জানিয়েছেন , " সাত জনকে গ্রেফতার করা গিয়েছে । আরও কারা ওই হত্যাকাণ্ডে জড়িত তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে । গ্রামীন কুসংস্কারই খুনের কারণ "

পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেড়েছে , "মৃত্যু তিন মহিলার উপর প্রায় পাঁচ মাস আগে থেকেই কুনজরে ছিল গ্রামের মাতব্বরদের। সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য জিতেন সুং মাথায় টিউমার হওয়ার কারণে মারা যাওয়ার পর থেকেই গ্রামে অশুভ শক্তির প্রতিনিধি হিসাবে মা -মেয়েকে চিহ্নিত করেছিলেন তাঁরা । এই মাতব্বরদের মধ্যে

বাবলু সিং, ধোবি সিং, লালু সিং, নীলু সিং প্রমুখ কয়েক জনের নামও পুলিশ পেয়েছে। তাঁরা ওই মহিলাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। পঞ্চায়েত সদস্যের মৃত্যুর জন্য ওই মা - মেয়েকে দায়ী করে তাঁদের ডাইনি বলে চিহ্নিত করেছিল তারা। তখন থেকে মাঝেমাঝেই গ্রামে বিচারসভা বসিয়ে ওঁদের শাস্তি দেওয়ার হুমকি দেওয়া হত। দুবরাজপুর গ্রামে দিন পনেরো আগে আরও একটি সালিশি সভা বসিয়ে জানগুরুর নির্দেশের

অজুহাতে মা ও মেয়ের কাছ থেকে ৬৫ হাজার টাকা দাবি করে হয়। দিনমজুরি করে তাঁদের সংসার চলে। তাঁরা মাতব্বরদের জানান , টাকাটা কিছু দিনের পরে দেবেন। এখনই ওই টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। এর পর থেকে তাঁদের উপর রাগ আরও বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে হরিরাজপুরের মাতব্বররাও সেখানকার সোমবারিকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে প্রচার শুরু করেন। তার পর দুই গ্রামের মাতব্বরেরা এক হয়ে গড়বেতায় এক জানগুরুর দ্বারস্ত হয়েছিলেন। ওই গুনিন তিন মহিলার কোনও দোষ দেখতে না - পেলেও , তাতে কান না - দিয়ে বর্বরোচিত হত্যাকান্ডটি ঘটিয়েছেন তাঁরা।

পুলিশ গ্রামে যেতেই পুরুষরা ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালায়। ভরসা সিং তাঁর দিদিমা, মা ও পিসির মৃতদেহ সনাক্ত করেন। ঘাটালের ডেপুটি - ম্যাজিস্ট্রেট অমিতাভ সরকারের উপস্থিতিতে মৃতদেহগুলি তোলা হয়। তৃণমূলের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সভাপতি দীনেন রায় এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করার জন্য পুলিশকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, "অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও মর্মান্তিক ঘটনা। সামাজিক সচেতনতা যে এখনও সৃষ্টি করা যায়নি , এই হত্যাকাণ্ড তার প্রমান।

এদিনে এই ঘটনার পর দুবরাজপু গ্রামে রয়েছে চরম উত্তেজনা। নুতন করে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না - ছড়ায়, সেজন্য এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ পিকেটিং।

এর আগেও দাশপুর এলাকায় ডাইনি অপবাদে মেরে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। শুধু দাশপুর নয়, ডাইনি অপবাদে ডেবরাতেও খুনের ঘটনা ঘটছে। কুসংস্কার এড়াতে আদিবাসী গ্রামে সচেতনতা শিবির করার দাবি বারবার উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরী বলেন, "গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এর জন্য প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

দুবরাজপুরে ডাইনি অপবাদে মা- মেয়ে সহ তিন মহিলার নৃশংস হত্যার ঘটনায় অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়ার দাবি যুক্তিবাদী সমিতি থেকে শুরু করে লেখক - লেখিকা, বুদ্ধিজীবিরা, বিভিন মহিলা সংগঠনগুলি করছেন।

বিশিষ্ট লেখিকা ও বুদ্ধিজীবী মহাশ্বেতা দেবীও দুবরাজপুর গ্রামে একই পরিবারের তিন মহিলাকে ডাইনি অপবাদে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়ে রাজ্যের ডিজি সুরজিৎ পুরকায়স্থ এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরীকে ফোন করেন ।

মহেশ্বেতা দেবী বলেন, "এই ২১ শতকেও ডাইনি অপবাদে হত্যার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় । "তিনি বলেন, "গ্রামে সালিশি সভাতে কোনও গিনিনের নির্দেশে এই ধরনের নৃশংস ঘটনা ঘটে থাকে। কিন্তু পুলিশ এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারে না, এত আশ্চর্যের বিষয়।"

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির এক প্রতিনিধি দল রাইটার্স বিল্ডিংয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিব বাসুদেব আচার্য এর সঙ্গে দেখা করতে যান । সমিতির নেত্রী কুমকুম চক্রবর্তী বলেন, "দেবরাজপুর গ্রামে ডাইনি অপবাদে তিন মহিলাকে নৃশংস হত্যার ঘটনায় উপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের কড়া শাস্তির দেওয়া হোক ।" তিনি বলেন, "এর আগেও রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে । কিন্তু ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তি না হওয়ার জন্য মাতব্বরদের মনোবল আরও বেড়ে গেছে । যদি রাজ্য সরকার কোনও কঠোর পদক্ষেপ না নেয় তাহলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারন করতে পারে।"

এই ডাইনি হত্যাকান্ড মিডিয়াতে খবরের শিরোনামে উঠে আছে । কলকাতা থেকে প্রকাশিত হিন্দি দৈনিক 'ছাপতে ছাপতে' এর সাব-এডিটর বিজয় শংকর বিকুজ আমাকে ফোন করে বললেন, "তুমি যুক্তিবাদী সমিতি'র কর্মকর্তা। তোমাদের কাছে এই তথ্য বা পরিসংখান আছে, এই বাংলায় গত ১০ বছরে ডাইনি অপবাদে হত্যা বা অত্যাচারের কয়টি ঘটনা ঘটেছে?"

NODE-7D//DANISH//19.10.2012 (2)

डायन बताकर तीन महिलाओं की हत्या मामला

महाश्वेता देवी ने की आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग

दिन–दहाड़े पीटकर मारने के आरोप में ११ गिरफ्तार

पश्चिम मिदनापुर, १८ अक्टूबर (नि.प्र.)। वरिष्ठ लेखिका, समाजसेवी महाश्वेता देवी ने पश्चिम मिदनापुर जिले के दुबराजपुर थाने के दासपुर गांव में डायन करार देकर एक ही परिवार की मां–बेटी तथा एक और महिला को नंगा करके पीट–पीटकर मार डालने की घटना की तीव्र निंदा की है। उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील चौधरी तथा राज्य के पुलिस महानिरीक्षक (कानून–व्यवस्था) सुरजीत कर पुरकास्थ को फोन करके इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। महाश्वेता देवी ने कहा कि २१वीं शताब्दी में इस तरह की घटना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि गांव की सालिसी सभा में किसी 'गुरु' के निर्देश पर इस तरह की हैवानित होती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, यह आश्चर्यजनक है। इधर इस घटना में अब तक कुल ११ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ७ गिरफ्तारियां कल तक हुई थीं जबकि आज ४ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिन–दहाड़े हुई ३ महिलाओं की हत्या की खबर पाकर पुलिस की दबिश बढ़ने के कारण पूरे गांव के पुरुष घर छोड़कर भाग गये हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि माकपा पंचायत सदस्य जितेन सिंह की सिर में ट्यूमर हो जाने से कुछ दिन पूर्व मृत्यु हो गयी। इसके बाद गांव के कुछ दबंगों ने खबर फैला दी कि फूलमनी सिंह (६०), उसकी बेटी सोमवारी सिंह (४०) तथा उसकी रिश्तेदार सोमवारी सिंह (५०) डायन है। इन्हीं के कृत्यों से जितेन की मौत हो गयी है। इस पर गांव की सालिसी सभा बैठी जिसने तीनों महिलाओं पर ६५ हजार रुपए का जुर्माना लगाया। रोज कमाने और खाने वाली इन महिलाओं ने जब इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई तो इनकी पीटकर हत्या करने का फैसला। पुलिस को इस सिलसिले में गांव के कुछ दबंगों के नाम का पता चला है। इनके नाम बबलू सिंह, धोबी सिंह, लालू सिंह तथा नीलू सिंह हैं। इधर गत दिवस कंसावती नदी के किनारे से तीनों महिलाओं के शव कब्र से घाटाल के डिप्टी मजिस्टेट अमिताभ सरकार की मौजूदगी में निकाले गये। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इधर पश्चिम मिदनापुर के दासपुर में कल डायन के संदेह में तीन महिलाओं की हत्या की घटना को लेकर आज पश्चिम बग गणतांत्रिक महिला समिति की सदस्याओं ने राइटर्स बिल्डिंग पहुंचकर राज्य के गृह सचिव वासुदेव बनर्जी से मिलना चाहा। हालांकि व्यस्तता के कारण वे लोग गृह सचिव से नहीं मिल पायी। बाद में समिति की कुमकुम चक्रवर्ती ने बताया कि यह बर्बरता है और इसकी जांच होनी चाहिए तथा दोषियों को कड़ी–कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी राज्य में इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं लेकिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले का वहशीपन जारी है। राज्य सरकार अगर ठोस कदम नहीं उठाती है, तो हालात और भी बिगड़ जायेंगे। मालूम रहे कि कल दासपुर में डायन के संदेह में लोगों ने तीन महिलाओं की पीट कर हत्या कर दी थी।

NODE-7D//DANISH//19.10.2012 (2)

আমি জানালাম, "ভারতে ডাইনি অপবাদ দিয়ে প্রতি বছর প্রায় ২০০ নারীকে হত্যা করা হয়। রুরাল লিটিগেশন অ্যান্ড এনটাইটলমেন্টস এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমীক্ষায় (আরএলইকে)-এ তথ্য জানানো হয় । সাল ২০১২ রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্যে অনুযায়ী সাল ১৯৯১ থেকে ২০১০ এর মধ্যে

শুধুমাত্র ভারতে প্রায় ১৭০০ নারীকে হত্যা করা হয়েছে ডাইনি অপবাদে । ভারতের প্রধানত রাজস্থান , ঝাড়খন্ড , ওড়িশা, ছত্তিশগড়, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে এই ডাইনি হত্যার ঘটনা ঘটে । এছাড়াও আরো প্রায় ১১ টি রাজ্যে ডাইনি অপবাদে হত্যালীলা চলছে । পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া , বাঁকুড়া , মেদিনীপুর জেলাতেও চলছে এই নারী হত্যা । পুলিশ-প্রশাসন , সরকার এই ধরনের কুসংস্কার প্রতিরোধে কড়া পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ ।"

আরও বললাম, "আমাদের এই বাংলায় ডাইনি অপবাদে হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি সম্পর্কিত ঘটনার কোনও সঠিক পরিসংখান সরকারের কাছে নেয় । কিন্তু ডাইনি অপবাদে দুবরাজপুর গ্রামের মতন হত্যার ঘটনা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আজও ঘটে চলেছে । ডাইনি অপবাদে এই ধরণের ঘটনা বন্ধ করতে রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার আজও কোনও আইন তৈরি করেনি । কারণ, সরকার এটা দেখতে চায় রাজ্যে ডাইনি অপবাদে কোনও ধরনের হত্যা বা অত্যাচারের ঘটনা ঘটে না । এই বাংলায় ডাইনি বিরোধী আইনি নেই । এমন অবস্থায় যদি কোথাও ডাইনি অপবাদে হত্যা বা অত্যাচারের ঘটনা ঘটে তখন সেই ঘটনায় পুলিশ মামলা রুজু করার সময় 'ডাইনি' এই শব্দটি উল্লেখ করে না । তাই সরকারের কাছে ডাইনি অবপাদ সম্পর্কিত কোনও পরিসংখান নেই । কিন্তু আমার যুক্তিবাদীরা এটা দেখেছি প্রতি বছর রাজ্যের কোথাও না কোথাও ডাইনি অপবাদে অত্যাচারের ঘটনা ঘটে চলেছে । শাসক বা বিরোধী দল ভোট ব্যাংকদের রাজনীতির কথা মাথায় রেখে বিশেষ মুখ খোলে না । শুধুমাত্র যুক্তিবাদী সমিতি'র আন্দোলনের ফলে আজ রাজ্যে ডাইনি অপবাদে অত্যাচারের ঘটনা অনেকটা কমেছে।"

পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা হাওড়া হুগলি

‘ডাইনি’ খুনে অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

EiSamay.Com | Updated: 19 Oct 2012, 12:12:00 PM

ডাইনি অপবাদে তিন মহিলাকে খুনের ঘটনায় ধৃতদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল ঘাটাল মহকুমা আদাল...

ঝাড়গ্রাম: ডাইনি অপবাদে তিন মহিলাকে খুনের ঘটনায় ধৃতদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল ঘাটাল মহকুমা আদালত। তবে জানগুরু-সহ বাকিরা এখনও পলাতক। মঙ্গলবার রাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের দুবরাজপুর গ্রামে সালিশি সভা বসিয়ে ‘ডাইনি’ চিহ্নিত করা হয় তিন মহিলাকে। এর পর সকলের সামনে নগ্ন করে তাঁদের লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। তা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু হয় তিন জনের। এর পর তিন জনেরই দেহ কংসাবতীর চরে পুঁতে দেয় গ্রামবাসীরা। ঘটনার জেরে পুলিশ গ্রামে পৌঁছে সাত জনকে গ্রেফতার করে। গোটা গ্রামটাই এই মুহূর্তে

এদিকে দুবরাজপুর গ্রামে ডাইনি অপবাদে তিন মহিলাকে খুনের ঘটনায় ধৃতদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল ঘাটাল মহকুমা আদালত । তবে জানগুরু-সহ বাকিরা এখনও পলাতক ।

শুক্রবার ১৯ অক্টোবর ২০১২

দুবরাজপুর ডাইনি হত্যাকান্ড নিয়ে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার অভিযুক্তদের আদালত যে নির্দেশ দিয়েছে এই খবরটি গুরুর সহকারে বিভিন্ন নিউজ পেপারে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে এই সময় পত্রিকায় প্রকাশিত খবর তুলে ধরছি ।

‘ডাইনি’ খুনে অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

ডাইনি অপবাদে তিন মহিলাকে খুনের ঘটনায় ধৃতদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল ঘাটাল মহকুমা আদালত। তবে জানগুরু-সহ বাকিরা এখনও পলাতক ।

ঝাড়গ্রাম : ডাইনি অপবাদে তিন মহিলাকে খুনের ঘটনায় ধৃতদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল ঘাটাল মহকুমা আদালত । তবে জানগুরু - সহ বাকিরা এখনও পলাতক । মঙ্গলবার রাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের দুবরাজপুর গ্রামে সালিশি সভা বসিয়ে 'ডাইনি' চিহ্নিত করা হয় তিন মহিলাকে। এর পর সকলের সামনে নগ্ন করে তাঁদের লাঠি দিয়ে পেটানো হয় । তা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু হয় তিন জনের । এর পর তিন জনেরই দেহ কংসাবতীর চরে পুঁতে দেয় গ্রামবাসীরা। ঘটনার জেরে পুলিশ গ্রামে পৌঁছে সাত জনকে গ্রেফতার করে । গোটা গ্রামটাই এই মুহূর্তে পুরুষশূন্য । বৃহস্পতিবার সকালে ধৃতদের ঘাটাল মহকুমা আদালতে তোলা হয় । ধৃত সাত জনের জবানবন্দি নেয় আদালত । বিচারক ওই সাত জনকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন ।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বরুণ চন্দ্রশেখর বলেন, 'গত কাল রাতেও গ্রামে অভিযান চালিয়েছিলাম । জানগুরু - সহ অন্য অভিযুক্তরা পলাতক। পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে।'

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র ঘাটাল শাখার কর্মীরা গিয়েছিলেন গ্রামে। ঘাটাল শাখার সম্পাদক দেবব্রত জানায়, 'আমাদের কর্মীরা ওই গ্রামে গিয়েছিলেন । কিন্তু কেউ মুখ খুলছে না । দাসপুর থানায় অভিযোগ করতে গেলে, আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় । '

ঘটনার কড়া নিন্দা করে দেবব্রতবাবু জানান, 'আমরা প্রতি বছর পুজোর সময় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক প্রচার করি । এ বার দুবরাজপুর গ্রামেও সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালানো হবে।"

পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মূলত

আদিবাসী সমাজে ' ডাইনি বিশ্বাস ' এক ক্ষতিকারক রূপে আজও আবদ্ধ । এই সমাজে 'ডাইনি বিশ্বাস ' এক নিদারুণ অভিশাপের মতো । এইজন্য আজও অনেক নিরীহ মহিলা অত্যাচারিত বা খুন হচ্ছেন । বলতে লজ্জা হয় আজ যেখানে বিজ্ঞান অগ্রগতি করছে সেখানে আদিবাসী সমাজ ডাইনীর মত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে ডুবে রয়েছে । এই কারণে প্রায়শই আমরা দেখি বিভিন্ন পত্র- পত্রিকা থেকে খবরের চ্যানেল গুলোতে খবরের শিরোনামে উঠা আসে ডাইনি অপবাদ দিয়ে কোনো অসহায় মহিলার ওপরে অমানবিক অত্যাচার । কখনো বা সামাজিক বয়কট অথবা নিরপরাধ মহিলাকে শুধু ডাইনি অপবাদে জ্যন্ত পুড়িয়ে মারা বা নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনা ।

সকালে যুক্তিবাদী সমিতি'র ঘাটাল শাখার দেবব্রত ও সদস্যরা আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলো, "দেবরাজপুর গ্রামে তিন মহিলাকে নৃশংসভাবে যারা হত্যা করেছে তাঁদের মধ্যে কে সবথেকে অপরাধী ? কেন আজও সমাজে ডাইনি অপবাদে বিশেষকরে মহিলাদের উপর অত্যাচার চলছে? ডাইনি বলে সত্যিই কি কিছু আছে কি না?"

আমি বললাম, "এই প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে কিছু কথা বলছি, মন দিয়ে শোন"

ডাইনি ও ডাইনি - বিদ্যা :

আদিবাসী সমাজে ডাইনি এবং ডাইনি - বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক অকল্পনীয় ও অলৌকিক ক্ষমতা বিশ্বাস রয়েছে। এই সমাজে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মানুষের বিশ্বাস, ডাইনি অতি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। ডাইনি অর্থাৎ অশরীরী অলৌকিক ক্ষমতা ধারী কোন মহিলা । ডাইনির কুদৃষ্টিতে শুধু পশু পাখি নয়, যেকোনো মানুষের মৃত্যু হতে পারে । ডাইনি তার ডাইনি -বিদ্যার সাহায্যে কোন পশু বা মানুষের শরীরে রোগ জীবাণু ঢুকিয়ে দিতে পারে।

ডাইনিদের সম্বন্ধে বলা আছে তারা অমাবস্যার নিশুতি রাতের কোন নির্জন গ্রামে উলঙ্গ হয়ে। খাড়া ঝাঁটার কাঠি দিয়ে কোমর বন্ধনী করে তৈরি করে নৃত্য করে। ঝাঁটার উপর বসে নিশুতি রাতে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে উড়ে যেতে পারে । ডাইনি-বিদ্যা গুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা। ডাইনি তার ডাইনি-বিদ্যা বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোন যুবতী বা কিশোরীকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করে। তাকে ডাইনি-বিদ্যা বা মানুষ মারার বিদ্যায় দীক্ষিত করে। এরপর ডাইনি বিদ্যায় দীক্ষিত শিষ্যকে তার গুরুমা কঠিন পরীক্ষা নেন। পরীক্ষায় এর জন্য শিষ্যকে ডাইনি-বিদ্যা প্রয়োগ করে তার কোনও প্রিয়জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার জন্য বলা হয়। শিষ্য যদি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তবেই সে ডাইনি বিদ্যায় সম্পূর্ণ ভাবে দীক্ষিত হয় ।

ওঝা, মাঝি, সখা ও জানগুরু :

আদিবাসী সমাজে ওঝা, মাঝি, সখা ও জানগুরুকে দেবতার মত পূজা করা হয়। এই গুরুর নির্দেশ আদিবাসী লোকেরা মেনে চলেন। এই আদিবাসী গুনিন বা গুরুরা তুকতাক, যাদুটোনা, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি করতে পারেন। অলৌকিক শক্তি ও রোগ নিরাময়ের জন্য মন্ত্র -তন্ত্র প্রয়োগ করে। সখা গ্রামের মানুষের অমঙ্গল, অসুখ -বিসুখ দূর করার চেষ্টা করে । ওঝা তুকতাক ঝাড়ফুঁক বিদ্যা জানে । গ্রামের কারুর অমঙ্গল হলে সখা গুন করে বলে দেয় কে ডাইনি । সখার মত জানগুরুও ডাইনি চিহ্নিত করেন ।

ডাইনি চিহ্নিতকরণ :

কোনও গ্রামে যদি দেখা যায় পরপর কোনও পশুর মৃত্যু হচ্ছে অথবা কোনও রুগী চিকিৎসক করেও সুস্থ হচ্ছে না । এরজন্য ঐ গ্রামের আদিবাদী লোকেরা কোনও মহিলার উপর এ সন্দেহ করেন । আরও সন্দেহ , ওই মহিলা

ডাইনি এবং তার ডাইনি -বিদ্যার জন্য পশুর মৃত্যু হচ্ছে অথবা কারো রোগ ঠিক হচ্ছে না। সন্দেহের ভিত্তিতে ঐ মহিলাকে ওঝা বা জানগুরুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ওঝা বা জানগুরুর নির্দেশে সেই মহিলাকে জুতো বা চামড়া শুকানো হয়। এছাড়া লঙ্কা পোড়ার গন্ধ শুখানো হয়। এই সমাজের বিশ্বাস, চামড়া বা লঙ্কা পোড়া গন্ধে যদি ওই মহিলা অস্বাভাবিক আচরণ না করে তাহলে বুঝতে হবে সেই ডাইনি । এর পর ওঝা, জানগুরু বা গুণিন ওই মহিলার উপর ডাইনি অপবাদ দেয়। ডাইনি বিদ্যা নষ্ট করা জন্য অভিযুক্তকে মানুষের বৃষ্ঠা, মুরগির রক্ত খাবানো হয়। তাকে গ্রাম ও সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানা করা হয়। ডাইনি অপবাদে পরে যদি জানগুরু জরিমানা করে তাহলে সেই জরিমানা তাকে দিতেই হবে। এই জন্য তাকে নিজের জমি -জামা, গাই -বাছুর বিক্রি করতে হয় । যদি জরিমানা না দিতে পারে তাহলে ডাইনি অপবাদে মহিলাকে আরো পিটিয়ে বা পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়।

ডাইনি বিরোধী আন্দোলন :

আদিবাসী সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা কাজ করতে শারীরিক ভাবে অক্ষম অথবা বয়স্ক ব্যক্তির কোনও অসুখ হলে চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে পারছে না । কিন্তু তাঁদের জমি-জমা আছে । এমন মানুষকে ডাইনি অপবাদ দেওয়া হয় । তার যাবতীয় সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয় । ডাইনি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্ধবিশ্বাস । কিন্তু ডাইনি বলে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করতে পারলে লাভবান ওঝা, সখা বা জানগুরু হবে। ডাইনি অপবাদে বিতাড়িত মহিলার ঘর বাড়ির সম্পত্তি লুটে নেবে ও জানগুরু বা গ্রামের মাতব্বররা । অসহায় নিরক্ষর গরিব আদিবাসী মানুষের বাড়িঘর, সম্পত্তির কেড়ে নেবার জন্য একটা বড় ষড়যন্ত্র তৈরি করা হয় । এই ডাইনির অপবাদে মাধ্যমে ওঝা বা জানগুরু স্বার্থসিদ্ধি করে থাকে । অভিযোগ , আদিবাসী সমাজে ওঝা , জানগুরুর সঙ্গে স্থানীয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাঁথ গাঠ থাকে । এই কারণে অসহায় মহিলাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে মারার নির্দেশ দিলেও অভিযুক্ত ওঝা, জানগুরুর বিরুদ্ধে শাসক দল সরকার বা প্রশাসন নীরব থাকে ।

ডাইনির অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তির উপায় :

ডাইনি অপবাদে নারীহত্যার পিছনে রয়েছে ডাইনি এবং জানগুরুর অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস । এই অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তির জন্য আদিবাসী । মানুষগুলোকে বোঝাতে হবে ডাইনি বা জানগুরুর কোন অলৌকিক ক্ষমতা । ওঝা বা জানগুরু কিভাবে ডাইনি চিহ্নিত করে তার পেছনে যুক্তিযুক্ত কারণ গুলো 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান বা নাটক করে বোঝাতে হবে। আদিবাসী মানুষের মাঝে গিয়ে বোঝাতে হবে মানুষ এবং পশুদের বিভিন্ন রোগ এর কারন এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক গুলো । বোঝাতে হবে, অলৌকিক চিকিৎসা ঝাড়ফুঁক, তেলপড়া, মন্ত্র দিয়ে রোগ সারানো যায় না । যদি কোনও রোগ হয় তাহলে চিকিৎসার জন্য

ওঝা বা জানগুরুর কাছে না গিয়ে সরকারি হাসপাতাল যান । তন্ত্র - মন্ত্র দিয়ে কোন রোগের চিকিৎসা করা আইনত অপরাধ । মানুষকে বোঝাতে হবে করা উচিত প্রকৃতির নিয়মে বৃষ্টি কম বৃষ্টি হবার কারণ ইত্যাদি । আদিবাসী সমাজে বিশেষ করে নারী শিক্ষা উপরে জোর দিতে হবে । ডাইনি এবং জানগুরুর অলৌকিক ক্ষমতার এর বিরুদ্ধে প্রচার করতে হবে । বিজ্ঞান ও যুক্তি ভিত্তিক বিজ্ঞাপন দিতে হবে । যারা ডাইনি বিরোধী আন্দোলন করছেন তাদেরকে আরও সহজে ও সহযোগিতা করতে হবে । কোথাও ওঝা বা জানগুরু দ্বারা কাউকে যদি ডাইনি ঘোষণা করে তখন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানা, পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতে হবে। যে সমস্ত মহিলাকে ডাইনি অপবাদে জরিমানা করা হয়েছে তাদের অবিলম্বে সরকারের তরফ থেকে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা করতে হবে। কোন অসহায় মহিলাকে ডাইনি অপবাদ দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত ওঝা, মাঝি, সখা বা জনগুরুকে আইন কঠোর শাস্তি দিতে হবে ।

ডাইনির ডাইনি অপবাদে কোন হত্যার ঘটনা ঘটলে এই হত্যার সঙ্গে জড়িত সকল দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। ডাইনি নামে হত্যা বন্ধের জন্য পশ্চিমবঙ্গেও কঠোর আইন আনতে হবে ।

ডাইনি হত্যা বন্ধ করতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে যৌথভাবে আদিবাসী সমাজের লোকেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও চিকিৎসা সহ অন্যান্য সুবিধা দিতে হবে ।

এই আলোচনা শেষে এটা স্পষ্ট হয়েগেছে দুবরাজপুর গ্রামে ওই তিন মহিলাকে ডাইনি অপবাদে খুন করার পেছেন জানগুরুই সবথেকে বড় অপরাধী । যত দিন না এই জানগুরু গুনিনিরা কঠোরতম শাস্তি পাচ্ছে তত দিন বিশেষকরে আদিবাসী সমাজ থেকে ডাইনির মতন অন্ধবিশ্বাস দূর করা সম্ভব হবে না ।

বললাম, "দুবরাজপুর গ্রামে ডাইনি হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযুক্ত জানগুরুকে পুলিশ এখনো গ্রেফতার করেনি । যুক্তিবাদী সমিতি'র তরফ থেকে পুলিশের কাছে অভিযুক্ত জানগুরুকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানতে হবে।"

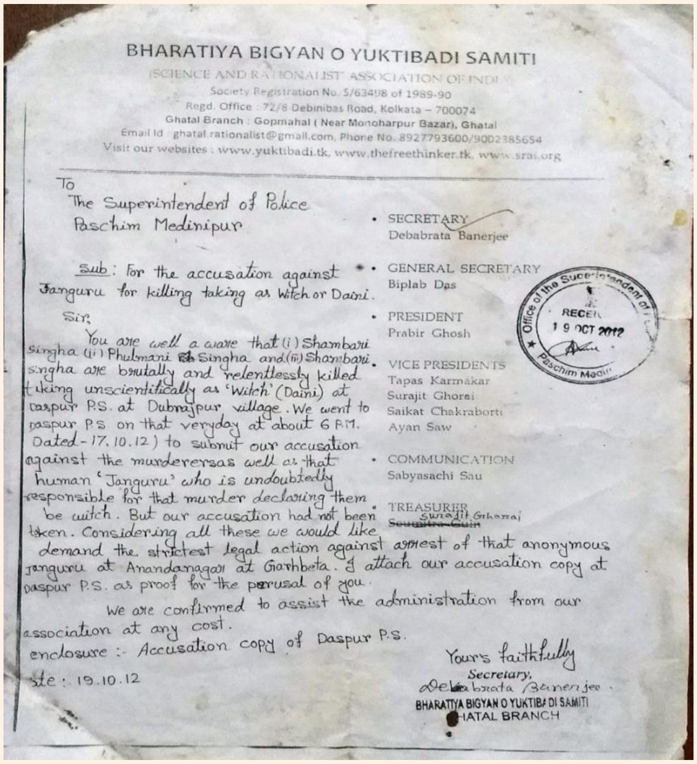

BHARATIYA BIGYAN O YUKTIBADI SAMITI
(SCIENCE AND RATIONALIST ASSOCIATION OF INDIA)
Society Registration No. S/63498 of 1989-90
Regd. Office : 72/8 Debinibas Road, Kolkata – 700074
Ghatal Branch : Gopmahal (Near Monoharpur Bazar), Ghatal
Email Id : ghatal.rationalist@gmail.com, Phone No. 8927793600/9002385654
Visit our websites : www.yuktibadi.tk, www.thefreethinker.tk, www.srai.org

- SECRETARY
Debabrata Banerjee
- GENERAL SECRETARY
Biplab Das
- PRESIDENT
Prabir Ghosh
- VICE PRESIDENTS
Tapas Karmakar
Surajit Ghorai
Saikat Chakraborti
Ayan Saw
- COMMUNICATION
Sabyasachi Sau
- TREASURER
~~Soumitra Guin~~ Surajit Ghorai

To
The Superintendent of Police
Paschim Medinipur

Sub: For the accusation against Janguru for killing taking as Witch or Daini.

Sir,
You are well a aware that (i) Shambari Singha (ii) Phulmani Singha and (iii) Shambari Singha are brutally and relentlessly killed taking unscientifically as 'Witch' (Daini) at Daspur P.S. at Dubrajpur village. We went to Daspur P.S on that veryday at about 6 P.M. Dated - 17.10.12) to submit our accusation against the murderersas well as that human 'Janguru' who is undoubtedly responsible for that murder declaring them be witch. But our accusation had not been taken. Considering all these we would like demand the strictest legal action against arrest of that anonymous Janguru at Anandanagar at Garhbeta. I attach our accusation copy at Daspur P.S. as proof for the perusal of you.

We are confirmed to assist the administration from our association at any cost.

enclosure :- Accusation copy of Daspur P.S.

Date : 19.10.12

Yours faithfully
Secretary,
Debabrata Banerjee
BHARATIYA BIGYAN O YUKTIBADI SAMITI
GHATAL BRANCH

Office of the Superintendent of Police, Paschim Medinipur
RECEIVED
19 OCT 2012

এই শুনে দেবব্রত বললো, "পুলিশ কি আমাদের কথা শুনবে"

"কেন শুনবে না?” যুক্তিবাদি সমিতির প্যাডে লিখিত দাবি জানা, "দুবরাজপুর গ্রামে তিন মহিলাকে যারা হত্যা করেছে, তাঁদের মধ্যে জানগুরুও একজন অভিযুক্ত । তাই জান গুরুকেও অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক ।"

আমার কথা মতন ঘাটাল যুক্তিবাদী সমিতি শাখার তরফ থেকে দাসপুর থানায় লিখিল অভিযোগ করা হল । কিন্তু পুলিশ জানাল," দুবরাজপুর ডাইনি হত্যাকাণ্ডে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়ে গেছে । তাই নতুন করে কোনও অভিযোগ নেওয়া হবে না ।"

এই খবর পাবার পর আমি দেবব্রতকে বললাম, "তুই নিজে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে যুক্তিবাদী সমিতি'র তরফ থেকে অভিযুক্ত জান গুরুর গ্রেফতার ও শাস্তির জন্য লিখিত দাবি জানাবি ।"

এই শুনে বললো, "নানা। আমার পুলিশের কাছে যেতে ভয় করে। অন্য কাউকে পাঠিয়ে দেবো ।"

বললাম, "ভয়ের কি আছে । তুই যদি নিজে থেকে পুলিশ সুপারের কাছে না যায় তাহলে আমাদের দাবি সফল হবে না ।"

"পুলিশ সুপার যদি জিজ্ঞেস করে, কেন আমার জানগুরুর গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি? তাহলে কি বলবো? "দেবব্রত ন্যাকা-ন্যাকা ভাবে জিজ্ঞেস করলো ।

বললাম, "এই যে আমি এতক্ষন ধরে তোকে বোঝালাম, দুবরাজপুর গ্রামে জানগুরুর নির্দেশেই ওই তিন মহিলাকে ডাইনি অপবাদে হত্যা করা হয় । এই কথা পুলিশ সুপারকে বলতে পারবি না । যদি না পারিস তাহলে আমি প্রবীর ঘোষকে বলছি তোর দ্বারা কিছুই হবে না।"

এর পর আমি প্রবীর বাবুকে দেবব্রতর কথা বললাম । ওর কথা শুনিয়ে রেগে প্রবীর বাবু বললেন, "ও একটা ভীতুর ডিম । পুলিশের নাম শুনলেই ওর হাত পা কাঁপতে শুরু করে । ও নিজে কিছু করে না । নিজে কোথায় না গিয়ে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেদের পাঠিয়ে দেয় । ওর শুধু নামের লোভ । দেখি আমি কি করতে পারি ।"

একটু পরে খবর পেলাম দেবব্রত পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে জানগুরুর গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানাবে ।

প্রায় ঘন্টা খানেক পরে দেবব্রত ফোন করে জানাল, সে পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করেছে । যুক্তিবাদী সমিতি'র তরফ থেকে অভিযুক্ত জানগুরুর গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানান হয়েছে । পুলিশ সুপার বলেছেন, দেবরাজপুর

ঘটনায় জড়িত প্রত্যেক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে । আগামী দিন যদি কোথায় ডাইনি অপবাদের ঘটানা ঘটে তাহলে পুলিশ তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেবে । তিনি কথা দিনলে , সমাজ থেকে ডাইনির মতন অন্ধবিশ্বাস দূর করার কাজে তিনিও সহযোগিতা করবেন ।

দুবরাজপুর গ্রামে ডাইনি হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত জানগুরুকে গ্রেফতারের দাবি জানান চিঠির কপি আমি ইমেলে পেলাম । এই চিঠির ভিত্তি করে আমার 'দৈনিক বিশ্বমিত্র' পত্রিকায় একটি খবর লিখে দিলাম ।

রবিবার ২১ অক্টোবর ২০১২

दैनिक विश्वमित्र

कोलकाता, रविवार २१ अक्टूबर २०१२

डायन मामला

आरोपियों को सजा की मांग

कोलकाता, २० अक्टूबर (नि.प्र.)। आज इस २१वीं सदी में तथाकथित डायन के नाम पर तीन आदिवासी महिलाओं की नृशंस हत्या कर दी गयी। पश्चिम मिदनापुर जिले के दासपुर थाना अन्तर्गत दुबराजपुर में सोमवारी सिंह, फूलमणी सिंह एवं विषा सिंह नामक तीन महिलाओं की सिर्फ डायन जैसा भयंकर अंधविश्वास के नाम पर बलि चढ़ा दी गई। यह नृशंस घटना ने पश्चिम बंगाल पर एक कलंक लगा दिया है। इस पूरी घटना के लिये राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए भारतीय विज्ञान व युक्तिवादी समिति के अध्यक्ष प्रबीर घोष ने घटना में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खासकर आदिवासी समाज में ओझा, सखा, जनगुरु एवं माझी जैसे तांत्रिकों द्वारा निजी स्वार्थ सिद्धि के लिये किसी महिला पर तथाकथित डायन का आरोप लगाया जाता है। उस आरोप में उस महिला पर जुर्माना या जानलेवा हमला किया जाता है। ऐसा ही पश्चिम मिदनापुर के दुबराजपुर में हुआ। श्री घोष ने कहा कि इस नृशंस हत्याकांड में आरोपी 'जनगुरु' के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कल युक्तिवादी समिति पश्चिम मिदनापुर जिला सचिव देवव्रत बनर्जी ने पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार चौधरी को लिखित शिकायत दर्ज की।

আজ দুপুরে দমদমে দেবীনিবাসে প্রবীর ঘোষের নেতৃত্বে যুক্তিবাদী সমিতি'র স্টাডি চলছে৷ আমি দুবরাজপুর গ্রামে ডাইনি হত্যা এবং ঘাটাল শাখার কথা তুললাম । বললাম, "যুক্তিবাদীরা যে বিষয় নিয়ে আন্দোলনে নামবে সেই ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিৎ । আমি সাংবাদিক হিসাবে এমন অনেক নেতাকে দেখছি যাঁরা শুধু নাম কেনার জন্য বড় বড় কথা বলে৷ কিন্তু যখনই পুলিশের কাছে কোনও দাবি নিয়ে যাবার কথা জিগ্যেস করছি তখন সেই নেতাকে ভয়ে ভ্যানিশ৷"

দুবরাজপুর গ্রামে ডাইনি হত্যাকাণ্ডে যুক্তিবাদী সমিতি'র তরফ থেকে পশ্চিম পুলিশ সুপারের কাছে জানগুরুর গ্রেফতার ও শাস্তির যে দাবি জানান হয়েছিল তার খবর কলকাতা থেকে 'দৈনিক বিশ্বমিত্র' পত্রিকাতে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ।

ক্লাসে সেই খবরটি পড়ে শোনালাম, "ডাইনি মামলায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি”

কলকাতা: আজ এই ২১ শতাব্দীতে তথাকথিত ডাইনির নামে তিন আদিবাদী মহিলাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে দেওয়া হল । পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার দুবরাজপুর গ্রামে সোমবারি সিং, ফুলমণি সিং ও বিশা সিং নামক তিন মহিলাকে শুধুমাত্র ডাইনির মতন ভয়ংকর অন্ধবিশ্বাসের নাম হত্যা করা হয় । এই নৃশংস ঘটনা এই পশ্চিমবঙ্গের মাথায় কলংকের দাগ লাগিয়ে দিয়েছে । এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সভাপতি প্রবীর ঘোষ বলেন, ঘটনায় দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানাচ্ছি ।

তিনি বলেন, বিশেষকরে আদিবাসী সমাজে ওঝা, সখা, জানগুরুর মতন গুনিন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনও মহিলাদের উপর ডাইনি অপবাদ দিয়ে থাকেন । এই অপবাদের ফলে ওই মহিলার উপর জরিমানা লাগান বা হামলা করা হয় । এমনই ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুরের দুবরাজপুরে ঘটেছে ।

दैनिक विश्वमित्र

कोलकाता, शनिवार २७ अक्टूबर २०१२

डायनकांड में जनगुरु समेत ३ गिरफ्तार

पश्चिम मिदनापुर जिले के दासपुर अंतर्गत दुबराजपुर इलाके में हुए डायनकांड के एक अन्य मुख्य आरोपी जनगुरु सामए मांडी समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस डायनकांड में अब तक १० लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जबकि बाकी आरोपी अभी भी फरार हैं। गौरतलब है कि गत ९ अक्टूबर को दासपुर के दुबराजपुर में तीन आदिवासी महिलाओं फूलमणि सिंह (७०), सम्बारी सिंह उर्फ तितली (४०) एवं सम्बारी सिंह उर्फ रिषा को डायन बताकर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर उन्हें अधमरी हालत में जमीन के नीचे जिंदा दफन कर दिया गया था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक जनगुरु सामए मांडी के इशारे पर ही इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया था। ज्ञात हो कि पश्चिम मिदनापुर के दासपुर थाना स्थित दुबराजपुर गांव में तथाकथित डायन के आरोप में तीन महिलाओं की नृशंस हत्या की घटना के बाद भारतीय विज्ञान व युक्तिवादी समिति की ओर से पुरुलिया पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गयी थी। शिकायत में मांग की गयी थी कि डायन चिन्हित करने वाले जनगुरु के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये।

ঘোষ বাবু আরও বলেন, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত জানগুরুর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরীর কাছে করেছে ।

শুক্রবার ২৬ অক্টোবর ২০১২

শেষপর্যন্ত যুক্তিবাদী সমিতি'র দাবির ভিত্তিতে দুবরাজপুর ডাইনি হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত এক জানগুরু সমাই মন্ডল সহ তিন অভিযুক্তদের পুলিশ গ্রেফতার করেছে ।

এই খবর পাবার পর আমি আমার পত্রিকা অফিস থেকে প্রবীর ঘোষকে ফোন করে বললাম , "যুক্তিবাদী সমিতি'র জন্যই ডাইনি হত্যাকান্ডে মূল অভিযুক্ত জনগুরুর গ্রেফতার সম্ভব হয়েছে ।"

প্রবীর বাবু আনন্দের সঙ্গে বললেন, "হ্যাঁ ঠিক কথা । যুক্তিবাদী সমিতি'র ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই আমাদের সকলের মিলিত পরিশ্রমের একটি বড় সাফল্য । কারণ শুধুমাত্র যুক্তিবাদী সমিতিই ডাইনি হত্যাকান্ডে মূল অভিযুক্ত জানগুরুর গ্রেফতারে দাবি জানিয়েছিল "

শনিবার ২৭ অক্টোবর ২০১২

আজ 'দৈনিক বিশ্বমিত্র' পত্রিকায় দুবরাজপুর ডাইনি হত্যাকান্ডে জানগুরু সহ তিন অভিযুক্তের গ্রেফতারের খবরটি গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রকাশিত করা হয়েছে । খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, পুলিশের দাবি দুবরাজপুর গ্রামে এই জানগুরুর নির্দেশেই মা - মেয়ে সহ তিন মহিলাকে ডাইনি অপবাদে নৃশংসভাবে হত্যা করে তাঁদের দেহগুলি কংসাবতি নদী চরে পুঁতে দাওয়া হয়েছিল ।

এবার এটাই দেখার জানগুরুর নির্দেশে যে নৃশংস ডাইনি হত্যাকান্ড ঘটেছে তাতে আদালত কি শাস্তি দেয় ।

শুক্রবার ১৩ মে ২০১৬

সাল ২০১২ এর অক্টোবর মাসে পশ্চিম মেদিনীপুরে এক জনগুরুর নির্দেশে তিন মহিলা খুনে ১৪ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে ।

শনিবার ১৪ মে ২০১৬

আজ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় থেকে খবরটি পাঠকের সামনে তুলে ধরছি ।

"তিন মহিলা খুনে দোষী ১৪ জন

'ডাইনি-গ্রামে ফেসবুকে মেতে ছেলেরা

অভিজিৎ চক্রবর্তী, দুবরাজপুর (দাসপুর) : সাড়ে তিন বছর আগে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর ঘটনাটা আজও বুকের ভিতরে আঁকড়ে রেখেছে দুবরাজপুর গ্রাম । পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ও ডেবরা থানা সীমান্ত এই দুবরাজপুর গ্রামেই সাড়ে তিন বছর আগে ডাইনি অপবাদে তিন মহিলাকে বাঁশ পেটা করে খুন করেছিলেন প্রতিবেশীরা । নদীর চরে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল তিনটি দেহ ।

এখন সেখানেই মোবাইলে ফেসবুক খুলে বসে রয়েছেন গ্রামের যুবকেরা । এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য ।

তিন মহিলাকে খুনের ঘটনায় দুবরাজপুর ও পড়শি গ্রাম হরিরাজপুরের মোট ২২জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ । শুক্রবার ঘাটালের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক দেবপ্রসাদ নাথ আট জন মহিলা-সহ মোট ১৪ জনকে দোষী সব্যস্ত করেন । সকলেই খুন ও তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে অভিযুক্ত । তথ্য প্রমাণের অভাবে বাকিরা বেকসুর খলাস পেয়েছেন । আগামী সোমবার ঘাটাল আদালতে দোষীদের সাজা ঘোষণা করবেন বিচারক ।

তার আগে, দুবরাজপুরে ধরা পড়ল চাপা আতঙ্কের ছবিই । গ্রামের ভিতরে পা দিতেই দুবরাজপুর প্রাথমিক স্কুল । পিছনে বেশ কয়েকজন যুবক মোবাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন । কাছে যেতে বোঝা গেল ফেসবুকে ব্যস্ত তাঁরা । সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি বুঝতে পেরেই যেন সাবধান হয়ে গেলেন ওঁরা । সবার মুখেই একই কথা, "ডাইন বলে যে কিছু নেই, তা আমরা

পাড়ায় সব বলে দিয়েছি। এখন ওই সব নিয়ে আর কোনও সমস্যা নেই। এখন একটাই চিন্তা গ্রামের মানুষগুলি কবে বাড়ি ফিরবে ”সাবধানী গলাও হঠাৎ উদাস হয়ে যায়।

এ গ্রামে প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই কেউ না কেউ ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত ছিলেন। তাঁদের কেউ এখন জেলে। কেউ বা পলাতক। ফলে সকলের উদ্বেগ ওই একই জায়গায়—কবে ফিরবে মানুষগুলো!

সে দিন ‘ডাইন নিধনে’ পিছপা হয়নি কেউ। জানগুরুর নিদান মেনে স্ত্রী -পুরুষ নির্বিশেষে বাঁশ হাতে তুলে নিয়েছিল। নিরপরাধ তিন মহিলার শেষ নিঃশ্বাসটুকু বেরিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত তাদের হাত থামেনি।

দুবরাজপুরের গ্রামে সেই সময় এক এক করে অনেকে সর্দি-জ্বরে ভুগছিলেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে না গিয়ে গ্রামের মানুষ গিয়েছিলেন ৬৫ কিলোমিটার দূরে গড়বেতার আনন্দনগরে। জানগুরু সমাই মাণ্ডি থাকত সেখানেই। সমাই মাণ্ডিই নিদান দেয় গ্রামের বৃদ্ধা ফুলমণি সিংহ (৬২) ও তাঁর মেয়ে শম্বারী সিংহ (৪০) এবং তাঁদের পড়শি হরিরাজপুর গ্রামের অন্য এক মহিলা শম্বরী সিংহ (৫৫) ডাইনি হয়েছেন। তার ফলেই গ্রামে এত অসুখ-বিসুখ।

২০১২ সালের ১৬ অক্টোবর রাতে গ্রামের সিংহপাড়ায় বসে সালিশি। ফতোয়া দেওয়া হয় ওই তিন মহিলাকে গ্রাম ছাড়তে হবে, সঙ্গে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা। না-হলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়। মাতব্বরদের নির্দেশ শুনেই ফুলমণিদেবীর ছেলে বুধু সিংহ , জামাই লক্ষ্মীকান্ত ও শম্বরীর স্বামী বোবা সিংহেরা প্রতিবাদ করেন। ফল হয় উল্টো। ওই তিন পুরুষকেই ভয় দেখিয়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তার পর নির্বিঘ্নে শুরু হয় মারধর। তিন মহিলাকে মারতে মারতে গ্রাম লাগোয়া কংসাবতীর চরে নিয়ে আসেন বাসিন্দারা। ততক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন তিনজনই। দেহগুলি বিবস্ত্র করে চরে পুঁতে দেওয়া হয়।

পরদিন সকালেই এলাকায় পৌঁছে যায় পুলিশ। মৃত শম্বারীর স্বামী লক্ষ্মীকান্ত সিংহের লিখিত অভিযোগে দাসপুর থানার পুলিশ তদন্তে নামে। শুক্রবার ঘাটাল আদালতে সরকারি আইনজীবী কৃষ্ণেন্দু মাইতি বলেন, “ঘটনায় মোট ৪৯ জনের নামে এফআইআর করা হয়। বেশিরভাগই মহিলা। পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ২২জন। বাকিরা এখনও পলাতক।” ঘটনার মাস তিনেকের মধ্যেই চাজর্শিট জমা পড়ে। শুরু হয় বিচার। বিচার চলাকালীন দু’জনের মৃত্যুও হয়। চারজন জামিনে মুক্তি পেলেও বাকিরা জেলেই ছিলেন। ঘটনার প্রায় সাড়ে তিন বছরের মাথায় ওই মামলায় অভিযুক্তরা দোষী সব্যস্ত হল।

দিন দশেক আগেই রায় বেরনোর খবর জেনে গিয়েছিলেন দুবরাজপুরের বাসিন্দারা। দাসপুর শহর প্রায় প্রায় ১৩ কিলোমিটার দূরে ওই গ্রামে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল শম্ভু সিংহের সঙ্গে। ফুলমণি দেবীর আত্মীয় শম্ভু সিংহই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন কংসাবতীর চরে পোঁতা তিনটি দেহ। সাংবাদিক পরিচয় শুনেই তিনি একটু বেশি স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ার চেষ্টা করলেন। বললেন, “ওই ঘটনার পর গ্রামের হাল অনেকটাই ফিরে গিয়েছে। গ্রামে এখন

কারও সঙ্গে কোনও বিবাদ নেই । কারও মুখে ডাইন শব্দটাও বের হয়নি আর । এলাকায় আত্মীয়দের আনাগোনাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।”

আত্মীয়দের যাতায়াত বন্ধ হল কেন? প্রশ্ন করতেই শম্ভু সিংহকে চুপ করিয়ে দিলেন কাকলি সিংহ, অঞ্জলি সিংহরা। উত্তর দিলেন তাঁরাই,“ একটা অন্ধ কুসংস্কার আমাদের গোটা গ্রামকে শেষ করে দিয়েছে ! আমাদের সমাজে এখনও জানগুরুর প্রতি অগাধ বিশ্বাস । তাই আত্মীয়েরা এলেই ফের ওই চর্চা শুরু হবে । আমরা চাই না।”দুবরাজপুরে বাসিন্দারা এখন নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়েও সতর্ক । গ্রামের মধ্যে নিজেরাই সেরে নেন সে সব আচার । কারণটা সেই একই ।

কাকলিদেবীর কথায়, “আমার ছেলেটা জেলে পচছে । জানি না কী হবে ।”অঞ্জলিদেবীর বলেন, “ওই ঘটনায় আমার স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল । তখন অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলাম । আমার মেয়ের মুখটাও দেখেননি আমার স্বামী । ওই ভুল যদি না হতো তাহলে কী মেয়েকে কোলে নিয়ে আমাকে লোকের বাড়িতে কাজে যেতে হতো? ”বছর তেইশের যুবক রাজু সিংহও বললেন একই কথা, “আমাদের ভুল বুঝিয়েই জানগুরু ও মাতব্বরেরা এমন কাণ্ড ঘটালো । আমার দেড় বছরের ছেলে-সহ স্ত্রীকে জেল খাটতে হচ্ছে । কতদিন ওদের দেখিনি।”

শাস্তি হয়েছে আদালতের রায়ের আগেই । আতঙ্কে হোক, অনুশোচনায় হোক সম্বিৎ ফিরেছে গ্রামের মানুষগুলোর । স্থানীয় বাসিন্দা , অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক শিবশঙ্কর শাসমল বলেন, “ঘটনার পর পুলিশ-প্রশাসনের উদ্যোগে দু’বার সচেতনতা শিবির হয়েছিল । আর হয়নি । তবে আর প্রয়োজনও নেই । গ্রামের সিংহপাড়ার সবাই এখন জানেন বিষয়টি যে নিছকই কুসংস্কার । ”কিন্তু এত কিছুর পরও জানগুরু সিধে হয়েছেন বলে মনে হয় না । শুক্রবার এজলাসে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয়েছিল । কুসংস্কার পুষে রাখাই যার পেশা , সেই সমাই মাণ্ডি দেদার আইন সচেতন । মেজাজ সপ্তমে চড়িয়ে সমাই বলে, “আমি পুলিশ হেফাজতে । আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন না । আমি কিছু বলব না।”

সোমবার ১৬ মে ২০১৬

ঘাটাল আদালতে ৭ জনের ফাঁসির সাজা ।

ডাইনি অপবাদ দিয়ে ৩ মহিলাকে পিটিয়ে খুন করার অপরাধে ১ মহিলা সহ সাতজনকে মৃত্যুদন্ডের নির্দেশ দিল আদালতের। আভিযুক্ত অন্য ৬ জনকে যাবজ্জীবন এবং ১ জনকে সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার ঘাটালের অতিরিক্ত জেলা ও দায়েরা জজ দেব প্রসাদ নাথ এই রায় ঘোষনা করেন।

মঙ্গলবার ১৭ মে ২০১৬

দুবরাজপুর গ্রামে জানগুরুর নির্দেশে মা - মেয়ে সহ তিন মহিলার নৃশংস হত্যাকান্ডে ঘাটলা মহকমা আদালত সাজা শোনালেন। জানগুরু সহ সাত জনকে ফাঁসির সাজা শোনালেন বিচারক।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত খবর দিলাম।

“ডাইনি অপবাদে পিটিয়ে খুন

জানগুরু-সহ ৭ জনের ফাঁসির সাজা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল: বিচার হল। ডাইনি অপবাদে তিন মহিলাকে পিটিয়ে খুন করার দায়ে এক মহিলা-সহ সাতজনকে ফাঁসির সাজা শোনালেন বিচারক। একই সঙ্গে ছ জনকে যাবজ্জীবন (আমৃত্যু) এবং একজনকে দিলেন ন'বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ।

সাড়ে তিন বছরে অনেকটাই বদলেছে দাসপুরের দুবরাজপুর। শুধু কয়েকটা মানুষের মুখের কথায় যে গ্রামের মানুষ পিটিয়ে মেরেছিল তিন মহিলাকে। সেই গ্রামেরই কিশোরী বলে বেড়াচ্ছে 'ডাইনি বলে কিছু হয় না। 'সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন পড়ে শোনাচ্ছে মা-কাকিমাকে। তবু তার উপলব্ধি, “আমরা যতই বলি, সচেতন হতে আরও সময় লাগবে।”

দুবরাজপুরের মানুষ বলছেন চরম শাস্তিতে জানগুরুদের আধিপত্য কমবে। তাঁদের ঘরের মানুষগুলো আজ শাস্তির মুখে শুধুমাত্র জানগুরুর উস্কানিতে। মা, দিদির খুনে বিচার চেয়ে এতদিন অপেক্ষা করেছিলেন বছর তিরিশের বুধু সিংহ। তিনি বলেন, “সবচেয়ে বেশি রাগ ওই জানগুরু সমাই মাণ্ডির উপরেই। ও-ই গ্রামের মানুষের হাতে বাঁশ তুলে দিয়েছিল। ওর ফাঁসি হোক। ”হরিরাজপুরের বোবা সিংহও বলেন, “সন্ধ্যা বেলা আমার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল মাতব্বরেরা। জানগুরুর নিদানে ওকে মেরে পুঁতে দিয়েছিল। সবাই শাস্তি পাক।” স্থানীয় ভারতী

সিংহ বললেন, “এখনও বহু জানগুরু রয়েছে। ওদের জন্যই তো গ্রামের আজ এই অবস্থা। সব জানগুরুরা শাস্তি পেলেই শান্তি।”

শনিবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি গ্রামের মানুষকে বার বার পড়ে শুনিয়েছে আদিবাসী পাড়ার অসীমা সিংহ। স্থানীয় স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া অসীমা এ দিন বলে, “আমাদের সমাজে অনেকেই ডাইন কথাটি অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। এখনও। তবে ওই ঘটনার পর আর কেউ এ নিয়ে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেনি।”

ওই মামলায় তিন বছর জেল খেটে বেকসুর খালাস পেয়েছেন গণেশ সিংহ। এ দিন প্রায় চেঁচিয়ে উঠে ওই যুবক বলেন, “আমি আর ওই সব কথায় নেই বাবু। আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। ”সকাল থেকেই টিভি দেখার জন্য ছটফট করছিলেন বৃদ্ধ সাহেব সিংহ। তাঁর বৌমা কুনি জেলে। বেলা ৩টে নাগাদ ঘাটালের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক দেবপ্রসাদ নাথ, কুনিকে যাবজ্জীবনের আদেশ শোনান।

দুপুর ২টো থেকে শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া। শুক্রবারই সাত মহিলা-সহ মোট ১৪ জনকে দোষী সব্যস্ত করেছিলেন বিচারক। এ দিন বেলা ৩টের সময় মঙ্গল সিংহ, কালী সিংহ, সমাই মাণ্ডি, সানি মাণ্ডি, ভাকু সিংহ, নুরা সিংহ ও রবীন সিংহকে ফাঁসির আদেশ শোনান। কুনি সিংহ, জয়ন্তী সিংহ, চাঁদমনি সিংহ, পঞ্চমী সিংহ, ছবি সিংহ ও লক্ষ্মী সিংহকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। সঙ্গে ষাট হাজার টাকা জরিমানা , অনাদায়ে একবছরের কারাদণ্ড। সুকুমার সিংহ খুনের মামলায় সরাসরি যুক্ত না-থাকায় তাঁকে ন’বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। সুকুমারকে তথ্য প্রমাণ লোপাট ও বেআইনি জমায়েতের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

সরকারি আইনজীবী শীর্ষেন্দু মাইতি বলেন, “এটি একটি বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা। জেলায় ডাইনি অপবাদে খুনের ঘটনায় এতজনের সর্বোচ্চ সাজা এই প্রথম। ”রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা বললেও আসামী পক্ষের এক আইনজীবী জয়দেব মুখোপাধ্যায়ও রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, “এই ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। আসল অপরাধীরা অধরা”

উল্লেখ্য, এই ঘটনায় মোট ৪৯ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছিল। পুলিশ মোট ২২জনকে গ্রেফতার করেছিল। বিচার চলাকালীন দু’জন মারা যান। বাকিরা এখনও পলাতক।

ঘাটালের আইনজীবীরাও এই রায়ে খুশি। বরদা বাণীপীঠ হাইস্কুলের শিক্ষক উদয় ঘটক ও সুকুমার পানের মতে, ছাত্ররাও যাতে তাদের পাড়ায় এমন ঘটনার প্রতিবাদ করে, তাও শেখাতে হবে।

দিনের শেষে বিচারকের আদেশ শুনে বুধু সিংহ আর বোবা সিংহের মুখে ম্লান হাসি । তাঁদের আশা, ‘‘এ বার সরকার আমাদের সমাজ থেকে জানগুরুদের বিদায় দিলেই শান্তি ।’’

রবিবার ২৮ অক্টোবর ২০১৮

ডাইনি হত্যায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাত অপরাধীর সাজা মকুব করে সম্প্রতি এমনটাই জানাল কলকাতা হাই কোর্ট । একই পরিবারের তিন মহিলাকে ‘ডাইনি’ তকমা দিয়ে তাঁদের খুন করার দায়ে ওই সাতজনের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা আদালত ।

আজ 'সংবাদ প্রতিদিন'-এ প্রকাশিত খবর তুলে দিলাম ।

‘ডাইনি’ খুনে ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড রদ করল হাই কোর্টে

বিশাখা পাল, স্টাফ রিপোর্টার: অপরাধের মূলে রয়েছে কুসংস্কার। তাকে শিকড়সমেত উপড়ে ফেলা না গেলে দূর হবে না অপরাধ প্রবণতা । বরং তা উত্তরোত্তর বাড়বে ।

ডাইনি হত্যায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাত অপরাধীর সাজা মকুব করে সম্প্রতি এমনটাই জানাল কলকাতা হাই কোর্ট । একই পরিবারের তিন মহিলাকে ‘ডাইনি’ তকমা দিয়ে তাঁদের খুন করার দায়ে ওই সাতজনের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা আদালত । কলকাতা হাই কোর্ট অবশ্য মনে করেছে, ‘মৃত্যুদণ্ড’ তো ছার । তার চেয়েও গুরুতর কোনও সাজা এই মানসিকতা বদলাতে পারবে না । সমস্যা যখন গভীরে, তখন মূলশুদ্ধ তাকে দূর করা না গেলে অপরাধ প্রবণতা রোখা কঠিন বলে আদালত মনে করেছে ।

কীসের প্রেক্ষিতে হাই কোর্টের এহেন পর্যবেক্ষণ?

পশ্চিম মেদিনীপুরের দুবরাজপুর এলাকার হরিদাসপুরের ঘটনা ।

‘ফাঁসি দিলেও সমাজ থেকে দূর হবে না কুসংস্কার’

‘ডাইনি’ খুনে ৭ মৃত্যুদণ্ড রদ হাই কোর্টে

স্টাফ রিপোর্টার : অপরাধের মূলে রয়েছে কুসংস্কার। তাকে শিকড়সমেত উপড়ে ফেলা না গেলে দূর হবে না অপরাধ প্রবণতা। বরং তা উত্তরোত্তর বাড়বে।

ডাইনি হত্যায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাত অপরাধীর সাজা মকুব করে সম্প্রতি এমনটাই জানাল কলকাতা হাই কোর্ট। একই পরিবারের তিন মহিলাকে ‘ডাইনি’ তকমা দিয়ে তাঁদের খুন করার দায়ে ওই সাতজনের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা আদালত। কলকাতা হাই কোর্ট অবশ্য মনে করেছে, ‘মৃত্যুদণ্ড’ তো ছার তার চেয়েও গুরুতর কোনও সাজা এই মানসিকতা বদলাতে পারবে না। সমস্যা যখন গভীরে, তখন মূলশুদ্ধ তাকে দূর করা না গেলে অপরাধ প্রবণতা রোখা কঠিন বলে আদালত মনে করেছে।

কীসের প্রেক্ষিতে হাই কোর্টের এহেন পর্যবেক্ষণ?

পশ্চিম মেদিনীপুরের দুবরাজপুর এলাকার হরিদাসপুরের ঘটনা। ২০১২-র শুরু থেকেই একের পর এক বিপদ ঘটছিল মুণ্ডা উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামটিতে। শেষপর্যন্ত বিপদের ‘কারণ’ খুঁজে বার করে গ্রামের মোড়লরা। একই পরিবারের তিন মহিলা সম্বরী সিং, ফুলমণি সিং ও সোমবারি সিংকে ডাইনি সাব্যস্ত করা হয়। গ্রামের মাথা থোবা সিংয়ের নেতৃত্বে সালিশি সভায় যাবতীয় অনর্থের জন্য তিন মহিলার ‘ডাইনিবৃত্তি’কে দায়ী করা হয়। দেওয়ার ক্ষমতা নেই জেনেও তাঁদের ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করে থোবা সিং ও তার দলবল। এরপরই তিন অসহায় মহিলার উপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার। লাথি, কিল, ঘুসি মারতে মারতে সেখানেই তাঁদের আধমরা করা হয়। তিনজনের মুখে প্রস্রাব করে দেওয়া হয়। শেষমেশ তাঁদের টেনেহিঁচড়ে কংসাবতীর চরে নিয়ে যায় থোবা সিং, গণেশ সিং, সানি মান্ডি, বাবলু সিংরা। গোটা ঘটনার সাক্ষী ছিলেন সোমবারি সিংয়ের স্বামী লক্ষ্মীকান্ত সিং। সালিশি সভায় তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ঘটনার পরদিন নদীর চর থেকে ওই তিন মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয়।

লক্ষ্মীকান্তর অভিযোগের ভিত্তিতে দাসপুর থানার পুলিশ তদন্তে নামে। পরে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত হয়। ষড়যন্ত্র ও হত্যা-সহ একাধিক ধারায় মোট ৪৯ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়ে। এরমধ্যে ২৫ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মূল অভিযুক্ত থোবা সিং সহ পলাতক ২৪ জন। বেশ কয়েক মাস বিচারপর্ব চলার পর ঘাটাল আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক অভিযুক্ত সানি মাণ্ডি, ভাকু সিং, রবীন সিং, মঙ্গল সিং, নূরা সিং, সামাই মান্ডি, কালী সিংকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এছাড়াও ঘটনায় অভিযুক্ত ছয় মহিলাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দেন দায়রা বিচারক।

পাঁচের পাতায়

■ পশ্চিম মেদিনীপুরের হরিদাসপুরে ২০১২ সালে তিনজন মহিলাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে অকথ্য অত্যাচারের পর হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় ঘাটাল আদালতে সাতজনকে মৃত্যুদণ্ড ও ছয়জনকে যাবজ্জীবন দেওয়া হয়। হাই কোর্ট মৃত্যুদণ্ড রদ করল।

২০১২-র শুরু থেকেই একের পর এক বিপদ ঘটছিল মুণ্ডা উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামটিতে। শেষপর্যন্ত বিপদের ‘কারণ’ খুঁজে বার করে গ্রামের মোড়লরা। একই পরিবারের তিন মহিলা সম্বরী সিং, ফুলমণি সিং ও সোমবারি সিংকে ডাইনি সাব্যস্ত করা হয়। গ্রামের মাথা থোবা সিংয়ের নেতৃত্বে সালিশি সভায় যাবতীয় অনর্থের জন্য তিন মহিলার ‘ডাইনিবৃত্তি’ কে দায়ী করা হয়। দেওয়ার ক্ষমতা নেই জেনেও তাঁদের ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করে থোবা সিং ও তার দলবল। এরপরই তিন অসহায় মহিলার উপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার। লাথি, কিল, ঘুসি মারতে মারতে সেখানেই তাঁদের আধমরা করা হয়। তিনজনের মুখে প্রস্রাব করে দেওয়া হয়। শেষমেশ তাঁদের টেনে হিঁচড়ে কংসাবতীর চরে নিয়ে যায় থোবা সিং, গণেশ সিং, সানি মান্ডি, বাবলু সিংরা। গোটা ঘটনার সাক্ষী ছিলেন সোমবারি সিংয়ের স্বামী লক্ষ্মীকান্ত সিং। সালিশি সভায় তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ঘটনার পরদিন নদীর চর থেকে ওই তিন মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয়।

লক্ষ্মীকান্তর অভিযোগের ভিত্তিতে দাসপুর থানার পুলিশ তদন্তে নামে। পরে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত হয়। ষড়যন্ত্র ও হত্যা-সহ একাধিক ধারায় মোট ৪৯ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়ে। এদের মধ্যে ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মূল অভিযুক্ত থোবা সিং সহ পলাতক ২৪ জন। বেশ কয়েক মাস বিচারপর্ব চলার পর ঘাটাল আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক অভিযুক্ত সানি মাণ্ডি, ভাকু সিং, রবীন সিং , মঙ্গল সিং, নূরা সিং, সামাই মান্ডি, কালী সিংকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এছাড়াও ঘটনায় অভিযুক্ত ছয় মহিলাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দেন দায়রা বিচারক।

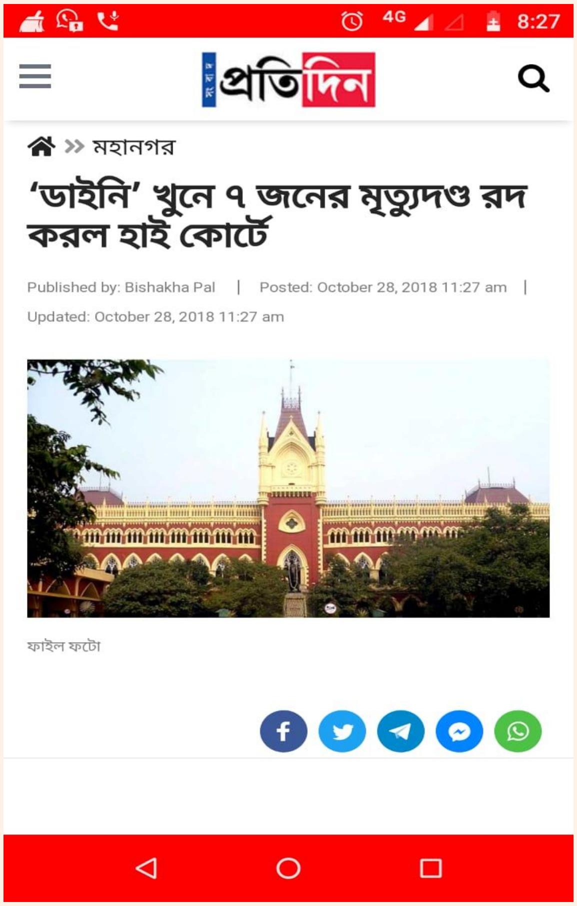

নিম্ন আদালতের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় সাত মৃত্যদণ্ডপ্রাপ্ত। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চ মামলার শুনানির পর তাদের সাজা মকুব করেছে। পাশাপাশি কুসংস্কারের এই প্রাণঘাতী দাপট দেখে তীব্র মর্মবেদনা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে আদালতের মন্তব্য, ভাবতেও আবাক লাগে যে, “স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও এমন ঘটনা ঘটছে। এটা ভাবতেই অবাক লাগে। সমাজ বিশেষত পিছিয়ে পড়া শ্রেণি যদি এখনও এমন কুসংস্কারে নিমজ্জিত থাকে, সেখানে রাজ্য সরকার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। বরং সরকারি শিক্ষানীতিতে অবিলম্বে বদল এনে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির অজ্ঞতা দূর করাই সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব।”আদালতের নির্দেশ, তফসিলি জাতি ও

উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে অবিলম্বে বিষয়টিকে শিক্ষানীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নিবিড় প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে হবে কুসংস্কারের অন্ধকার।

সাল ২০১৮, অক্টোবর। কিন্তু ডাইনি হত্যায় ঘাটাল আদালত কর্তৃক

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৭ অপরাধীর সাজা মকুব করে কলকাতা হাই কোর্ট। এবং কোর্ট জানাল, "অপরাধের মূলে রয়েছে কুসংস্কার। তাকে শিকড়সমেত উপড়ে ফেলা না গেলে দূর হবে না অপরাধ প্রবণতা। বরং তা উত্তরোত্তর বাড়বে"

এই দীর্ঘ লেখার মাধ্যমে এই কথাই বলতে চাই, "ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র আন্দোলনের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দুবরাজপুর ঘটনা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কারণ দুবরাজপুর গ্রামের এক জানগুরুর নির্দেশে তিন মহিলাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে নৃশংস হত্যা ঘটনায় করা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র যুক্তিবাদী সমিতি'র দাবির জন্যই মূল দোষী জানগুরুর সাজা পেয়েছে। ডাইনি হত্যার নেপথ্যে জানগুরুর ষড়যন্ত্র যন্ত্রের ফাঁস হল।

রক্তাক্ত পৃথিবী

-পূবালী শিখা মৈত্র

শরণার্থী শিবির

আজ অনেক দিন পর সাভেরিন বাইরে গিয়ে কোথাও থেকে চেয়েচিন্তে একটা শক্ত চার দিনের বাসি বান পাউরুটির টুকরো জোগাড় করে এনেছে,বাচ্চাদের জন্য।এর জন্য অবশ্য ওকে দাম চোকাতে হয়েছে,বড় রকমের,নিজেকে দিয়ে!

-"দেখ,সিসো মা আমাদের জন্য রুটি নিয়ে এসেছে, ওহ যা খিদে পেয়েছিল" বলে পাঁচ বছরের ইভানহো নিজের,অপুষ্টিতে ফুলে ওঠা,হাড় বের করা পেটে একবার হাত বুলিয়ে নেয়।ঠিক ওর পাশে বসেই, ওর দু বছরের ছোট বোন ইসাবেল তখন,নিজের হাতে ধরা ছোট একটা ময়লা কাঠের টুকরো চুষছে!

-"হ্যাঁ গো, মেয়ে কোনো ভালোমানুষ দিলো বুঝি রুটির টুকরোটা"! লোলুপ দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে, একবার জ্বিভ টা ঠোঁটে চেটে নিয়ে প্রশ্ন করে,বুড়িমা,ইনতিবিন।

যুদ্ধ বিধস্ত সিরিয়ার এই শরণার্থী শিবিরে,এই একটা তাঁবুতে ওরা ছয় টা,পরিবার ঠাঁই পেয়েছে।যা খাবার এখানে দেওয়া হয়,সবার তাতে কুলোয়না।কত দিন তো নিজে অভুক্ত থেকে সাভেরিন, নিজের অংশ টুকুও বাচ্চাদের মুখে তুলে দিয়েছে।

নিজের ওড়না দিয়ে,চট করে অমূল্য সম্পদ সেই বাসি পাউরুটি টা কে ঢেকে ফেলে,জবাব দেয়...সাভেরিন

-"হ্যাঁ,বাইরে থেকে আনলাম চেয়ে,বুড়িমা"

ঠোঁটের কোণে একটা বিশ্রী রকমের হাঁসি ফুটিয়ে বুড়ি বলে ওঠে,,,"এমনি দিলো নাকি,কিছু দিয়েও এলে ,ভালমানুষের পো কে"

কিছু বলতে না পেরে নিজের বড় বড় নীল চোখ গুলো,নামিয়ে নেয় সাভেরিন।বাচ্চা রা ততক্ষনে ওর কোলে এসে বসে পড়েছে, খাবার জন্য।

-"ইসাবেল, ওই রকম করে নয়,দেখ আগে এইযে লাল চেরির টুকরো দেখছিস এগুলোকে, মুখে পুরেনে...ইমম... দেখ দেখ কি মিষ্টি খেতে, তারপর প্রথমে এইযে পাউরুটির শক্ত জায়গা গুলো ঐটা আগে খা,একদম শেষে নরম অংশ টা খাবি..বুঝলি"!

ছোট্ট ইসাবেল, কিছুই বোঝেনা, শুধু হাতে ধরা রুটির টুকরোটা র দিকে তাকিয়ে একগাল হেঁসে ওঠে।

ওদের দুই ভাই বোনের,খাওয়া র দিকে, তখন তাঁবুতে থাকা অন্য বাচ্চারা, তাকিয়ে আছে, ওদেরও ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে,কিন্তু, আস্ত মিঠে রুটির টুকরো তো সবার কপালে জোটেনা,আজকাল আর।

তখন বসন্ত

2011 সালের এপ্রিল মাস।শীতের ঠান্ডা সরে গিয়ে,সমস্ত সিরিয়া তে বয়ে চলেছে,উষ্ণ মেডিটেরিয়ান সামুদ্রিক হওয়া।রাস্তা ঘাট স্কুল কলেজ,সব জায়গাতে খুশির মেজাজ।

সূর্য্য উজ্জ্বল,এইরকম একটা সকালেই, বেজে উঠেছিলো, প্রথম সাইরেন!

প্রথমে, সাভেরিন কিছু বুঝে উঠতে পারেনি,ভেবেছিলো, রোজকার মত কলকারখানা র ঘন্টি বোধহয়।বাইরের রাস্তাতে, লোকজনের দৌড়নোর, আওয়াজ পেয়ে,জিগ্যেস করে জানতে পারলো,,,,"যুদ্ধ" লেগেছে।তার 15 মিনিটের মধ্যেই, দামাস্কার আকাশে, দেখা যায়,আমেরিকান বোমারু বিমানের ঝাঁক।প্রথম বোম্ব টা, যখন পাশের সৈন্য ছাউনিতে পড়লো,ওদের পাথুরে বাড়ির কাঠের দরজা জানালা সব কেঁপে উঠেছিল।

সেই শুরু,তারপর তো সব কিছুই বদলে গেল,দেশটার!
যুদ্ধের আগে,যেখানে 100% ছেলে মেয়ে স্কুলে যেতে,সেই স্কুল গুলোই সব বন্ধ হয়ে গেল।হবেনাই বা কেন,ওরা যে,স্কুলের ওপরেও বোম্বার্ডমেন্ট করতে ছাড়েনি!

একদিন,রাতের বেলা কতগুলো লাল মুখের রাশিয়ান এসে, ওর হাবিবি আশফাক কে,সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেল,কি না,প্রেসিডেন্ট বাশার-আল-আসাদ এর আদেশ, দেশের হয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

আশফাক কিছু বলার সুযোগ ও পায়নি, ও জানেতো ওদের মহামান্য প্রেসিডেন্ট কিরকম ভয়ঙ্কর কড়া লোক।পাইকারি বাজারে যেসব ছোট ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্র কেনা বেচা করে,তারা পর্যন্ত ভুলেও যদি বিদেশি মুদ্রাতে কেনা বেচা করে,তাদেরও 10 বছরের জেল, করিয়ে দেয়,ছাড়েনা তাদের পর্যন্ত।

তারপর কত রাত জেগে,সাভেরিন শুধু অপেক্ষা করে, আশফাকের জন্য,রাতের আকাশে চাঁদ ও দেখা যায়না আর,শুধু সামরিক বিমান বাহিনীর ঝাঁক উড়ে চলে।

একদিকে,সিরিয়া,রাশিয়া আর ইউরোপ....... অন্যদিকে রিবেল বাহিনী...... ইরাক,আরব আর আমেরিকা।তারপর,জ্বলে উঠলো পুরো দেশ।এছাড়া IS এর অত্যাচার তো আছেই।

-"মা,ওগুলো কিসের আওয়াজ?" ভয়ে সাভেরিন কে জড়িয়ে ধরে,নিজের ছোট্ট দু হাতে কানে চাপা দিয়ে,প্রশ্ন করে,তিন বছরের ইভানহো।

-"কিছু,নয় বাবা তুমি ঘুমিয়ে পরো, ওগুল দুস্টু লোকেরা বোমা ফেলছে তার আওয়াজ" ছেলের নরম ধূসর সোনালী চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে।সাথে নিজের অনাগত, সন্তানের চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে মায়ের মন।

-"যুদ্ধ কি মা?কেন ওরা বোম্ব ফেলছে?"

এই প্রশ্নের কোনো জবাব সাভেরিন ও দিতে পারেনা।

বেয়নেটের সকাল

-"কে আছ, দরজা খোল জলদি,বাইরে বেরিয়ে আসো মাথার ওপর হাত তুলে" সকাল সকাল ঘুম ভাঙিয়ে, ডেকে তুলেছিলো ওরা,তারপর সাভেরিন ইভানহো কে,রাস্তায় বের করে দিয়ে,জবর দখল করেছিলো ওদের,একমাত্র আস্তানা টা!

বেরোবার সময়,নিজেদের কিছু পরার জামা কাপড় নেবে বলে,সাভেরিন একটি বারের জন্য বাড়ির ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিল,,,, বেয়নেটের গুঁতো এসে পড়েছিলো,,,ওর ছ মাসের ফুলে ওঠা পেট টা তে।

-"আমার মা কে মারছ কেন তোমরা" নিজের খুদে গলাতে চেঁচিয়ে উঠেছিলো ইভানহো।মুখে একটা নোংরা, বিদেশি অচেনা ভাষাতে গালাগাল দিয়ে,এক লাথি কষিয়ে ছিলো, সামরিক পোশাক পরা, লম্বা চওড়া লোকটা।

সাভেরিন, জানতে পারেনি,সেই সৈন্য কাদের ছিলো, দেশের নামে নিবেদিত প্রাণ সিরিয়ান সৈনিক নাকি নিজেদের ঠিক বলে লড়াই করা রিবেল বাহিনীর কেউ!

ছেলের হাত ধরে,কোন দিকে যাবে কিছুই বুঝতে পারেনা ও।চিরকালের চেনা দামাস্কার, রাস্তা ঘাট গুলো,সব যেন অচেনা।আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে ও,দু পাশে চোখে পরে, এয়ার স্ট্রাইক এ গুঁড়িয়ে যাওয়া বাড়ি ঘর।রাস্তাতে ধুলো উড়িয়ে, শুধু সাঁজোয়া গাড়ির লাইন।হাতে সয়ংক্রিয় রাইফেল,নিয়ে ঘোরা ফেরা করা ,উর্দি পরা, সব বিদেশি সৈন্য র দল!

মাথাতে তখন চিন্তা ঘুরছে,আশফাক ফিরে আসলে,কোথায় খুঁজবে ওদের,ও তো নিজেই জানেনা নিজের ঠিকানা!ভাবতে ভাবতে হাঁটা দেয়,সের-জিলা র দিকে,শুনেছে, সের-জিলা কে মৃতদের শহর বলা হয়,দ্যা ডেড সিটি,ওখানকার নির্জনে গেলে যদি কোন রকমে প্রাণ বাঁচানো যায়।

কালাশনিকভ

-"শিবিরে,জোয়ান মর্দ কারা কারা আছিস বেরিয়ে আয়, যুদ্ধে যেতে হবে,তোরা সব এখানে বসে জমানো খাবার ধ্বংস করছিস" পাঁচ জনের সৈন্য দল টা এসে, সোজা ঢুকে আসে শরণার্থী শিবিরে র ভেতর।

-"এই,তুই কোথায় পালাচ্ছিস, তুই ও সঙ্গে আয়" ইভানহো বেচারা সবে,ভয় পেয়ে মায়ের আঁচলের তলায় লুকোতে যাচ্ছিল।

-"ও তো দুধের শিশু, মোটে পাঁচ বছর বয়স ওর,ওকে নেবেন না, ও কিছু বোঝেনা, ও কি কাজে আসবে আপনাদের, ওকে নেবেন না" দৌড়ে গিয়ে দু পা জড়িয়ে ধরে,সাভেরিন,ভারী বুটের লাথি খেতে হবে জানার, পরেও।এই দু বছরে ওরা এইসবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে এখন।

-"এই বয়স থেকেই ট্রেনিং দিলে তবেই তো,দু এক বছরের মধ্যে ওর পাকা হাতে ধরা কালাশনিকভ মানুষ মারতে আর কাঁপবেনা" বলে ওকে টানতে টানতে নিয়ে চলে যায়।

বড় ট্যাংকারে উঠে বসে সবাই,ধীরে ধীরে শহরের ভেতর দিকে রওয়ানা দেয় ওটা,যেখানে মাটির নিচে ট্রেঞ্চ কেটে রাখা আছে,সেই দিকে,ছোট্ট ইভানহো র বুক ফাটানো কান্না উপেক্ষা করে।

পাঁচ থেকে পনেরো, কাউকে রেয়াত দেয়না, এই যুদ্ধ।নিজের শরীরের ওজনের থেকেও বেশি ওজনের, সয়ংক্রিয় রাইফেল,কাঁধে তুলে দেয়,তুলে দেয় রকেট ল্যাঞ্চার।দশ বছর হবার আগেই,বেশির ভাগ শিশু হারিয়ে যায়,পৃথিবীর বুক থেকে।যেমন এই দু বছরে, শুধু 4 লাখ নিষ্পাপ মানুষ মারা গিয়েছে, এই সিরিয়ার সিভিল ওয়ারে।2011 থেকে 2019 গত আট বছর ধরে চলা,যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে সংখ্যা টা,8 লাখের ও অনেক বেশি।যার মধ্যে 60% শিশু।ধ্বংস হয়ে গিয়েছে,বাড়িঘর, রাস্তা, স্কুল,হাসপাতাল।এমনকি বেছে বেছে বোমা ফেলা হয়েছে,

শরণার্থী শিবির গুলোতেও।কিছু উৎবাস্তু প্রাণ হারিয়েছে, মেডিটেরিয়ান ওশান এর বুকে নৌক উল্টে,অন্য দেশে,বেঁচে থাকার আশাতে, পালাতে গিয়ে।সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে গিয়েছে প্রায় এক লাখ শৈশব!

নিজের দু বছরের, মেয়েকে কোলে তুলে,সভেরিন, দুটো শুন্য চোখ মেলে,ওদের চলে যাওয়া দেখতে থাকলো।প্রথম প্রথম খুব কাঁদত ও, নিজের ঘর হারিয়ে যাওয়া জীবন আশফাক বাচ্চাদের ভবিষ্যতে র কথা ভেবে,এখন আর চোখে জল আসেনা ওর।হটাৎ,একটা নরম স্পর্শ অনুভব করলো গালে,দেখলো ইসাবেল, ওর গোলাপি গাল দুটো নিয়ে,ওর মা র গালে ছোয়াঁছে, আর একটা হাত তুলে ইশারা করছে....দূরে চলে যাওয়া সাঁজোয়া গাড়িটার দিকে, ওর বড় বড় চোখ দুটো জলে টল টল করছে....

কেমিক্যাল ওয়ার

ইসাবেল সবে নিজের পুরোনো ছোট হয়ে যাওয়া জামা গুলোকে রোদে মেলতে যাচ্ছিল,এখানে তো জল ই পাওয়া যায়না তেমন,এমনকি খাবার জল ও প্রায় নেই বললেই চলে।তাই রোদে জামা কাপড় গুলো উল্টেপাল্টে দিয়েই কাজ চালাতে হয়।ও এখন এইসব কিছুটা বোঝে, প্রায় 6 বছর বয়স হলো ওর!

ওর যখন, তিন বছর বয়েস সবে,একদিন রাতে কিছু ISএর লোক ঢুকে এসেছিল, ঘুমন্ত তাঁবুতে।তারপর ওকে মায়ের কোল থেকে আলাদা করে,মারতে মারতে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, শিবিরের সব কম বয়েসি মেয়েদের,এমনকি 9 বছর বয়েসি মারিয়াম আপা কেও, ছাড়েনি ওরা।

তারপর,এই তিন বছরে ও আর কোনোদিন ওর মা কে দেখেনি।শিবিরের সবাই বলে,সৈন্য রা হারেমে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে, এমনকি কোনো কোনো দিন দিনে 10 জন করেও!তারপর রোগ হলে নাকি,শহরের বাইরে মরুভূমি তে ফেলে দিয়ে আসে, জীবন্মৃত হাড় জিরজিরে শরীর গুলোকে।

বাইরে বেরিয়ে সবে,কাপড় গুলো তাঁবুর ছাদে মেলে,ফিরতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই,মাথার ওপর পাক দিতে থাকলো,আমেরিকান যুদ্ধ বিমানটা।এটা আর নতুন কিছু নয়,সিরিয়াতে!কিন্তু একি,যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় ও, নিজের ছোট্ট মাথাটা তুলে, অযত্নে বেড়ে ওঠা চুল গুলো ফর্সা ধুল মলিন মুখের ওপর থেকে সরিয়ে কি যেন তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে ওপরে।ওপর থেকে তখন নেমে আসছে,হাল্কা বেগুনি নীল গোলাপি ধোঁয়া!এতো রঙ, ও কোনো দিন দেখেনি আগে,যুদ্ধ বিধস্ত সিরিয়ার রঙ শুধুই,ধূসর!

রঙিন ধোঁয়ার আবরণ,ইসাবেল এর ছোট্ট শরীর টাকে মুহূর্তে ঢেকে দেয়,শুরু হয়ে যায় প্রবল শ্বাস কষ্ট, সারা গায়ের নরম চামড়ার ওপর ফুটে ওঠে,লাল দগ দগে ক্ষত।

যুদ্ধ বিমান থেকে,ছড়িয়ে দেওয়া G-সিরিজের রাসায়নিকে,মুহূর্তে জ্বলে পুড়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়, হাজার হাজার সিরিয়ার নিরীহ মানুষ।যারা কোন দিন জানত না, যুদ্ধ কি।পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার শেষ মুহূর্তে, তারা উপলব্ধি করলো,যুদ্ধের থেকে ভয়ঙ্কর আর ক্ষমতা লোভী মানুষের থেকে বিষাক্ত, আর কিছু নেই,দুনিয়াতে!

ছোট্ট ইসাবেল,লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, যুদ্ধের অমানবিকতার ক্ষত ওর সারা ছোট্ট শরীর টাতে নিয়ে,,,হাত দুটো ওর মুঠো হয়ে গিয়েছে প্রবল কষ্টেতে......ওর এই হাতের মুঠো যেন প্রতিবাদ করতে চায় এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে..........যেন বলতে চায়,,,আর যুদ্ধ নয় এবার শুধু শান্তি চাই.......পৃথিবীতে।

--

‘আমরা যুক্তিবাদী’ পত্রিকার আগের সংস্করণগুলি পড়তে নিচের QR কোডটি স্ক্যান করুন-

Be Rational

-সমাপ্ত-